CCCP
এম. ইলিন
ও ইয়ে. সেগাল
মানুষ কি করে বড়ো হল

১০ লক্ষ
বছর আগে

২ লক্ষ ৫০ হাজার
বছর আগে
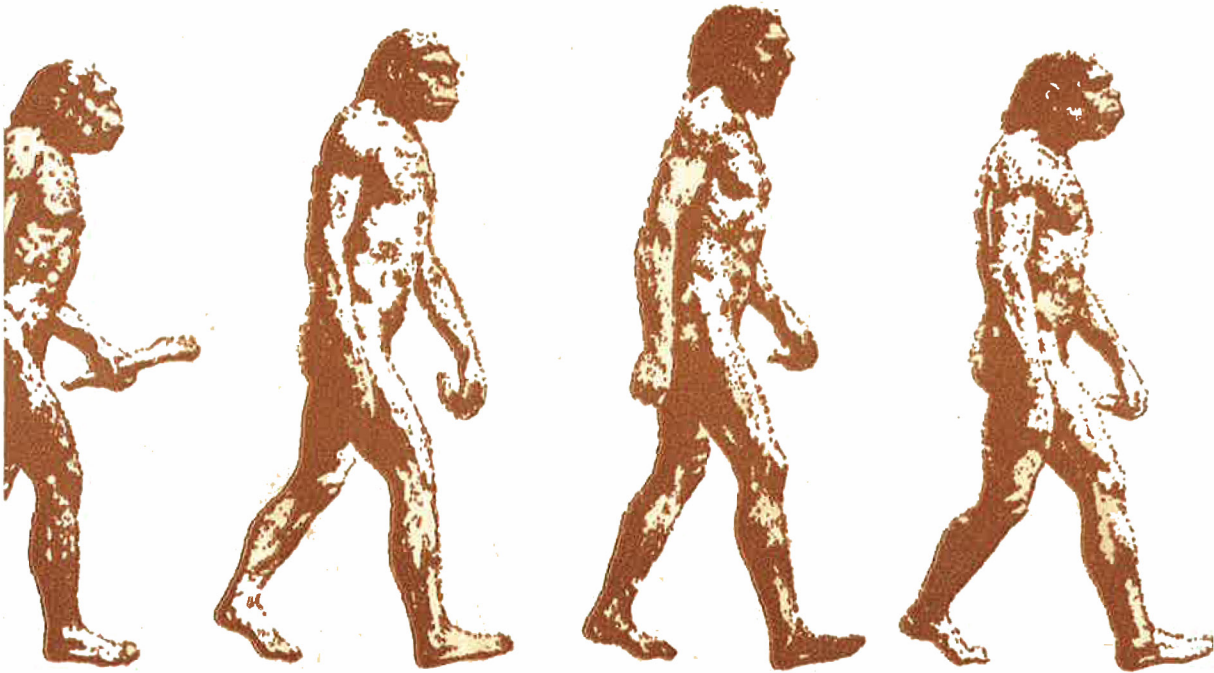
ঋজু মানুষ | আদি হোমো স্যাপিয়্যান্স্ | সোলো নদীর তীরের মানুষ

মানবজাতির আবির্ভাবকালের শুরুতে পৃথিবীর আবহাওয়া প্রথম ঠান্ডা হয়ে এলো। তখনও অবশ্য খানিকটা গরম ছিল। ম্যাস্টোডোন্ট হাতীর দল ঘোরাফেরা করত। কিন্তু এই পর্বের দ্বিতীয়ার্ধে [illegible] প্রকোপ আরও বেড়ে গেল, ফলে বরফে সর্বত্র ঢেকে গেল, আবির্ভাব ঘটল লোমশ ম্যামথদের। আজ থেকে বিশ হাজার বছর আগে প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করল।

চিত্রোপকরণগুলি মস্কোর ইতিহাস মিউজিয়ম থেকে সংগৃহীত। এতে ভূপৃষ্ঠের বিকাশ এবং মানুষের মানুষ হওয়ার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

চতুর্থ গঠনযুগ

১ লক্ষ ৫০ হাজার বছর আগে

৪০ হাজার বছর আগে

রোডেশীয় মানুষ

নিয়ানডারথ্যাল মানুষ
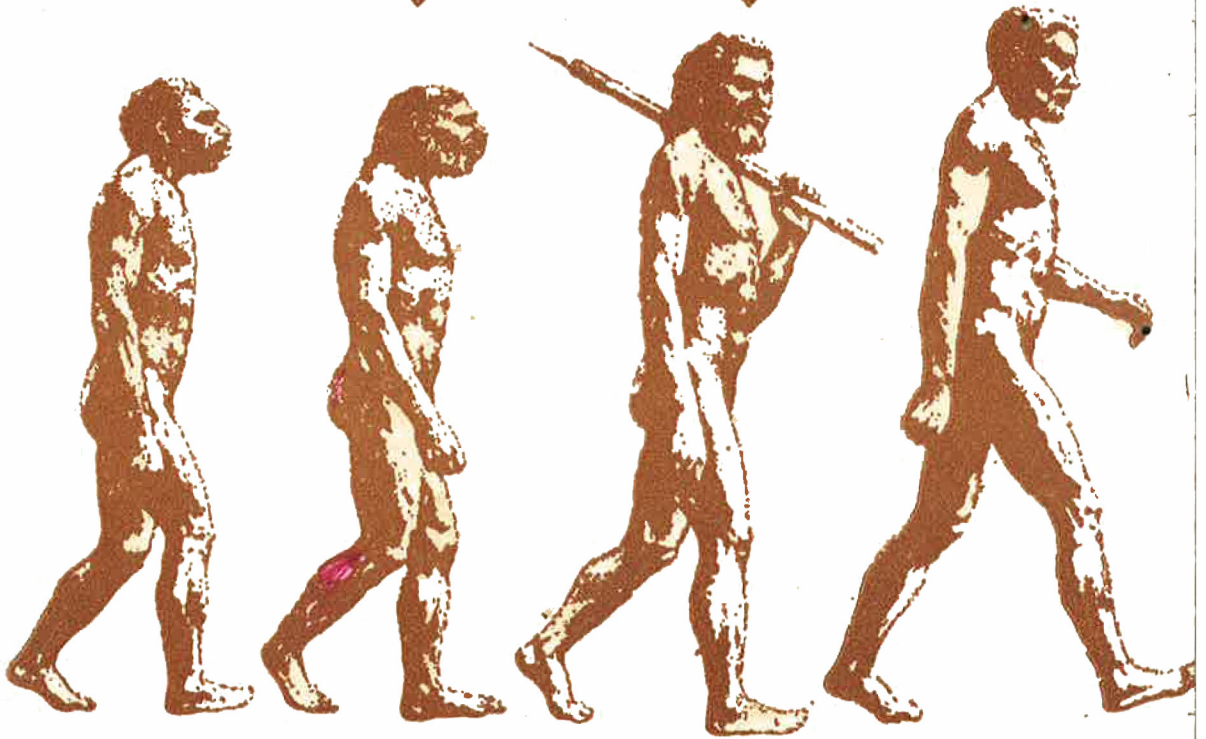
ক্রো-ম্যাগনন, উচ্চ অববাহিকার গুহা ও বস্কোপের অধিবাসী

আধুনিক মানুষ — হোমো স্যাপিঅ্যান্স্

র. জানীগিয়েরের আঁকা ছবি ১৯৭২ সালের 'ইউনেস্কো কুরিয়র'-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যা থেকে।

এম্. ইলিন ও ইয়ে. সেগাল

মানুষ কি করে বড়ো হল

মিখাইল ইলিন ও
ইয়েলেনা সেগাল

মানুষ কি করে বড়ো হল

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

সূচী

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

মিখাইল ইলিন (১৮৯৫-১৯৫৩) ছিলেন সোভিয়েত বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্যের অন্যতম জনক। 'মানুষ কি করে বড়ো হল' বইটির সহলেখিকা তাঁরই স্ত্রী ইয়েলেনা সেগাল। বইটি লেখা হয় ১৯৪০ সালে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র এ বইয়ের সমাদর ঘটে। জটিল ঘটনা সহজ ভাষায় স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা ছিল লেখকদের — সেই জন্যই তাদের বইয়ের এমন সাফল্য। এর পর বেশ কয়েক দশক পার হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে বহু নতুন নতুন জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন, আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। এখানে লেখকেরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন তার কিছু কিছু আজ পুরনো বলে অচল হয়ে গেলেও বইটি আজও প্রামাণ্য, প্রয়োজনীয়, জ্ঞানের আগ্রহ জাগ্রত করে — এতে মানবজাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির উদ্ভবের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

প্রকাশকের কথা

এই বইয়ের বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আলেক্সেই মাক্সিমভিচ গোর্কি। তিনি বলেছিলেন:

'জানেন, আমি হলে এই বইটা কী ভাবে আরম্ভ করতাম? মনে মনে কল্পনা করুন অসীম অনন্ত শূন্যদেশ। নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ। ...সুবিশাল নীহারিকাপুঞ্জের গভীরে কোথায় যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে সূর্য। সূর্য থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এলো কতকগুলো গ্রহ। এই রকম ছোট একটা গ্রহে পদার্থে সঞ্চারিত হল প্রাণ, পদার্থ তার নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করতে শুরু করল। আবির্ভাব ঘটল মানুষের।'

কী করে মানুষের আবির্ভাব ঘটল, কী ভাবে সে কাজ করতে ও ভাবতে শিখল, আগুন ও লোহার ব্যবহার শিখল, প্রকৃতির ওপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য তাকে কী রকম সংগ্রাম করতে হয়েছিল, কী ভাবে সে এই জগৎটাকে জানতে এবং তাকে বদলাতে শিখল, ১৯৩৬ সালে গ্রন্থকারদ্বয় তারই কাহিনী লেখায় হাত দিলেন।

মানুষ-দৈত্য

এই পৃথিবীতে একজন দৈত্য আছে।

তার হাতে এত জোর যে অনায়াসে সে একখানি রেলগাড়ি মাথার ওপর তুলতে পারে।

তার পা এমন যে একদিনে সে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারে।

তার পাখা এমন যে তাতে ভর করে সে মেঘের ওপর দিয়ে পাখিদের চাইতেও উঁচুতে উড়তে পারে।

তার পাখনা এমন যে সে জলের তলায় যে-কোন মাছের চাইতে ভালোভাবে সাঁতার কাটতে পারে।

তার এমনি চোখ যে অদৃশ্য সমস্ত কিছু ধরা পড়ে তাতে। কান এমনি যে পৃথিবীর অপর প্রান্তের লোকেরা যা বলে তা শুনতে পায়।

তার গায়ে এত জোর যে সে পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে, জলপ্রপাতকে থামিয়ে দিতে পারে মাঝপথে। সে তার নিজের ইচ্ছেমতো পৃথিবীকে গড়াপেটা করে, বনজঙ্গল বসায়, এক সমুদ্রের সঙ্গে আরেক সমুদ্র যোগ করে, মরুভূমিকে জলসিক্ত করে।

কে এই দৈত্য?

মানুষই হচ্ছে এই দৈত্য।

মানুষ কেমন করে এত বড় হল? কেমন করে সে হল দুনিয়ার প্রভু?

সেই কথা আমরা আজ বলব আমাদের এই বইতে।

অদৃশ্য খাঁচায়

এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ দৈত্য ছিল না। সে ছিল ছোট্ট, বামন। প্রকৃতির ওপর তার কোন কর্তৃত্ব ছিল না, সে ছিল প্রকৃতির অনুগত দাস।

বনের যে-কোন পশু বা আকাশের যে-কোন পাখির মতোই প্রকৃতির ওপর তার বিশেষ কর্তৃত্ব খাটত না, তাদের মতোই বিশেষ স্বাধীনতাও ছিল না তার।

লোকে কথায় বলে, 'পাখির মতো স্বাধীন'।

কিন্তু পাখিকে স্বাধীন বলা যায় কি?

একথা ঠিক যে পাখির ডানা আছে, ডানায় ভর দিয়ে সে বনজঙ্গল, সাগরমহাসাগর, পাহাড়পর্বত পেরিয়ে যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে। শরৎকালে পাখিরা যখন গরমের দেশে উড়ে যায় তখন আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তাদের দেখে মনে মনে ঈর্ষাবোধ না করে? নির্মল ঊর্ধ্বাকাশে জীবন্ত রেখা এঁকে দুলতে দুলতে চলেছে পাখিদের ঝাঁক, মানুষ নীচে দাঁড়িয়ে মাথা পেছনে হেলিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে, 'দেখ দেখি পাখিরা কেমন যেখানে খুশি সেখানে উড়ে যেতে পারে!'

কিন্তু সত্যিই কি তাই? পাখিরা যে হাজার হাজার মাইল পাড়ি জমায় তা কি নিছক এই কারণে যে তারা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে? না, ওরা যে ওড়ে সেটা মোটেই আপন খেয়ালে নয়, ওরা ওড়ে প্রয়োজনের তাগিদে। পাখিদের বাসবদলের অভ্যাস গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছর ধরে তাদের অসংখ্য প্রজন্মের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

পাখি স্বচ্ছন্দে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে যেতে পারে বলে প্রশ্ন জাগতে পারে যে-কোন জাতের পাখি পৃথিবীর সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না কেন।

তা যদি হত, তাহলে আমাদের উত্তরাঞ্চলের দেওদার বনে ও বার্চ উপবনে সবুজ-লাল পালকের টিয়াপাখিদের দেখতে পেতাম। বনের ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে আমরা শুনতে পেতাম আমাদের চেনা গান — চাতক পাখিদের ডাক। কিন্তু তা

হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়, কেননা পাখিদের দেখে যত স্বাধীন মনে হয় আসলে তারা ততটা স্বাধীন নয়। দুনিয়ায় প্রত্যেক পাখিরই নিজের নিজের জায়গা আছে। কেউ বাস করে দুর্ভেদ্য বনেজঙ্গলে, কেউ বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে, কেউ বা সমুদ্রের ধারে।

ঈগলের ডানার কী জোর, একবার ভেবে দেখ! অথচ এই ঈগলও বাসা বাঁধার জন্য জায়গা বাছতে গিয়ে নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে কখনও যায় না। এমনকি তার সীমানার একটা ম্যাপ পর্যন্ত আঁকা যায়। সোনালি ঈগল কখনও বনজঙ্গলহীন সমতল মাঠের ওপর তার বিশাল বাসা বাঁধবে না। আবার তৃণভূমির ঈগলও কখনও বনের মাঝখানে বাসা তৈরি করতে যাবে না।

বন আর তৃণভূমির মাঝখানে যেন একটা অদৃশ্য প্রাচীর আছে। কোন পশুপাখির সাধ্য কি সেই প্রাচীর ডিঙোয়! তাই বনের স্থায়ী বাসিন্দাদের কখনও মাঠে দেখতে পাবে না, আবার মাঠে যারা বাস করে তাদেরও বনে দেখতে পাবে না।

এ ছাড়া, যে-কোন বন ও মাঠের ভেতরেও অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে ভাগ ভাগ করা অসংখ্য ছোট এলাকা আছে।

বনেজঙ্গলে বেড়ানো

বনেজঙ্গলে বেড়াতে গেলে অনেক সময়ই অদৃশ্য দেয়াল ভেদ করে তোমাকে এগোতে হবে। আর গাছে যদি উঠতে যাও তোমার মাথা বহু অদৃশ্য ছাদ ফুঁড়ে আকাশে উঠে যাবে। তুমি দেখতে না পেলে কী হবে গোটা বনটাই একটা বিশাল বাড়ির মতো নানা তলায় আর কোঠায় ভাগ করা।

জঙ্গলে ঘুরলে একটা জিনিস হয়ত তোমার নজরে পড়বে। দেখতে পাবে জঙ্গলের চেহারা আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। ফার গাছের বনের পরই হয়ত দেখতে পেলে পাইনবন। পাইন গাছও আবার কোথাও উঁচু, কোথাও ছোট। কোথাও পায়ের নীচে সবুজ শেওলার মখমলী স্পর্শ লাগছে, কোথাও লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়েছে, কোথাও বা সাদা সাদা শেওলা।

শহুরে লোক স্রেফ ঘুরে বেড়ানোর জন্য যখন জঙ্গল দেখে বেড়ায় তখন এই সবই তার কাছে একটা জঙ্গলমাত্র। কিন্তু কোন বনবিদ্যাবিদকে জিজ্ঞেস কর, তিনি বলবেন, একটা বন নয়, ওখানে আসলে আছে চারটে ভিন্ন ভিন্ন বন। স্যাঁতসেঁতে

নীচু জমিতে আছে রুপোলি ফার গাছের বন। এদের ঘন পুরু শেওলার আস্তরণগুলো দেখায় পালকের বিছানার মতো। এর পরে বেলেমাটির ঢালে আছে সবুজ শেওলা জড়ানো পাইনবন, বনের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র বিলবেরী আর হাক্‌লবেরীর ঝোপ। আরও ওপরে, বেলেমাটির টিলায় সাদা শেওলা জড়ানো পাইনের ঝাড়। ওখানে, মাঝে মাঝে স্যাঁতসেঁতে জায়গাগুলোতে আবার দেখা যাবে ঘাসের জঙ্গল।

যে তিনটে প্রাচীর চারটে ছোট ছোট অরণ্যজগৎকে আলাদা করে রেখেছিল তুমি কিন্তু অতশত না জেনেই তা ভেদ করে চলে গেলে।

বাড়িতে দরজার গায়ে যেমন নেমপ্লেট সাঁটা থাকে বনেও যদি তেমনি থাকত, তাহলে ফারবনের প্রান্তে তোমরা হয়ত দেখতে পেতে মিস্টার ক্রস্‌বিল, মিস্টার সিস্‌কিন, মিস্টার কিংলেট — এই সব নাম। আবার ফারছাড়া ঘন পাতার

বনের অধিবাসী — কাঠঠোকরা ও ক্রস্‌বিল।

জঙ্গলের প্রান্তে দেখতে পেতে ঝুলছে একেবারে অন্য সব নাম। সেখানে পেতে সবুজ কাঠঠোকরা, সোনালি ফিঞ্চ, ফ্লাইক্যাচার, জে, দোয়েল-শ্যামা, হরবোলা এবং আরও অনেক নাম।

যে-কোন জঙ্গল অনেকগুলো তলায় ভাগ করা থাকে।

যেমন ধর পাইন গাছের জঙ্গল। প্রায়ই তা দোতলা, কখন কখন তিনতলা হয়। একতলায় থাকে শেওলা আর ঘাস। মাঝের তলায় ছোট ছোট ঝোপঝাড়। একেবারে ওপরতলায় থাকে পাইন।

ওকের বন হয় সাততলা। একেবারে উঁচু তলাটা হল ওক, অ্যাশ, ম্যাপল আর লিন্ডেনদের আকাশছোঁয়া মাথা। তাদের ঢেউখেলানো মাথাগুলো যেন সারা জঙ্গলের ছাদ — গ্রীষ্মে সবুজ আর শরৎকালে বিচিত্রবর্ণের বাহারে পাতায় ভরতি। আর নীচে, ওক গাছের মাঝামাঝি থাকে অ্যাশবেরি, বুনো আপেল আর নাসপাতি গাছের ডগা।

আরও নীচে থাকে ডালপালা ও লতাপাতায় জড়ানো প্যাঁচানো ঝোপঝাড়, হেজেল ঝোপ, হথর্ণ গাছ, আরও অনেক। ঝোপঝাড়ের নীচে জন্মায় ঘাস আর ফুল। তাদেরও আবার কয়েক তলা ভাগ। সবার ওপরে মাথা উঁচিয়ে থাকে ঘণ্টাফুল। তাদের নীচে, ফার্ণ গাছের ফাঁকে ফাঁকে ফোটে পাহাড়ী লিলি আর কাউহুইট। দোতলায় ভায়োলেট আর বুনো স্ট্রবেরী। একতলায়, মাটির একেবারে কাছাকাছি থাকে পাতাওয়ালা শেওলা।

মাটির নীচেও আবার একটা চোরা কুঠুরী আছে, যেখানে চলে গেছে গুল্মলতা ও গাছপালার শেকড়।

পাতাওয়ালা গাছেরই হোক আর ফারজাতীয় গাছেরই হোক — যে-কোন বনের একেক তলায় একেক রকম পশুপাখির বাস। সবার ওপরে গাছে বাসা বেঁধে থাকে চিল; একটু নীচে, কোটরে বাস করে কাঠঠোকরা। ঝোপঝাড়ের মধ্যে ব্ল্যাকক্যাপদের বাসা। মাটিতে ঘোরাফেরা করছে যারা তারা নীচতলার বাসিন্দা — জংলা মোরগ। মাটির নীচে, পাতালে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে থাকে বুনো ইঁদুর।

এই বিশাল বাড়িতে সব রকমেরই ঘর আছে। ওপরের তলায় খুব আলো-হাওয়া আর শুকনো খটখটে। একতলা অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে। বাড়িটাতে ঠান্ডাঘর আছে — সেগুলোতে কেবল গ্রীষ্মকালে বাস করা যায়। আবার সারা বছর বাস করার মতো গরম ঘরও আছে।

মাটিতে গর্ত খুঁড়লে হল গরমঘর — শীতের আবাস। শীতকালে এই রকম গর্তের দেড় মিটার গভীরে তাপমাত্রা মেপে দেখার চেষ্টা বিজ্ঞানীরা করেছেন। দেখা

গেছে বাইরে যখন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের আঠারো ডিগ্রী নীচে, তখন গর্তের ভেতরকার তাপমাত্রা শূন্য থেকে আট ডিগ্রী ওপরে।

কোটরের ভেতরটা কিন্তু অনেক বেশি ঠাণ্ডা। শীতকালে সেখানে কেউ থাকলে জমে যাবে। গ্রীষ্মকালে অবশ্য বেশ আরামের, বিশেষত পেঁচা আর বাদুড়দের পক্ষে। দিনের বেলায় তারা কোথাও কোন অন্ধকার কোণে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দেবার পক্ষপাতী। কাজে বেরোয় 'রাতের শিফ্‌টে'।

মানুষ প্রায়ই বাড়ি বদল করে, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যায়, এক তলা থেকে অন্য তলায়ও উঠে যায়। কিন্তু জঙ্গলের বাসিন্দাদের পক্ষে অন্য তলার বাসিন্দাদের সঙ্গে বাড়ি বদল করা বেশ কঠিন — প্রায় অসম্ভব।

জংলা মোরগ তার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার কোঠা ছেড়ে আলো বাতাস খেলানো শুকনো খটখটে চিলেকোঠায় কক্ষণও উঠে আসবে না। আবার চিলেকোঠার বাসিন্দা যে চিল সেও মাটিতে, গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধতে যাবে না।

জঙ্গলের বন্দীরা

মনে মনে কল্পনা করে দেখ, কাঠবিড়ালির সাধ হল জার্‌বোয়ার (লাফানে ইঁদুর) সঙ্গে বাসা বদল করে। কাঠবিড়ালি থাকে বনে, আর জার্‌বোয়ার বাস হল খোলা মাঠে অথবা মরুভূমিতে।

কাঠবিড়ালি বাস করে উঁচু গাছের মাথায়, গাছের কোটরে অথবা ডালপালার মাঝখানে। কিন্তু জার্‌বোয়া বাস করে মাটির নীচের চোরা কুঠুরীতে, খোঁড়লের ভেতরে।

নতুন বাড়িতে উঠে আসতে গেলে জার্‌বোয়াকে উঠতে হবে গাছে। কিন্তু গাছে ওঠার সাধ্যি তার নেই, যেহেতু তার পায়ের থাবাগুলো গাছে ওঠার একেবারেই উপযুক্ত নয়।

অন্য দিকে কাঠবিড়ালির পক্ষেও মাটির তলায় বাস করা সম্ভব নয়। তার যেমন হাবভাব ও স্বভাবচরিত্র তা একমাত্র গাছে জীবনযাপনেরই উপযোগী। তার লেজ আর থাবাগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই দেখ না, বুঝতে বাকি থাকে না কোথায় তার বাস।

কাঠবিড়ালির পায়ের থাবা এমন যে তাতে স্বচ্ছন্দে গাছের ডালপালা আঁকড়ে ধরা যায়, পাইন গাছের শীষ আর বাদাম ছেঁড়া যায়। আর তার লেজ ত সত্যি-

কারের একটা প্যারাশুট। সে যখন ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়ায় তখন শূন্যে এই লেজ তাকে সাহায্য করে। বেজি যখন তাকে তাড়া করে তখন লেজের সাহায্যে সে কসরত করে লাফ দিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

কিন্তু প্রান্তরবাসী জার্বোয়াদের লেজ আর থাবা একদম অন্যরকম। তারা বাস করে ধূ ধূ প্রান্তরে। সেখানে না আছে কোন ঝোপঝাড় যার আড়ালে গা ঢাকা দেওয়া যায়, না আছে কোন গাছ, যাতে চড়ে বসা যায়। শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে সেখানে দরকার ছুটে পালানো, টুপ করে মাটির নীচে সেঁধিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। জার্বোয়া তা-ই করে। যে-কোন পেঁচা তার নজরে পড়ামাত্র সে লাফাতে লাফাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে মাটির তলার খোঁড়লের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার থাবাও তাই সেরকম। লাফানোর সময় সে তার পেছনের লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ দিয়ে পায়ের নীচের জমি ঠেলে চলে আর সামনের বেঁটে বেঁটে পায়ের থাবা দিয়ে মাটি খোঁড়ে। মাটির নীচের খোঁড়লে সে শত্রুদের হাত থেকে গা ঢাকা দেয়। খোঁড়লের ভেতরে থেকে গ্রীষ্মের তাপ ও শীতকালের হিম থেকে প্রাণ বাঁচায়।

আর লেজের কথা যদি বল, জার্বোয়ার লেজ হল তার পায়ের থাবার বিশ্বস্ত সহচর। জার্বোয়া যখন তার পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে বসে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন এই লেজ তার বাড়তি ঠেকনার কাজ করে — অনেকটা যেন তৃতীয় আরেকটি পা। আর যখন সে লাফায় তখন লেজ গাড়ির স্টিরিং-এর মতো তাকে ঠিক পথে চালায়। লেজ যদি না থাকত, তাহলে জার্বোয়া লাফাতে গিয়ে শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ত।

তাই কাঠবিড়ালি ও জার্বোয়া যদি নিজেদের মধ্যে বাড়ি বদলাবদলি করতে চায়, বন আর উজাড় মাঠ, কোটর আর খোঁড়ল, যদি বদলাবদলি করতে চায় তাহলে একই সঙ্গে লেজ আর থাবাও বদলাবদলি করতে হবে।

বনজঙ্গল আর খোলা মাঠের অন্যান্য বাসিন্দাদেরও যদি আমরা পরিচয় নিই, তাহলে দেখতে পাব তারা সকলেই অদৃশ্য শৃঙ্খলে তাদের নিজের নিজের জগতে বাঁধা। এই শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে মোটেই সহজ নয়।

জংলা মোরগ থাকে জঙ্গলের এক তলায়। কারণ তার খাবার থাকে মাটির নীচের কুঠুরীর মধ্যে। লম্বা ঠোঁট তৈরি হয়েছে মাটির তলা থেকে পোকা খুঁটে বার করার জন্যই। গাছে জংলা মোরগের কিছুই করার নেই। কাজেই গাছের মাথায় তাকে কখনই দেখতে পাবে না। তেমনি কোন কাঠঠোকরাকেও কদাচিৎ মাটিতে দেখতে পাবে। কাঠঠোকরা সারা দিন কোন ফার বা বার্চ গাছের গুঁড়ির চারপাশে ঘুরঘুর

করে। ঠুকঠুক করে কি ঠোকরায় ওখানে, গাছের ছালের ওপরে কিংবা নীচে কিসের খোঁজ করে?

ফার গাছের ছাল যদি তুলে ফেল, তাহলে দেখতে পাবে সেই ছালের ঠিক নীচেই সমস্ত কাণ্ডের চারপাশ দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা সরু সরু রেখা। এই রেখাগুলো দাঁত দিয়ে কেটে কেটে যারা তৈরি করেছে তারা হল ফার গাছের স্থায়ী বাসিন্দা — এক ধরনের পরজীবী গুবরে পোকা। কিছু দূর গিয়েই একটা দোলনার মতো গর্তের মধ্যে গিয়ে ঐ রেখা শেষ হয়। সেই দোলনার মতো গর্তে গুবরে পোকার শূককীট থেকে প্রথমে মূককীট হয়, তারপর বেরিয়ে আসে পরিণত গুবরে পোকা। এই গুবরে পোকা ফার গাছে থাকতেই অভ্যস্ত। কাঠঠোকরারও ঐ গুবরে পোকা না হলে চলে না। কাঠঠোকরার আবার লম্বা ঠোঁট, তা দিয়ে গাছের ছাল ফুটো করা কঠিন কাজ নয়। আর তার জিভ এমনই লম্বা ও কমনীয় যে তার জোর সেই গর্ত থেকে শূককীট টেনে বার করে আনে।

আমরা এবারে পাচ্ছি ফার গাছ — ফার গাছের পোকা — কাঠঠোকরা — এই একটা শৃঙ্খল। যে সমস্ত শৃঙ্খলে কাঠঠোকরা গাছের সঙ্গে, বনের সঙ্গে বাঁধা, এটি তার একটি মাত্র।

কাঠঠোকরা গাছে তার খাবার পায় — বল্কলভুকদের ত বটেই, এ ছাড়াও অন্যান্য পোকামাকড় এবং তাদের শূককীট। শীতকালে সে গাছের কাণ্ড আর ডালের মাঝখানের ফাঁকে কায়দা করে পাইনের শীষ রেখে তার ভেতর থেকে বীচি বার করে। গাছের কাণ্ডের ভেতরে সে বাসার জন্য খুঁড়ে কোটর বানায়। টানটান লেজ আর কোন জিনিস আঁকড়ে ধরার উপযোগী নখওয়ালা আঙুল থাকায় গাছের কাণ্ড বয়ে সে অনায়াসে উঠতে পারে। এর পরও কি তোমরা কাঠঠোকরাকে বলবে গাছের বাসা ছেড়ে চলে যেতে?

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে কাঠঠোকরা বা কাঠবিড়ালি কাউকেই জঙ্গলের ভাড়াটিয়া না বলে বরং জঙ্গলের বন্দী বলাই ভালো।

মাছ কী করে তীরে এলো

যে-সব ছোট ছোট জগৎ নিয়ে এই পৃথিবী গড়ে উঠেছে তারই একটা হল জঙ্গল-জগৎ।

বনজঙ্গল আর তৃণভূমি ছাড়াও পৃথিবীতে রয়েছে পাহাড়, তুন্দ্রা, সমুদ্র, হ্রদ, আরও

কত কি। প্রত্যেক পাহাড়ই ঠিক জঙ্গলের মতোই আলাদা আলাদা অনেক অদৃশ্য দেয়ালে নানা ভাগে বিভক্ত। সমুদ্রেও জলের নীচে আছে অদৃশ্য ছাদের নানা ভাগ, নানা স্তর।

যে সমস্ত জায়গায় প্রবল ঢেউ খেলে সেখানে তীরের ঠিক কাছের পাথরগুলো অসংখ্য শামুক-গেঁড়ি-চিংড়িজাতীয় প্রাণীতে ঢাকা পড়ে থাকে। ঐ সমস্ত প্রাণী তাদের জায়গায় এমন শক্তভাবে এঁটে বসে থাকে যে প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝাও তাদের সেখান থেকে টলাতে পারে না।

আরেকটু গভীরে, জলের যে স্তরে সূর্যের আলো পড়ছে সেখানে ধূসর-বাদামী ও সবুজ শেওলার মাঝখানে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে রঙবেরঙের মাছ, দোল খাচ্ছে স্বচ্ছ জেলিমাছ, ধীরে ধীরে তলা দিয়ে গুটি গুটি চলেছে তারামাছের ঝাঁক। মগ্নশিলার গায়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত প্রাণীর বাস, তারা গাছপালার মতো স্থির। খাদ্যের সন্ধানে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয় না। খাবার জিনিস আপনা-আপনিই তাদের মুখে এসে পড়ে। এদের মধ্যে আছে লাল অ্যাসিডিয়া — দেখতে অনেকটা দুই মুখওয়ালা কুঁজোর মতো। তারা জলের সঙ্গে খুদে খুদে প্রাণী শুষে খেয়ে ফেলে। উজ্জ্বল অ্যানেমোনরা পাশ দিয়ে কুঁচো মাছদের সাঁতরে চলে যেতে দেখলে পাপড়ির মতো দাঁড়া দিয়ে তাদের চেপে ধরে।

সমুদ্রের অন্ধকার তলার, একেবারে নীচের তলার চেহারা সম্পূর্ণ অন্য রকম। সেখানে রাতের পর দিন কখনও আসে না, সব সময় একই অন্ধকার। সমুদ্রের গভীরে আলো নেই, তার মানে শেওলাও সেখানে নেই, কেননা শেওলা জন্মাতে হলে আলো দরকার। সমুদ্রের তলদেশ একটা অন্ধকার কবরখানাবিশেষ। ওপরের স্তর থেকে প্রাণী আর উদ্ভিদের দেহাবশেষ সেখানে এসে জমা হতে থাকে।

তরল পলির ওপর ঘুরে বেড়ায় দশঠ্যাঙওয়ালা কাঁকড়ার দল। লম্বা লম্বা তাদের দাঁড়া। অন্ধকারের মধ্যে সাঁতার কেটে বেড়ায় এক ধরনের মাছ, তাদের মুখ চওড়া। কারও কারও চোখের কোন বালাই নেই। কারও বা চোখজোড়া ড্যাবড্যাব করে বেরিয়ে আছে একজোড়া টেলিস্কোপের মতো। এমন সমস্ত মাছ আছে যাদের গা বরাবর চলে গেছে আগুনের মতো টকটকে রঙের ছোট ফুটকি। দেখে মনে হয় যেন ছোট্ট একটা জাহাজ, আর তার গায়ে আলোয় ঝলমলে কতকগুলো ঘুলঘুলি। কোন কোন মাছের আবার মাথার ওপরে একটা উঁচু কাণ্ডের ওপর জ্বলজ্বল করছে আলোকস্তম্ভ। আমরা যেখানে বাস করি কি বিচিত্রই না সেই অদ্ভুত জগৎটা!

উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্রের অগভীর যে জলভাগ আছে সেটাও কিন্তু আবার

একেবারেই ডাঙার মতন নয়, যদিও ডাঙা আর সমুদ্রের ঐ অংশের মাঝখানে আছে মাত্র একটি রেখা, যাকে আমরা বলি তটরেখা।

আচ্ছা, এক জাতের লোক কি বাস উঠিয়ে আরেক জগতে যেতে পারে? মাছ কি সমুদ্র থেকে উঠে এসে ডাঙার বাসিন্দা হতে পারে?

ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই মনে হয়, কেননা মাছ জলের ভেতরে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। তীরে উঠে এসে বাস করতে হলে ফুলকোর বদলে চাই ফুসফুস, পাখনার বদলে চাই পা। মাছ একমাত্র তখনই সমুদ্রের বদলে ডাঙায় এসে বসবাস করতে পারবে যখন সে আর মাছ থাকবে না।

কিন্তু এমন কি হতে পারে যে মাছ আর মাছ রইল না?

বিজ্ঞানীদের যদি একথা জিজ্ঞেস কর, তাহলে তাঁরা বলবেন যে বহু প্রাচীনকালে কোন কোন জাতের মাছ সত্যি সত্যিই তীরে উঠে এসে বসবাস করতে থাকে, ফলে তারা তাদের মৎস্যত্ব হারিয়ে ফেলে। জল থেকে ডাঙায় স্থান বদলের এই পর্ব এক আধ বছরের ঘটনা নয়, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলতে থাকে।

অস্ট্রেলিয়ার যে সমস্ত নদী শুকিয়ে আসছে সেখানে আজকের দিনেও এক জাতের হর্ণফিশ দেখতে পাওয়া যায় যাদের পটকা দেখতে অনেকটা ফুসফুসের মতো। খরার সময় নদী যখন ক্ষীণ হয়ে আসতে আসতে নোংরা ডোবার আকার ধারণ করে তখন আর সমস্ত মাছ মারা যায়, তাদের পচাগলা দেহাবশেষে জলও দূষিত হয়। কিন্তু একমাত্র হর্ণফিশরাই এই খরায় দিব্যি টিকে থাকে। তার কারণ ফুলকো বাদে ফুসফুসও আছে তাদের। তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিতে হলে মাথাটা একবার জল থেকে বার করলেই হল।

আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এক ধরনের মাছ আছে যাদের জল ছাড়াও দিব্যি চলে। খরার সময় তারা পাঁকের ভেতরে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে, বর্ষা না নামা পর্যন্ত ফুসফুস দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়।

তার মানে মাছেরও ফুসফুসের বিকাশ ঘটতে পারে? তা না হয় হল, কিন্তু পা? এক্ষেত্রেও জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত আছে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এক ধরনের লাফানে মাছ আছে, যারা তীরের ওপর তিড়িংবিড়িং ত করেই, এমনকি গাছেও উঠতে পারে। পাখনাজোড়া তাদের পায়ের কাজ করে।

মাছ যে তীরে উঠে আসতে পারে এই সমস্ত আজব জীবই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। কিন্তু তারা যে সত্যি সত্যিই কোন এক সময় ডাঙায় উঠে এসে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল সেটা জানার উপায় কী?

এর প্রমাণ লুপ্ত জীবজন্তুদের হাড়গোড়। প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাচীন মাটির স্তরে

এমন এক ধরনের জীবনের সন্ধান পেয়েছেন, মাছের সঙ্গে যার অনেক মিল, অথচ তাকে ঠিক মাছও বলা চলে না — অনেকটা যেন ব্যাঙ বা ট্রাইটনের মতো উভচর। এই জীবটির নাম স্টেগোসেফালাস। পাখনার বদলে তার ছিল সত্যিকারের পাঁচ আঙুলওয়ালা পা। স্টেগোসেফালাস যখন জল থেকে উঠে আসত তখন ধীরে ধীরে হলেও এর সাহায্যে ডাঙার ওপর নড়াচড়া করতে পারত।

আমাদের সাধারণ যে ব্যাঙ, তার কথাই ধর না কেন? আজকের দিনেও একেবারে ছোট অবস্থায়, যখন সে ব্যাঙাচি তখন মাছের সঙ্গে তার খুবই কম তফাত চোখে পড়ে।

এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা একমাত্র একটি সিদ্ধান্তেই আসতে পারি — বহু প্রাচীনকালে কোন কোন জাতের মাছ সমুদ্র ও ডাঙার মাঝখানের সীমানা পার হয়। কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা নিজেরাও পালটে যায়। মাছ থেকে আবির্ভাব হল উভচর জীবের। উভচররা আবার সরীসৃপদের পূর্বপুরুষ। সরীসৃপদের থেকে হল স্তন্যপায়ী ও পাখিরা, সেই সঙ্গে এমন সমস্ত পশুপাখি, যারা চিরকালের জন্য সমুদ্রে যাবার পথ ভুলে গেল।

মৌন সাক্ষী

প্রাচীন জীবজন্তুদের হাড়গোড় হল মৌন সাক্ষী। তারা এই সাক্ষ্যই দেয় যে কোটি কোটি বছরের মধ্যে প্রাণীর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে।

কী সেই পরিবর্তন? চার্লস ডারউইন যতদিন না বিবর্তনতত্ত্ব উদ্ভাবন করেন ততদিন পর্যন্ত এটা একটা রহস্যই ছিল। ইংরেজ বিজ্ঞানী ডারউইন যে কাজ শুরু করেন তার ধারা অনুসরণ করেন রুশ বিজ্ঞানী কভালেভ্স্কি ও তিমিরিয়াজেভ। এই বিজ্ঞানীদের প্রচুর পরিশ্রমলব্ধ বিপুল কাজের পর, এতদিন আমাদের পূর্বপুরুষরা যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান নি, আজকের দিনে আমাদের পক্ষে তা বুঝতে পারা আদৌ কঠিন নয়।

যে-কোন প্রাণী জগতে তার যে জায়গা, যে পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের মধ্যে সে বাস করে তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু পৃথিবীতে সব কিছুরই পরিবর্তন আছে — গরম আবহাওয়া জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে, যেখানে এককালে সমতলভূমি ছিল সেখানে জেগে ওঠে পাহাড়পর্বত, ডাঙার বদলে দেখা দেয় সমুদ্র, পাইনজাতীয় গাছের বনজঙ্গলের বদলে দেখা দেয় পত্রবহুল গাছের বনজঙ্গল।

আশেপাশের সমস্ত কিছু যখন পালটাতে থাকে তখন প্রাণীদের অবস্থাটা কেমন হয়? প্রাণীরাও পালটে যায়।

তবে বদল যে কোন্ দিকে হবে সেটা তাদের হাতে নয়। হাতীর পক্ষে রাতারাতি ঘাসপাতা ছেড়ে মাংসাশী হওয়া সম্ভব নয়। ভালুকও 'আমার গরম লাগছে' বলে চাইলেই গায়ের লোমশ পোশাকটা খুলে ফেলতে পারে না।

প্রাণীরা তাদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পালটায় না। তারা পালটায় এই কারণে যে তাদের বাধ্য হয়ে অন্য খাবার খেতে হয়, অন্য অবস্থায় জীবন ধারণ করতে হয়। আর তাদের এই যে বদল তাও আবার সব সময় তাদের পক্ষে ভালো বা লাভজনক বলা চলে না।

প্রায়ই দেখা যায় জীবজন্তু বা গাছপালাকে অনভ্যস্ত নতুন পরিস্থিতিতে তুলে আনার পর তাদের যা দরকার, তাদের বাপ ঠাকুর্দারা যা পেয়ে এসেছিল তা না পাওয়ার ফলে তারা ধীরে ধীরে রোগা হয়ে যেতে শুরু করেছে।

তারা হয় খাদ্যাভাবে কষ্ট পায় ও ঠাণ্ডায় জমে যায়, নয়ত অনভ্যস্ত গরমে ও খরায় কষ্ট পায়। তারা সহজেই শত্রুর শিকার হয়ে পড়ে। তাদের যারা সন্তান-সন্ততি তারা আবার জন্ম থেকেই আরও রুগ্ণ, ফলে বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। শেষ পর্যন্ত অবস্থা পরিবর্তনের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে এই সব জীবজন্তু ও উদ্ভিদের বংশ সম্পূর্ণ লোপ পায়।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে প্রাণী এমনভাবে নিজেকে পালটে ফেলে যে তা তার পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়ে বরং উপকারীই হয়। অনুকূল পরিস্থিতিতে এই ধরনের হিতকর পরিবর্তন বংশপরম্পরায় চলতে চলতে জমা হয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়, স্থায়ী রূপ ধারণ করে।

কিছুকাল পরে দেখা যায় বংশধরদের সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের কোন মিলই নেই। তাদের প্রকৃতি পালটে গেছে, পূর্বপুরুষেরা যে অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারত না, তারা কিন্তু তার সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে। তারা জীবনের নতুন পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তার উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলেছে। যা ঘটেছে তাকে বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন — যারা অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে তারা টিকে রইল, যারা পারল না তারা লোপ পেল।

তিমিরিয়াজেভ এরকম একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: সমতলের ডাঁটাগাছকে উঠিয়ে পাহাড়ে বসানো হল। সমতলে থাকতে তার কাণ্ড ছিল উঁচু, পাতা ছিল ঘন। কিন্তু পাহাড়ে উঠে আসার পর সে হয়ে গেল বেঁটে, তার ডালপালা হল মাটি-ঘেঁষা।

এই পরিবর্তন ঘটার কারণ এই যে সমতলের গাছটি গিয়ে পড়েছে অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে। পাহাড়ের জলবায়ু আর জমি ত আর নীচেকার জলবায়ু ও জমির মতন নয়! এই পরিবর্তন তার পক্ষে ভালোই হল। সে বরফের নীচে লুকিয়ে থেকে আরও সহজে হিম আর ঠাণ্ডা বাতাসের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে প্রাণীদের প্রকৃতি কী ভাবে বদল হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

মাছের উভচরে বিবর্তনের দৃষ্টান্তটাই ধর না কেন। সমুদ্র ও হ্রদের অগভীর জলে, যেখানে জল শুকিয়ে আসতে থাকে এই প্রক্রিয়াটি সেখানে ঘটে। যে সমস্ত মাছ শুকিয়ে আসা জলাশয়ে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারল না তারা লোপ পেয়ে যেতে লাগল, তাদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল। টিকে গেল কেবল তারাই যারা অনেকক্ষণ জল ছাড়া থাকতে পারত। তারা খরার সময় পাঁকের তলায় ঢুকে পড়ত কিংবা পাখনাকে পায়ের মতো কাজে লাগিয়ে তার সাহায্যে ভাঁজিয়ে কাছের কোন ডোবায় চলে যেত। শরীরের যে সমস্ত ছোটখাটো পরিবর্তন ডাঙায় কাজে লাগতে পারে প্রকৃতি তার সবগুলোরই আশ্রয় নিতে থাকে। মাছের পটকা অল্প অল্প করে বদলে ফুসফুসের আকার নিতে লাগল, পাখনাজোড়া থেকে হল পা।

এই ভাবে কোন কোন জলচর প্রাণী ধীরে ধীরে ডাঙার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। পরিবর্তনশীলতার ফলে নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মাছের পাখনার, তার পটকার এবং সমস্ত শরীরের পরিবর্তন ঘটল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে কেবল যে-সমস্ত পরিবর্তন উপকারী সেগুলো বজায় রইল, আর যেগুলো ক্ষতিকর সেগুলো লোপ পেল। বংশগতি এই সমস্ত উপকারী পরিবর্তনকে পরে চালান করে দিল বংশধারায়, সেগুলো ধীরে ধীরে জমা হয়ে দৃঢ়, স্থায়ী রূপ ধারণ করল।

ঘোড়াদের নিয়ে কভালেভ্স্কি যে গবেষণা চালিয়েছিলেন তার বৃত্তান্ত থেকে আরও অনেক কিছু জানা যায়। আজকের দিনে একথা বিশ্বাস করাই কঠিন যে ঘোড়ার উদ্ভব এক জাতের ছোট্ট জন্তু থেকে। এই জন্তু কোন এক সময় পড়া গাছের কাণ্ড কৌশলে ডিঙিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। আজকালকার ঘোড়ার মতো খুর তার ছিল না, খুরের বদলে ছিল পাঁচ আঙুলের থাবা। আঙুলের বাঁকা নখ দিয়ে জঙ্গলের উঁচুনীচু জমিতে পা আঁকড়ে রাখা সহজ হত।

কিন্তু জঙ্গল পাতলা হয়ে আসতে লাগল, যেখানে জঙ্গল ছিল সেখানে দেখা দিতে লাগল তৃণভূমি। এই পরিস্থিতিতে ঘোড়াদের জঙ্গুলে বাপঠাকুর্দাদের প্রায়ই

বেরিয়ে আসতে হত খোলা জায়গায়। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে সেখানে লুকানোর কোন জায়গা নেই। বাঁচার একমাত্র উপায় দৌড়ে পালানো। এখন আর লুকোচুরি খেলা নয়, ছুটে পালানোর প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় বুনো জন্তুদের অনেকেরই পরিণতি হল শোচনীয়। হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের হাত থেকে অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে বাঁচল কেবল তারাই যাদের পা লম্বা আর বেশ দ্রুত চলে।

এখানেও আবার সেই প্রাকৃতিক নির্বাচন। দ্রুত ধাবনের জন্য যা যা উপায় দরকার খুঁজে খুঁজে বার করা, সেগুলোকে টিকিয়ে রাখা, আর যেগুলো তার পরিপন্থী সেগুলোকে বাতিল করে দেওয়া।

বাঁচার লড়াইয়ে ঘোড়াদের বাপঠাকুর্দাদের এই যে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তাতে দেখা গেল যে দ্রুত ছোটার জন্য পায়ের পাঁচটা আঙ্গুলের কোন দরকার হয় না — একটা আঙ্গুলই যথেষ্ট, যদি সেটা বেশ শক্ত আর মজবুত হয়। এরই ফলে দেখতে দেখতে প্রথমে তারা জন্মাতে লাগল তিন আঙ্গুল নিয়ে, পরে এক আঙ্গুল নিয়ে। আমাদের আজকের দিনের যে ঘোড়া তার পায়ে মোটে একটা শক্ত আঙ্গুল, যাকে আমরা বলি খুর।

ঘোড়া যখন জঙ্গল ছেড়ে সমতলভূমিতে এলো তখন কেবল তার পা নয়, চেহারাই আগাগোড়া পালটে গেল। অন্তত ঘাড়ের কথাই ধর না কেন। ধর, ঠ্যাঙ লম্বা হল, অথচ ঘাড় সেই আগের মতোই ছোট রয়ে গেল। তাহলে কী শোচনীয় অবস্থা হত বল ত? পায়ের নীচের ঘাসের কি আর নাগাল পেত সে? কিন্তু সেরকম দুর্ঘটনা ঘটল না, তার কারণ এই যে প্রকৃতি যেমন ঘোড়াদের খাটো ঠ্যাঙ বাতিল করে দিয়েছে তেমনি খাটো ঘাড়ও বাতিল করে দিয়েছে।

আর দাঁত? দাঁতও পালটাল। সমতলভূমিতে ঘোড়াদের রুক্ষ, কর্কশ লতাগুল্ম খেতে হয়, আর তার জন্য দাঁত দিয়ে খাবার পেষা দরকার। তাই দাঁত শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল অন্য রকম। আজকের দিনের ঘোড়াদের দাঁত রীতিমতো পেষাই যন্ত্র ও যাঁতাকলের মতো; রুক্ষ ঘাস ত বটেই, এমনকি খড় পর্যন্ত দিব্যি পিষে ফেলে।

ঘোড়ার পা, ঘাড় আর দাঁতের পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই যে বিপুল কর্মকাণ্ড, এর পেছনে কিন্তু কম সময় যায় নি — পুরো পাঁচ কোটি বছর কেটে যায়। আর কত প্রাণীই না ধ্বংস হয় এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে!

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্র ও ডাঙার, জঙ্গল ও সমতলভূমির মাঝখানের এই দেয়ালকে চিরস্থায়ী বলা যায় না। সমুদ্র শুকিয়ে যেতে পারে, স্থলভাগকে প্লাবিত করতে পারে। সমতলভূমি পরিণত হতে পারে মরুভূমিতে। সমুদ্রের অধিবাসীরা উঠে এসে তীরে আশ্রয় নিতে পারে। অরণ্যের অধিবাসীরা পরিণত হতে পারে

সমতলভূমির অধিবাসীতে। কিন্তু যা-ই বল না কেন, কোন প্রাণীর পক্ষে তার পারিপার্শ্বিকের বন্ধন ছিঁড়ে নিজের ছোট জগৎটি ছেড়ে বেরিয়ে আসা বড় কঠিন কাজ! এমনকি বন্ধন ছেঁড়ার পরও তাকে মুক্ত বলা যায় না — এক অদৃশ্য খাঁচা থেকে সে এসে পড়ে আরেক অদৃশ্য খাঁচায়।

জঙ্গল থেকে সমতলভূমিতে চলে আসার পর ঘোড়া আর জঙ্গলের প্রাণী রইল না, হল সমতলভূমির প্রাণী। যে সমস্ত মাছ ডাঙায় উঠে এলো তাদের আর সমুদ্রে ফিরে যাবার কোন পথ রইল না। এখন সমুদ্রে ফিরতে গেলে আবার পালটাতে হবে নিজেদের। ডাঙার যে সমস্ত প্রাণী সমুদ্রে ফিরে যায় তাদেরও তা-ই করতে হয়েছিল। তাদের পা আবার পাখনায় পরিণত হল। যেমন তিমি। তিমি এমনভাবে 'মৎস্যায়িত' হল যে লোকে তাকে 'তিমি মাছ' বলে থাকে, যদিও আসলে সে স্তন্যপায়ী।

মুক্তির সন্ধানে মানুষ

পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষ রকমের বা জাতের ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তু আছে। তাদের প্রত্যেকে যার যার ছোট ছোট জগতে, যে যেখানে অভ্যস্ত সেখানেই বাস করে। একজনের জন্য যেখানে লেখা রয়েছে 'প্রবেশ নিষেধ', অন্যের জন্য সেখানে ফলক ঝুলছে 'স্বাগতম্'।

মেরুদেশের শ্বেতভালুককে উষ্ণমণ্ডলের জঙ্গলে এনে ছেড়ে দিয়েই দেখ না। টার্কিশ স্নানের খপ্পরে পড়ে সে তক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। কারণ, তার গায়ে মেরুদেশের শীতের উপযোগী যে পুরু কম্বল আছে তা খুলে রাখার সাধ্য নেই তার। তেমনি উষ্ণমণ্ডলের অধিবাসী হাতিকে যদি সুমেরুতে চালান কর তাহলে সে বরফের মধ্যে ডুবে শীতে জমে মারা যাবে। তার কারণ সর্বদা স্নানঘরে যেতে গেলে যেমন উলঙ্গ থাকতে হয় সে তেমনি উলঙ্গ।

পৃথিবীতে শুধু একটি জায়গাই আছে যেখানে হাতির পাশাপাশি বাস করে শ্বেতভালুক, যেখানে দেখতে পাবে সব অক্ষাংশের জীবজন্তু। সেখানে গভীর বনের জীবজন্তুর সঙ্গে কয়েক ফুটের মধ্যে বাস করে সমতলভূমির জীবজন্তু, সমতলভূমির জীবজন্তুর পাশাপাশি বাস করে পাহাড়ী অঞ্চলের জীবজন্তু। সে জায়গা হল চিড়িয়াখানা।

চিড়িয়াখানায় দক্ষিণ আফ্রিকার পাশেই অস্ট্রেলিয়ার স্থান। অস্ট্রেলিয়া আবার

উত্তর আমেরিকার পাশে। পৃথিবীর চারদিক থেকে জীবজন্তু সেখানে জড়ো করা হয়েছে। তারা অবশ্য নিজেরা ইচ্ছে করে সেখানে আসে নি। তাদের এক জায়গায় এনে জড়ো করেছে মানুষ।

কিন্তু এই জীবন্ত সংগ্রহের জন্য মানুষকে কি কম ঝামেলা পোহাতে হয়? প্রত্যেক জীবজন্তু তার নিজস্ব ছোট গণ্ডীর মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত। তাই প্রত্যেকের জন্য তার নিজস্ব ছোট জগতের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হয়। কারও জন্য জলাধারে সমুদ্র তৈরি করে দিতে হয়, কাউকে কুড়ি বর্গফুট বালুর চত্বর দিয়ে তৈরি করে দিতে হয় মরুভূমি। এদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যেমন যত্ন নিতে হয় তেমনি আবার দেখতে হয় এক জন্তু যেন অন্য জন্তুকে খেয়ে না ফেলে। শ্বেতভালুকের স্নানের জন্য চাই ঠাণ্ডা জল, বানরের দরকার গরম। সিংহের রোজ সময় মতো কাঁচা মাংস দরকার, ঈগলপাখির চাই ডানা ছড়াবার মতো জায়গা।

সমতলভূমি, বন, পাহাড়, মরুভূমি, ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে নানা ধরনের জীবজন্তুকে কৃত্রিমভাবে এনে একসঙ্গে জড়ো করার পর মানুষের কাজ হল, প্রত্যেকের উপযোগী কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে সেখানে তাদের রাখা, নইলে তারা মরে যাবে।

তোমরা এবারে হয়ত জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা, মানুষও ত এক রকমের জন্তু, তাহলে কেমন সে জন্তু? সমতলভূমি, জঙ্গল, না পাহাড় — কোথাকার জন্তু সে? যে মানুষ বনে থাকে তাকে কি বুনো মানুষ বলব? আর যে জলায় থাকে তাকে কি বলব জলার মানুষ?

না, তা বলব না।
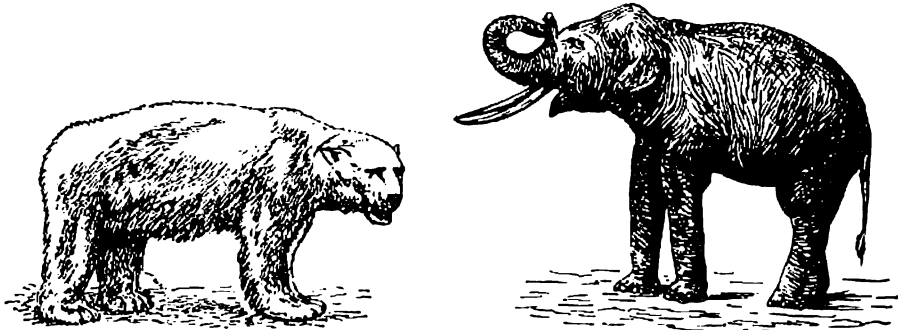
হাতির সঙ্গে শ্বেতভালুকের দেখা হওয়া কেবল চিড়িয়াখানাতেই সম্ভব।

বলি না এই কারণে যে যে-মানুষ জঙ্গলে থাকে সে-ই আবার সমতলভূমিতেও থাকতে পারে। যে জলায় বাস করে সেও শুকনো জায়গায় উঠে আসতে পারলে খুশিই হবে। মানুষ পৃথিবীর সব জায়গাতেই বাস করে। পৃথিবীর বুকে এমন জায়গা খুব কমই আছে যেখানে সে প্রবেশ করে নি, এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তার জন্য 'প্রবেশ নিষেধ'-এর চিহ্ন টাঙানো আছে। সুমেরু অভিযাত্রীরা ভাসমান বরফের চাঙড়ার ওপর বাস করেন। যদি তাঁদের জ্বলন্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে যেতে হত, তাহলেও তাঁরা এর চেয়ে কোন অংশে কম সাফল্য অর্জন করতেন না।

সমতলভূমি থেকে জঙ্গলে, কিংবা জঙ্গল থেকে সমতলভূমিতে উঠে আসতে হলে মানুষকে তার হাত, পা, দাঁত কিছুই পালটাতে হয় না। সে যদি দক্ষিণ থেকে সুমেরুতে এসে পড়ে, তাহলেও গা ঘন লোমে ঢাকা নয় বলে সে মারা পড়বে না। পশুদের গায়ের চামড়া তাদের যে ভাবে হিম থেকে বাঁচায় পশুলোমের কোট, গরম টুপি ও ফেল্টের বুট মানুষকে তার চেয়ে কম বাঁচাবে না।

মানুষ ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে শিখেছে, কিন্তু এর জন্য তাকে পায়ের একটি আঙুলও জলাঞ্জলি দিতে হয় নি। মানুষ জলের তলায় মাছের চেয়েও দ্রুত সাঁতার কাটতে শিখেছে, কিন্তু এর জন্য তাকে হাত-পা বদলে পাখনা নিতে হয় নি।

সরীসৃপদের পাখি হতে লেগে গিয়েছিল কোটি কোটি বছর। এর জন্য তাদের কম মূল্য দিতে হয় নি — প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আসতে গিয়ে তারা সামনের থাবাদুটি হারায়, সেগুলো ডানায় পরিণত হয়। মানুষ কয়েকশ' বছরের মধ্যে আকাশ জয় করল, অথচ এর জন্য তাকে হাত খোয়াতে হয় নি।

যে অদৃশ্য দেয়াল পশুপাখিদের বন্দী করে রাখে, মানুষ কিন্তু কোন রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে না গিয়েই তা ভেদ করার উপায় বার করেছে।

যেখানে নিশ্বাস নেওয়ার মতো বায়ু নেই সেই রকম উঁচু জায়গায়ও মানুষ উঠছে, সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে সুস্থ অবস্থায় ফিরেও আসছে। স্ট্র্যাটোমণ্ডলচারীরা উচ্চতার সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে জীবনের সাধারণ সীমানাকে উন্নত করেছেন, জীবন্ত প্রাণীর বাসভূমি এই জগতের সীমানা ছাড়িয়ে গেছেন।*

---

* বইটি লেখা হয়েছিল আজ থেকে চল্লিশ বছরের বেশি আগে। তখন ২০-৩০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বগতি আকাশে ওঠার রেকর্ড ছিল। স্ট্র্যাটোমণ্ডলচারীরা বেলুনে ওই পর্যন্ত ওঠেন।

পশুপাখিরা সমস্ত রকম ভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। যখন তুমি কোন অঙ্ক কষ তখন তার উত্তর হবে অঙ্কের শর্ত অনুযায়ী। এক্ষেত্রেও তাই। প্রতিটি জীবজন্তু যেন একেকটি অঙ্ক, জীবন তার সমাধান করে। এই অঙ্কের শর্তগুলো হল জীবের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় নানা শর্ত, আর তার উত্তর — ভিন্ন ভিন্ন রকমের পা, ডানা, পাখনা, ঠোঁট, নখ, স্বভাব, অভ্যাস ইত্যাদি। জলে না ডাঙায়, নোনা জলে না মিঠে জলে, উপকূলে না উন্মুক্ত সমুদ্রে, অতল জলে না জলের ওপরের স্তরে, উত্তরে না দক্ষিণে, পাহাড়ে না উপত্যকায়, মাটির ওপরে না মাটির নীচে, সমতলভূমিতে না জঙ্গলে — কোথায় কী ভাবে কোন জন্তুকে বাস করতে হচ্ছে এবং কোন্ ধরনের জীবজন্তু তার প্রতিবেশী এরই উপর নির্ভর করছে এই অঙ্কের উত্তর।

জীবজন্তুরা পুরোপুরি তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস। কিন্তু মানুষ নিজের উপযোগী করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা গড়ে তোলে।

প্রকৃতির পাটীগণিত থেকে আমরা জানতে পাই, 'মরুভূমিতে জল অতি সামান্য।' কিন্তু আমরা মরুভূমির বুক চিরে গভীর খাল কেটে এনে এই শর্তটাকে নাকচ করে দিই।

জানতে পাই, 'সুমেরু অঞ্চলের জমি অনুর্বর।' আমরা জমিতে সার দিয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাই। আমরা বারোমেসে খাদ্যশস্য ও শুঁটিজাতীয় ফসলের গাছ বুনে জমিকে উর্বর করে তুলি।

আমরা এও জানি যে শীতকালে ঠাণ্ডা, রাতের বেলায় অন্ধকার। কিন্তু আমরা এসব গ্রাহ্য করি না, আমরা আমাদের ঘরবাড়ির ভেতরে শীতকালে গ্রীষ্মের উষ্ণতা সঞ্চার করি, রাতে দিনের আলো নিয়ে আসি।

আমরা অনবরত আমাদের প্যারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে চলেছি। আমাদের চারপাশের বনজঙ্গলের চেহারা আজ বহুকাল হল বদলে গেছে। বনজঙ্গলের অনেক অংশ কাটা হয়েছে, কোথাও বা আবাদ হচ্ছে। আমাদের শুকনো ঘাসের স্তেপভূমি এখন আর আগেকার সেই স্তেপভূমি নেই। মানুষ সেখানে জমি চাষ করছে, ফসল বুনছে। মানুষ যখন জমিতে হাত দেয় নি সেই সময় যে সমস্ত বুনো খাদ্যশস্য ও গাছপালা জন্মাত আমাদের আজকের দিনের রাই, গম, আপেল, নাসপাতি ইত্যাদি গাছ মোটেই সেরকম নয়।

বর্তমানে মহাকাশযুগের তৃতীয় দশক চলছে। মহাকাশযান আর কক্ষপরিক্রমাকারী স্টেশনে চেপে মানুষ ৩০০ কিলোমিটার, এমনকি তার চেয়েও উঁচুতে উঠতে পারে, দীর্ঘ সময় সেখানে থেকে কাজও করতে পারে।

প্রকৃতিতে কোথায় দেখতে পাবে 'আপেল-নাসপাতি'? দেখতে পাবে কি মিষ্টি চেরী আর বার্ডচেরীর সঙ্কর কোন ফল? কিংবা আরও বহু আশ্চর্য আশ্চর্য ফল যেগুলো সৃষ্টি করেছিলেন রুশ বিজ্ঞানী ও উদ্যানপালনবিদ ইভান মিচুরিন?

গোরু ঘোড়া ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু কিন্তু বন্য প্রকৃতিতে নেই। মানুষই তাদের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে, লালনপালন করে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

এমনকি মানুষ বন্য জন্তুজানোয়ারেরও স্বভাবচরিত্র পালটে দিয়েছে। কোন কোন জন্তু লোকালয় ও খেতখামারের খুব কাছাকাছি থেকে খাদ্যের সন্ধান করে। কেউ কেউ আবার মানুষের কাছ থেকে আত্মগোপন করতে গিয়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে চলে গেছে। মানুষের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত ঐ সমস্ত জন্তুজানোয়ারের পূর্বপুরুষরা সেখানে বাস করত না।

কালে এমন অবস্থা হবে যে সংরক্ষিত অরণ্য ছাড়া আর কোথাও মানুষ সত্যিকারের বন্য প্রকৃতির দেখা পাবে না। প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু চিরকাল এরকম ছিল না। অন্যান্য জীবজন্তুর মতো আমাদের পূর্বপুরুষেরাও ছিল প্রকৃতির দাস।

পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

কোটি কোটি বছর আগেকার কথা। আমাদের আজকের দিনের বন-উপবনের জায়গায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন বনজঙ্গল। জঙ্গলের গাছপালাও ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তাতে থাকত সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবজন্তুরা। সেই সব জঙ্গলে মার্টেল, লরেল আর ম্যাগনোলিয়া গাছের পাশেই জন্মাত বার্চ, লিণ্ডেন আর অ্যাশ গাছ। কাঠবাদামের গাছ জন্মাত আঙুর লতার পাশে। ছোট ছোট উইলোর কাছাকাছি দেখা যেত কর্পূর গাছ। দৈত্যাকার এসমস্ত গাছের তুলনায় বিরাট বিরাট ওক গাছকেও বামন বলে মনে হত।

আমাদের জঙ্গলকে যদি বাড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে পুরাকালের এই জঙ্গলকে কেবল বাড়ি না বলে বলতে হবে সত্যিকারের আকাশছোঁয়া স্কাইস্ক্রেপার। সেই 'স্কাইস্ক্রেপারের' ওপরতলা আলো আর আওয়াজে ভরা। বিরাট বিরাট উজ্জ্বল ফুলের রাশির মধ্যে উড়ে বেড়াত বিচিত্রবর্ণের সমস্ত পাখি, তাদের কলকাকলিতে বন মুখরিত হয়ে থাকত। বানরের দল ডালে ডালে দোল খেত, এ গাছ থেকে সে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াত।

একদল বানর গাছের ডালে ডালে এমনভাবে ছুটোছুটি করে বেড়াত যে মনে হত তারা যেন একটা সেতু পার হচ্ছে। মায়েরা ছোট ছোট বাচ্চাদের বুকে চেপে ধরে রাখত, ফলমূল বাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে তাদের মুখে পুরে দিত। একটু বড় ছেলেপুলেরা তাদের মায়েদের পা ধরে ঝুলে থাকত। ইয়া লম্বা লোমওয়ালা দলের বুড়ো কর্তা বেশ কায়দা করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যেত। দলের আর সকলে আসত তার পেছন পেছন। কোন্ জাতের বানর এরা? কোন চিড়িয়াখানাতেই অমন বানর দেখতে পাবে না। ওরা এমন এক জাতের বানর যা থেকে মানুষ, শিম্পাঞ্জী ও গরিলা সকলেরই পূর্বপুরুষদের জন্ম। এবারে আমরা আমাদের বুনো পূর্বপুরুষদের, বনমানুষদের দেখা পেলাম।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাস করত জঙ্গলের ওপরতলায়। মাটি থেকে অনেক ওপরে জঙ্গলে তারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়াত, যেন গাছপালাগুলো তাদের কাছে সেতু, ব্যালকনি বা গ্যালারী। জঙ্গল ছিল তাদের ঘরবাড়ি। গাছের জোড়া ডালের ফাঁকে ফাঁকে তারা বাসা বেঁধে রাত্রি বাস করত। জঙ্গল ছিল তাদের দুর্গ। তাদের পরম শত্রু বাঘের ছুরির মতো লম্বা লম্বা ধারাল দাঁতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা লুকিয়ে থাকত জঙ্গলের ওপরতলায়। জঙ্গল ছিল তাদের ভাঁড়ারঘর। সেখানে ওপরের ডালপালার মধ্যে জমা থাকত তাদের খাবার — ফলমূল আর বাদাম।
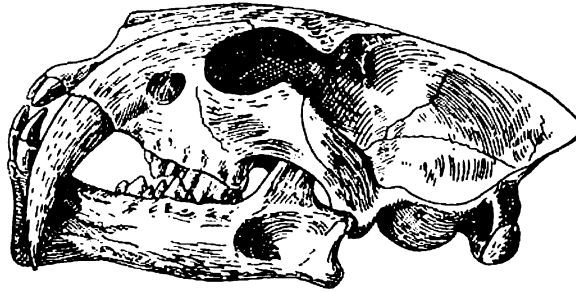
ছুরি-দাঁত বাঘের শ্বদন্তগুলো ছিল ছুরির ফলার মতো লম্বা লম্বা।

কিন্তু বনজঙ্গলের ওপরতলার ছাদের নীচে বসবাস করতে গেলে ডালপালা আঁকড়ে ধরার কায়দা জানতে হয়, গাছের কাণ্ড বেয়ে ওঠার, এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে চলার, ফল হাত দিয়ে ধরে গাছ থেকে ছেঁড়ার আর বাদাম ভাঙার

কায়দা জানা চাই। দরকার ছিল আঁকড়ে ধরার উপযোগী আঙ্গুলের, তীক্ষ্ন দৃষ্টিশক্তির আর শক্ত দাঁতের।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা জঙ্গলের সঙ্গে শুধু একটি শৃঙ্খলেই আবদ্ধ ছিল না — অনেকগুলো শৃঙ্খল ছিল তাদের, আর শুধু জঙ্গলের সঙ্গেই নয় — তার ওপরের তলার সঙ্গে। কী করে মানুষ ভাঙল সেই শৃঙ্খলগুলো? কী ভাবে জঙ্গলের সেই জীব সাহস পেল তার খাঁচা থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের সীমানার বাইরে যেতে?

আমাদের নায়কের ঠাকুমা ও তার জ্ঞাতি ভাইরা

আগেকার দিনের লেখকরা কোন মানুষের জীবনবৃত্তান্ত ও অভিযানের বিষয় লিখতে বসে ব্যস্ততার ভাব প্রকাশ করতেন না। প্রথম কয়েক অধ্যায়ে তিনি সচরাচর নায়কের আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের কথা সবিস্তারে জানাতেন। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার ওপর চোখ বুলালেই পাঠক জানতে পারতেন নায়কের ঠাকুমা অল্পবয়সে কেমন সাজগোজ করতেন কিংবা বিয়ের আগের রাতে নায়কের মা কী স্বপ্ন দেখতেন। তারপর আসত নায়কের দাঁত ওঠা, তার প্রথম আধো আধো বোল, হাঁটি হাঁটি পা ফেলা, ছোটবেলার দুষ্টুমি — সব কিছুর বিশদ বর্ণনা। গোটা দশেক অধ্যায়ের পর নায়ক স্কুলে ভর্তি হত, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে সে প্রেমে পড়ত। তৃতীয় খণ্ডে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তার বিয়ে হত। উপন্যাসের উপসংহারে দেখা যেত নায়ক-নায়িকার চুলে পাক ধরেছে, লাল টুকটুকে গাল নাতির হাঁটি হাঁটি পা দেখে তাদের আর আনন্দের সীমা নেই।

এই বইটিতেও আমরা মানুষের জীবন আর তার অভিযানের কাহিনী বলব। সেকালের প্রাতঃস্মরণীয় ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরাও আমাদের নায়কের কথা বলতে গিয়ে তাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের পরিচয় দেব। বলব তার নিকট আত্মীয়-স্বজনদের কথা। কেমন করে সে জগতে এলো, হাঁটতে, কথা বলতে আর ভাবতে শিখল, জীবন সংগ্রাম শুরু করল, তার সুখদুঃখ জয়পরাজয়ের ইতিহাস — সে সমস্তই আমরা বলব। কিন্তু এখানে প্রথমেই স্বীকার করা ভালো যে একেবারে গোড়াতে বড় বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে আমাদের।

কেমন করে আমরা বর্ণনা দেব নায়কের ঠাকুমা-ঠাকুর্দা সেই বনমানুষদের, যাদের বংশে তার জন্ম? আজ যুগযুগান্ত পরে তেমন কোন লোকই ত ইহজগতে নেই!

একমাত্র মিউজিয়মেই আমরা সেই পূর্বপুরুষদের সাক্ষাৎ পেতে পারি। কিন্তু মিউজিয়মেও তাদের আস্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া কঠিন, কেননা তাদের চিহ্নাবশেষ

বলতে আছে মাত্র এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের নানা স্থান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কয়েকটি হাড়গোড় আর সামান্য মুঠো কয়েক দাঁত।

তার চেয়ে বরং আমাদের নায়কের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের — তার 'জ্ঞাতি ভাইবোনদের' জানার চেষ্টা করে লাভ আছে।

মানুষ যখন উষ্ণমণ্ডলের বনজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বহুকাল ধরে সমস্ত রকম অর্থে দুপায়ে দাঁড়ানো বলতে যা বোঝায় তাই শিখেছে তখনও তার নিকট আত্মীয় গরিলা, শিম্পাঞ্জী, গিবন ও ওরাংওটাংরা আগের মতোই জংলী জীবন যাপন করছে। মানুষ সচরাচর তার হতভাগ্য গরিব আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে রাখতে চায় না। শুধু তা-ই নয়, এদের সঙ্গে আত্মীয়তা অস্বীকার করতে পারলেই যেন সে বাঁচে। এমন লোকও আছে যারা মানুষ আর শিম্পাঞ্জীর মাতামহ যে এক, সেকথার উল্লেখমাত্রকে পর্যন্ত রীতিমতো অপমানজনক মনে করে।

কিন্তু সত্যকে চেপে রাখা যায় না। বনমানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে আমরা আমাদের বইটা পুরো ভরিয়ে ফেলতে পারতাম। কিন্তু

বানরের সঙ্গে মানুষের মিল লোকে বহুকাল আগে লক্ষ করেছে। প্রাচীনকালের আঁকা এই ছবিটাতে সে মিল যেন একটু বাড়িয়েই দেখানো হয়েছে।

তার কোন দরকার নেই। দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক আলোচনা বাদ দিলেও যে লোক চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জী ও ওরাংওটাংদের দেখে অন্তত একঘণ্টাও কাটিয়েছে, মানুষের সঙ্গে বনমানুষের ঘনিষ্ঠ মিল তার চোখে না পড়ে পারে না।

আমাদের আত্মীয় রোজা আর র‍্যাফেল

বেশ কয়েক বছর আগে লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে কল্‌তুশি গ্রামে (বর্তমানে পাভ্‌লভো) বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইভান পেত্রোভিচ পাভ্‌লভের গবেষণাগারে দুটো শিম্পাঞ্জী আনা হয়েছিল — রোজা আর র‍্যাফেল।

লোকে সচরাচর তাদের হতভাগ্য বুনো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তেমন একটা ভালো ব্যবহার করে না। দেখা হওয়ামাত্রই তাদের খাঁচায় পুরে ফেলে। তবে এবারে আফ্রিকার বন থেকে আসা এই অতিথিদের খুব আদর আপ্যায়ন করা হয়। তাদের জন্য একটা গোটা ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়া হল — শোবার ঘর, খাবার ঘর, স্নান ঘর, খেলাধুলা আর কাজের জন্য ঘর — সবই ছিল এই ফ্ল্যাটটাতে। শোবার ঘরে রাখা হল আরামের খাট, খাটের পাশে নাইট টেবিল। খাবার ঘরে খাবার টেবিল, টেবিলে সাদা ঢাকনা পাতা, তাতে নানা রকমের খাবারদাবার।

মোট কথা কোন রকমের ভাবার উপায় নেই যে এ বাড়ির বাসিন্দারা মানুষ নয় — বানর। খাবার সময় টেবিলে প্লেট আর চামচ রাখা হত। রাতের বেলায় শোবার ঘরে বিছানা পেতে তার ওপর সযত্নে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পরিপাটি করে বালিশও রাখা হত। অবশ্য এটা ঠিক যে অতিথিদুজন কোন কোন সময় ভদ্রতা ঠিকমতো বজায় রাখতে পারত না। খেতে বসে চামচ ফেলে রেখে মুখ ডুবিয়ে হাপুস হুপুস করে সোজা প্লেট থেকে সেদ্ধ ফল খেতে থাকত। বালিশে মাথা না দিয়ে মাথার ওপর বালিশ চাপা দিয়ে ঘুমোত।

রোজা আর র‍্যাফেল একেবারে মানুষের মতো কাজ করতে না পারলেও প্রায় মানুষের কাছাকাছি কাজ করতে পারত। রোজার কথাই ধর না কেন। যে-কোন গৃহকর্ত্রীর মতো চাবির গোছা থেকে চাবি বার করে আলমারি খুলতে পারত। এই চাবিগুলো সচরাচর থাকত চৌকিদারের পকেটে। রোজা চুপিচুপি পেছন থেকে এসে চৌকিদারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি বার করে আনত। চাবি নিয়ে এক দৌড়ে চলে যেত খাবার ঘরের আলমারির কাছে। তারপর চেয়ারে উঠে সাবধানে

র‍্যাফেল ভোজন করছে।
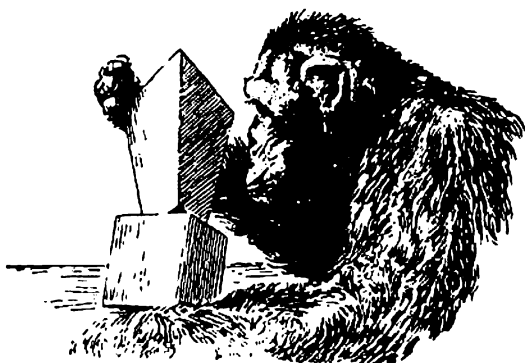
র‍্যাফেল কাজ করছে।
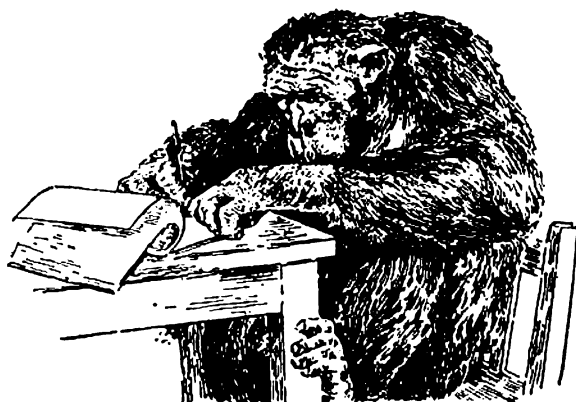
র‍্যাফেল ছবি আঁকছে।

চাবির ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে দিত। আলমারির কাচের দরজার আড়ালেই ছিল প্লেট ভর্তি লোভনীয় আখরোট আর তার ওপর থোকা থোকা আঙুর। চাবি ঘুরিয়ে দিতেই আঙুরের থোকা রোজার হাতে।

আর র‍্যাফেল! পাঠাভ্যাসের সময় যদি তাকে দেখতে। পাঠের উপকরণ বলতে তার ছিল বালতি ভরা আখরোট আর নানা আকারের কয়েকটা কাঠের ব্লক। ছোটদের সাধারণ খেলনার ব্লকের চেয়ে এই কাঠের ব্লকগুলো ছিল অনেক গুণ বড়। সবচেয়ে বড়টা ছিল একটা টুলের সমান উঁচু, আর সবচেয়ে ছোটটা জলচৌকির সমান। আখরোটের বালতিটা টাঙানো ছিল মেঝে থেকে অনেকটা উঁচুতে। র‍্যাফেলের সমস্যা হল কী করে আখরোট পেড়ে খাওয়া যায়।

প্রথম প্রথম র‍্যাফেল কিছুতেই এই কঠিন সমস্যাটির সমাধান করতে পারছিল না। নিজের বাড়িতে, অর্থাৎ জঙ্গলে থাকলে সে গাছে উঠে ফল পাড়ত। কিন্তু এখানে ফলগুলো গাছের ডালে ঝুলছে না, ঝুলছে শূন্যে। এখানে কাঠের ব্লকগুলো ছাড়া এমন আর কিছু নেই যা বেয়ে ওঠা যায়। অথচ সবচেয়ে বড়টার ওপর উঠেও আখরোটের নাগাল পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

ব্লকগুলো এদিক-ওদিক নানাভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে র‍্যাফেল হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করল। ব্লকের ওপর ব্লক যদি রাখা যায়, তাহলে আখরোটের নাগাল পাওয়া সহজ হয়। অল্প অল্প করে র‍্যাফেল প্রথমে তিনটে, তারপর চারটে, শেষে পাঁচটা ব্লক দিয়ে একটা পিরামিড গোছের বানিয়ে ফেলল। কাজটা তার পক্ষে সহজ ছিল না। যেমন তেমন করে সাজালে ত আর চলবে না, সাজাতে হবে একটা বিশেষ ধারায় — প্রথমে বড়, তারপর একটু ছোট, সবার ওপরে সবচেয়ে ছোটটি।

কতবারই না র‍্যাফেল ভুল করে ছোট ব্লকের ওপর বড় ব্লক চাপিয়ে চেষ্টা করে দেখেছে! তাতে দেখা যাচ্ছে গোটা পিরামিডটা দুলতে শুরু করেছে — এই বুঝি ভেঙে পড়ে। মনে হতে লাগল এক্ষুনি বুঝি গোটা পিরামিডটা র‍্যাফেলকে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা ততদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে নি, কারণ তোমরা ত জানই র‍্যাফেল ছিল যে-কোন বানরের মতোই চটপটে।

অবশেষে সে রহস্য ভেদ করতে পারল। র‍্যাফেল সাতটা ব্লককে একের পর এক তাদের আকার অনুযায়ী বড় থেকে ছোট করে সাজিয়ে ফেলল। যেন সেগুলোর গায়ে নম্বর লেখা আছে আর সে সব ও পড়ে ফেলেছে। বালতির নাগাল পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ নড়বড়ে পিরামিডটার চুড়োয় বসে বসে পরম তৃপ্তিভরে কণ্টার্জিত আখরোট খেতে শুরু করে দিল।

আর কোন্ জীবের সাধ্যি আছে এরকমভাবে মানুষের মতো আচরণ করে? ভাবতে পার, কোন কুকুর ঐ ব্লক দিয়ে পিরামিড তৈরি করবে? অথচ তোমরা জান যে কুকুরের বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। কাজ করার সময় র‍্যাফেলকে যারা দেখেছে মানুষের সঙ্গে তার এই মিল দেখে তারা রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেছে। একটি করে ব্লক তুলে কাঁধে চাপিয়ে এক হাতে ধরে বয়ে নিয়ে এলো পিরামিডের কাছে। কিন্তু ব্লকটা আকারে মিলল না। সেটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে র‍্যাফেল তার ওপর এমনভাবে বসল যে মনে হয় যেন গভীর ভাবনায় পড়েছে। একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের কাজে লেগে যায় — আগের ভুল শুধরে নেয়।

শিম্পাঞ্জীকে কি মানুষ করা যায়?

আচ্ছা, এরকমই যদি হয় তাহলে কি শিম্পাঞ্জীকে মানুষের মতো হাঁটাচলা কথাবার্তা শেখানো যায় না? ভাবনাচিন্তা করতে ও কাজকর্ম করতে শেখানো যায় না?

কোন এক সময় সার্কাসের বিখ্যাত ট্রেনার ভ্লাদিমির দুরভের এটা একটা স্বপ্ন ছিল। মিমুস নামে তাঁর একটি প্রিয় শিম্পাঞ্জী ছিল। এই মিমুসের শিক্ষার পেছনে তিনি কম কষ্ট করেন নি। মিমুসও ছিল বেশ চালাকচতুর ছাত্র। সে চামচ ব্যবহার করতে শিখেছিল, গলায় ন্যাকড়া জড়িয়ে খাবার টেবিলে এসে চেয়ারে বসত, এমনভাবে সুপ খেত যে এক ফোঁটাও টেবিলক্লথে পড়ত না। এমনকি স্লেজে চেপে সে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতেও পারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে মানুষ করা যায় নি।

কেন যে করা যায় নি তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ এই যে মানুষ আর শিম্পাঞ্জীর পথ কোটি কোটি বছর আগে আলাদা হয়ে গেছে। মানুষের পূর্বপুরুষেরা গাছ থেকে মাটিতে নেমে এসে দু'পায়ে হাঁটতে শুরু করে দু'হাতে কাজকর্ম করতে থাকে। কিন্তু শিম্পাঞ্জীর পূর্বপুরুষরা গাছেই বসবাস করতে থাকে এবং ঐ জীবনযাত্রায় আরও বেশি করে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আর এই কারণে শিম্পাঞ্জীর শরীরের গড়নও মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার হাত আলাদা, পা আলাদা, মস্তিষ্ক আলাদা, জিহ্বাও মানুষের মতন নয়।

শিম্পাঞ্জীর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখ। তার হাতের গড়ন মানুষের হাতের গড়নের মতো আদৌ নয়। বুড়ো আঙুলটা কড়ে আঙুলের চেয়ে ছোট, আমাদের হাতের মতো তাদের বুড়ো আঙুল আবার এতটা পাশে সরানোও নেই। অথচ এই বুড়ো আঙুলই হল পাঁচটা আঙুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দরকারী — হাত নামে যে মজুরের বাহিনী আছে তাদের অগ্রণী বলতে হয় একে। বুড়ো আঙুল অন্য চারটি আঙুলের যে-কোন একটির সঙ্গে জোড় বেঁধে বা সবগুলোর সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারে। সেইজন্যই আমরা বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার এত দক্ষতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে পারি।

গাছের ফল পাড়তে হলে শিম্পাঞ্জী অনেক সময়ই হাত দিয়ে গাছের ডাল ধরে আর পা দিয়ে ফল পাড়ে। মাটির ওপর দিয়ে হাঁটাচলার সময়ও সে হাতের বাঁকানো আঙুলগুলোর ওপর ভর দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সে অনেক সময় হাতের কাজ পা দিয়ে আর পায়ের কাজ হাত দিয়ে চালায়। কিন্তু হাত-পায়ের গড়ন ছাড়া আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে যার কথা ভুলে গিয়ে অনেক জীবজন্তুর ট্রেনার শিম্পাঞ্জীকে মানুষ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা ভুলে যান যে শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্ক আয়তনে মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক ছোট — মানুষের মস্তিষ্কের মতো এত জটিল তার গঠন নয়।

ইভান পেত্রোভিচ পাভ্‌লভ মানুষের মস্তিষ্কের কাজ নিয়ে বহু বছর ধরে চর্চা করেন। তিনি পরম কৌতূহল সহকারে রোজা ও র‍্যাফেলের কার্যকলাপ লক্ষ করতেন। আমরা জানতে পারি কখন কখন তিনি তাদের চালচলনের ওপর লক্ষ রাখার জন্য অনেকক্ষণ বানরশালায় কাটাতেন। লক্ষ করে দেখেছেন যে ওদের চালচলন একেবারেই অসংলগ্ন, কোন রকম শৃঙ্খলার বালাই তার মধ্যে নেই। একটা কাজে হাত লাগাতে না লাগাতে ওরা আরেকটা কাজের দিকে হাত বাড়ায়। র‍্যাফেল হয়ত সবে বেশ গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে তার পিরামিড তৈরি করতে লেগেছে, এমন সময় একটা বল্‌ দেখতে পেল — আর যাবে কোথায়? — ব্লক সরিয়ে রেখে সে তার লম্বা লম্বা লোমশ হাত দিয়ে বল্‌ নিয়ে খেলায় মেতে গেল। এক মুহূর্ত পরেই বল্‌ও বিস্মৃত — মেঝেতে একটা মাছি গুটি গুটি চলেছে — র‍্যাফেলের সমস্ত মনোযোগ এখন ঐ মাছিটার ওপর।

একবার শিম্পাঞ্জীদের বিশৃঙ্খল ছটফটে ভাব লক্ষ করে ইভান পেত্রোভিচ পাভ্‌লভ তাঁর নিজের মনের ভাবনা মুখে প্রকাশ করে বলেন, 'কী বিশৃঙ্খলা! কী বিশৃঙ্খলা!'

বনমানুষদের এই বিশৃঙ্খল চালচলন আসলে তাদের মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খল

কার্যপ্রণালীরও প্রতিফলন বটে। মানুষের মস্তিষ্ক যে-রকম একাগ্রতার সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে এটা আদৌ সে রকম নয়। তাহলেও বনমানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি খুব একটা কম নয় এবং যে ছোট জগতে অসংখ্য অদৃশ্য শৃঙ্খলে সে বাঁধা, সেখানকার জীবনে, অর্থাৎ জঙ্গলের জীবনে সে খুব ভালোভাবে খাপ খাইয়ে থাকতে পারে।

একবার একজন সিনেমার পরিচালক রোজা আর র‍্যাফেলের বাড়িতে এসেছিলেন তাদের ছবি তুলতে। সিনেমার যে চিত্রনাট্য তিনি তৈরি করেছিলেন সেই অনুযায়ী ওদের দু'জনকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য স্বাধীনভাবে বাইরে চলাফেরা করতে দিয়ে তার ছবি তুলতে হয়। কিন্তু তাদের যেই ঘরের বাইরে বের করে দেওয়া হয় অমনি তারা ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল কাছের একটা গাছে, হাত দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে তারা মনের আনন্দে দোল খেতে থাকে। সেই চমৎকার আরামের ঘরটার চেয়ে গাছের ডালে তারা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল।

শিম্পাঞ্জীরা আফ্রিকায় তাদের দেশে জঙ্গলের সবচেয়ে ওপরের তলায় বাস করে। সেখানে গাছের ডালে তারা বাসা বাঁধে। গাছে উঠে তারা শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। গাছে তারা তাদের খাদ্য ফলমূল আর বাদামের সন্ধান পায়। গাছের জীবনে শিম্পাঞ্জী এমন অভ্যস্ত যে সমান মাটিতে চলাফেরার চেয়ে অনেক
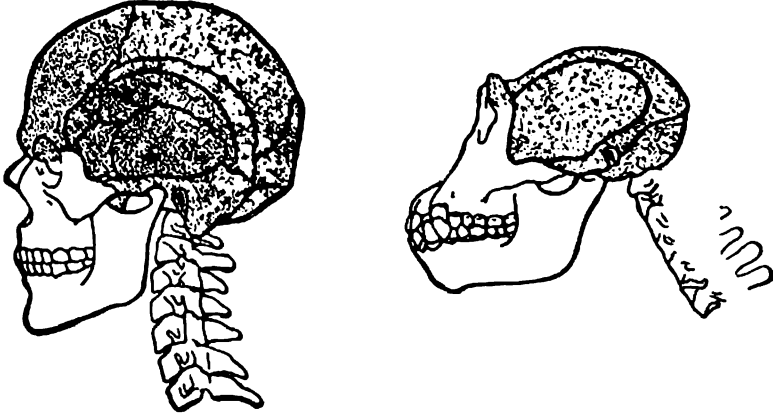
শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্কের চেয়ে মানুষের মস্তিষ্ক আয়তনে অনেক বড়।

সহজে সে গাছের ঝুলন্ত কাণ্ডে কাণ্ডে ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারে। যেখানে জঙ্গল নেই সেখানে শিম্পাঞ্জীকেও দেখতে পাবে না।

একবার একজন বিজ্ঞানী শিম্পাঞ্জীরা তাদের জন্মস্থানে কী ভাবে বসবাস করে দেখার জন্য আফ্রিকার ক্যামেরুনসে যান। গোটা দশেক শিম্পাঞ্জীকে ধরে এনে যাতে তারা ঘরোয়াভাবে থাকতে পারে সেজন্য বিজ্ঞানী তাদের নিজের খামারের কাছাকাছি জঙ্গলে রাখলেন। আর তারা যাতে জঙ্গল থেকে পালিয়ে না যায় সেজন্য একটা অদৃশ্য খাঁচাও বানিয়ে দিলেন। এই খাঁচাটা বানানো হয় কেবল কুড়ুল আর করাত — এই দুই হাতিয়ারের সাহায্যে।

বিজ্ঞানীর নির্দেশমতো জঙ্গলের ভেতরকার একটা জায়গার চারদিক থেকে গাছগাছড়া কেটে সাফ করে ফেলা হল। ফলে জায়গাটা দেখতে হল খোলা মাঠের মাঝখানে একটা জংলা দ্বীপের মতন। এই দ্বীপটাতেই বিজ্ঞানী তাঁর শিম্পাঞ্জীগুলোকে বসবাস করার জন্য ছেড়ে দিলেন। বিজ্ঞানীর হিসেবে ভুল হয় নি। শিম্পাঞ্জীরা জঙ্গলের প্রাণী। তার মানে, স্বেচ্ছায় তারা জঙ্গল ছেড়ে যাবে না। শিম্পাঞ্জীর পক্ষে খোলা জায়গায় বসবাস করা অসম্ভব, যেমন অসম্ভব মেরুদেশের শ্বেতভালুকের পক্ষে মরুভূমিতে বসবাস করা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিম্পাঞ্জী যদি জঙ্গল থেকে সমতল ভূমিতে বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে কী করে তার আত্মীয়, মানুষ সেখান থেকে বেরিয়ে এলো?

আমাদের নায়ক হাঁটতে শিখল

আমাদের বুনো পূর্বপুরুষরা কেউ এক দিনে বা এক বছরে তাদের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে নি। জঙ্গল থেকে গাছপালা-ছাড়া সমতলভূমিতে বেরিয়ে আসার মতো স্বাধীন হতে তার লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যায়।

জঙ্গলের সঙ্গে যে শৃঙ্খলে সে বাঁধা তা ভাঙার জন্য বৃক্ষবাসী জীবকে আগে গাছ থেকে নেমে এসে মাটিতে হাঁটতে শিখতে হয়।

হাঁটতে শেখা মানুষের পক্ষে খুব একটা সহজ কাজ নয় — এমনকি আজকের দিনেও নয়। তোমরা যারা নার্সারী দেখেছ তারা জান যে সেখানে একটা বিশেষ দলে শুধু সেই সমস্ত বাচ্চা থাকে যারা হামাগুড়ি দেয়। এই বাচ্চারা এক জায়গায় চুপচাপ পড়ে থাকতে পারে না বটে, কিন্তু আবার হাঁটতেও জানে না। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে হাঁটতে শিখতে তাদের কয়েক মাস কেটে যায়। দু'হাতের ওপর

মাটিতে ভর না দিয়ে কিংবা কাছের কিছু না ধরে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটা কি ছেলেখেলা! সাইকেল চড়তে শেখার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ।

কিন্তু শিশুর হাঁটা শিখতে যেখানে কয়েক মাস লাগছে সেখানে আমাদের পূর্বপুরুষদের লেগে যায় হাজার হাজার বছর। অবশ্য এটা ঠিক যে আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন গাছের ডালে থাকত তখনও মাঝে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য গাছ থেকে তাদের মাটিতে নেমে আসতে হত। হতে পারে যে তখন সে সব সময় মাটিতে হাতে ভর না দিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দু-তিন পা হাঁটত। শিম্পাঞ্জীকেও অনেক সময় এরকম করতে দেখা গেছে। কিন্তু দু-তিন পা হাঁটা আর পঞ্চাশ কি একশ’ পা হাঁটা — দুটো এক কথা নয়।

কাজের জন্য মানুষের পা মুক্তি দিল হাতকে

আমাদের বনমানুষ পূর্বপুরুষ যখন বৃক্ষশাখায় বাস করত তখনই সে পায়ের চেয়ে ভিন্নভাবে হাতের ব্যবহার করা শেখে। হাত দিয়ে সে ফলমূল আর বাদাম পাড়ত, গাছের জোড়া ডালের ফাঁকে বাসা বাঁধত। যে হাত তার বাদাম পাড়ত সেই একই হাত আবার পাথর কিংবা লাঠিও তুলতে পারত। আর পাথর কিংবা লাঠি হাতে থাকার অর্থ হাতটা সেই একই হাত হলেও আরও লম্বা আর বলশালী হয়ে পড়ল।

শক্ত খোলার যে বাদাম দাঁত দিয়ে ভাঙা যায় না পাথর দিয়ে তা ভাঙা সম্ভব। লাঠি দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে মাটির নীচ থেকে খাদ্যোপযোগী শেকড়বাকড় তোলা যায়।

দেখতে দেখতে মানুষ ক্রমেই আরও বেশি করে নতুন পন্থায় তার খাদ্য বার করতে লাগল। মাটি খুঁড়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সে শেকড়বাকড় কন্দ এই সব বার করত। পাথর দিয়ে পুরনো গাছের গুঁড়ির ছালের ওপর আঘাত করে সেখান থেকে বার করত পোকামাকড়ের শূককীট। কিন্তু হাত দিয়ে কাজ করতে গেলে হাতের অন্য কাজ, হাঁটা থেকে তাকে রেহাই দিতে হয়। হাত যত বেশি কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ততই বেশি করে হাঁটার কাজ এসে চাপে দু’পায়ের ওপর। এই ভাবে হাত পায়ের ওপর হাঁটার কাজ ছেড়ে দিল, আর পা হাতকে কাজকর্মের

জন্য মুক্ত করে দিল। পৃথিবীতে দেখা দিল এক অভূতপূর্ব নতুন জীব, যে পেছনের দু'পায়ে হাঁটে আর সামনের দুটি দিয়ে কাজ করে।

এই নতুন জীবের চেহারা তখনও জন্তুদের মতোই ছিল। কিন্তু তোমরা যদি কেউ দেখতে কেমন করে সে পাথর বা লাঠিকে কাজে লাগায়, তাহলে তক্ষুণি তোমরা বুঝতে পারতে যে এ হল এমন এক প্রাণী যাকে প্রাচীনতম মানুষ বলা যেতে পারে। আর আসলেও তাই, কেননা মানুষ ছাড়া আর কেউই হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে না। জীবজন্তুদের কোন হাতিয়ার নেই।

জার্বোয়ার বা ছুঁচো যখন মাটি খোঁড়ে তখন সে কোদাল বা ঐ জাতীয় কোন হাতিয়ার নেয় না। সে তার নিজের থাবা দিয়েই মাটি খোঁড়ে। ইঁদুর যখন গাছ কাটে বা চিবোয় তখন সে ছুরি ব্যবহার করে না, দাঁত দিয়েই কাজ সারে। কাঠঠোকরাও তুরপুন দিয়ে গাছ ফুটো করে না, নিজের ঠোঁটই লাগায় এ কাজে।

আমাদের পূর্বপুরুষের অমন তুরপুনের মতো ঠোঁট, কোদালের মতো থাবা, ছুরির মতো ধারাল সম্মুখের দাঁত — এসব কিছুই ছিল না। কিন্তু তার যা ছিল তা যে-কোন ধারাল দাঁত বা শক্ত ঠোঁটের চেয়ে অনেক ভালো। তার ছিল হাত, আর এই হাত দিয়ে সে মাটি থেকে পাথর তুলে তা দিয়ে কাটার কাজ চালাত, কাঠ তুলে নিয়ে তা দিয়ে নখরের কাজ চালাত।

আমাদের নায়ক মাটিতে নামল

এই সমস্ত ঘটনা যখন ঘটতে থাকে তখন পৃথিবীর জলবায়ুও অল্প অল্প করে বদলে যাচ্ছিল। আমাদের বনমানুষ পূর্বপুরুষরা যে সমস্ত জায়গায় থাকত সেখানে ধীরে ধীরে রাত বেশি ঠান্ডা হয়ে উঠছিল, শীতকালও হচ্ছিল বেশ কনকনে। আবহাওয়া তখনও উষ্ণ, তবে গরম তাকে আর তখন বলা চলে না। পাহাড়পর্বতের উত্তরাংশের ঢালে চিরহরিৎ পাম, ম্যাগনোলিয়া, লরেল-এর জায়গায় স্থান নিল ওক আর লিন্ডেন।

আজও নদ-নদীর উপকূলভাগের শক্ত পলিতে প্রাচীন ওক ও লিন্ডেন গাছের প্রস্তরীভূত পাতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত গাছের পাতা কোন এক সময় বর্ষণধারার সাহায্যে নদীতে বাহিত হয়ে এসেছে।

ঠান্ডা হাওয়ার হাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য ডুমুরগাছ আর আঙুরের থোকা আস্তে আস্তে লুকিয়ে পড়ল পাহাড়ের উপত্যকায়, নয়ত সরে গেল দক্ষিণের ঢালে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমির সীমানা ক্রমে দক্ষিণ থেকে আরও দক্ষিণে সরে যেতে লাগল। আর সেই সমস্ত জঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাসিন্দারাও সরে যেতে লাগল দক্ষিণে। হাতীর পূর্বপুরুষ চলে গেল, ছুরি-দাঁত বাঘ আর প্রায় চোখেই পড়ে না।

এককালে যেখানে ঘন গাছপালা ছিল এখন সেখানে গাছপালা সরে গিয়ে দেখা দিল পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা। দৈত্যাকার গণ্ডার আর হরিণের দল সেখানে চরে বেড়াত। বনমানুষদের মধ্যে একদল পালিয়ে বাঁচল, অন্যেরা লোপ পেল।

বনে আঙুর কমে গেল, ডুমুরগাছ খুঁজে পাওয়াই ভার। বনজঙ্গলে চলাফেরা করাও দুরূহ। জঙ্গল পাতলা হয়ে গেছে — এক ধরনের গাছপালা থেকে আরেক ধরনের গাছপালায় যাতায়াত করতে হলে মাটির ওপর দিয়ে ছুটে যেতে হত। কিন্তু বৃক্ষবাসী জীবের পক্ষে মাটির ওপর দিয়ে চলাফেরা করা তেমন সহজ নয়। যে-কোন মুহূর্তে কোন ধূর্ত হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ারও আশঙ্কা আছে।

অথচ উপায়ও নেই। ক্ষুধার তাড়নায় আমাদের পূর্বপুরুষ গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হল। আরও ঘন ঘন তাকে খাদ্যের সন্ধানে মাটিতে নেমে ঘোরাঘুরি করতে হত।

কিন্তু একটা প্রাণী যে জঙ্গলের জগতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল সেই অভ্যস্ত খাঁচা ছেড়ে বাইরে চলে আসার ফলে তার অবস্থা কী হল? এই বেরিয়ে আসার মানে হল জঙ্গলের সমস্ত আইনকানুন ভঙ্গ করা, জীবজন্তুরা যে শৃঙ্খলে প্রকৃতির বুকে নিজের নিজের জায়গায় বাঁধা ছিল তা ভেঙে ফেলা।

পশুপাখিদের অবশ্যই পরিবর্তন ঘটে। জগতে কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। কিন্তু বদল হওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। নখর ও থাবাওয়ালা একটা ছোট্ট বন্যজন্তুকে আজকের ঘোড়ায় বদল হতে কোটি কোটি বছর সময় লেগেছে। সেই জন্তুর কোন বংশের শাবকের সঙ্গে তার মা-বাপের বিশেষ কোন অমিল থাকত না বললেই চলে। আগেকার জাতের চেয়ে অন্য রকম, নতুন কোন জাতের উদ্ভব ঘটে হাজার হাজার প্রজন্মের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

আচ্ছা, আমাদের পূর্বপুরুষের বেলায় কী রকম ঘটেছিল? আমাদের পূর্বপুরুষ যদি তার জীবনযাত্রার প্রণালী ও অভ্যাস বদল করতে না পারত, তাহলে তাকে বনমানুষদের সঙ্গে চলে যেতে হত দক্ষিণে। কিন্তু ইতিমধ্যে বনমানুষের সঙ্গে তার তফাত দেখা দিতে শুরু করেছে। সে এখন পাথর আর কাঠকে কষের দাঁত ও নখরের মতো করে কাজে লাগিয়ে খাদ্য বার করতে শিখেছে। জঙ্গলে এখন দক্ষিণের রসাল ফলমূল ক্রমেই কমে আসছে, কিন্তু তাতে তার কোন অসুবিধা হয়

না — দরকার হলে সেসব ছাড়াও সে দিব্যি চালিয়ে দিতে পারে। এখন ত আর সে আগের মতন নেই! এখন মাটিতে হাঁটতে শিখেছে, তাই বনজঙ্গল-ছাড়া খোলা জায়গায় তার ভয় করে না। আর শত্রুর মুখোমুখি যদি পড়েই যায় প্রাচীন মানুষদের পুরো দঙ্গলটা তখন পাথর আর লাঠির সাহায্যে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হয়।

আমাদের নায়ক হাতিয়ার ধরেছে।

এখন যে কঠিন ঋতু শুরু হল তাতে আমাদের আধা বনমানুষ পূর্বপুরুষদের কেউ মরল না, গ্রীষ্মমণ্ডলের বনাঞ্চল সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সরে যেতে হল না, এতে বরঞ্চ তাদের মানুষ হবার পথই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে গেল।

আর আমাদের যারা আত্মীয় সেই বনমানুষদের কী হল?

গ্রীষ্মমণ্ডলের বনজঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে তারাও সরে যেতে লাগল। ফলে তারা আগের মতোই বনবাসী হয়ে রইল। আর সরে না গিয়ে তাদের উপায়ও ছিল না, কেননা বিকাশের দিক থেকে তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল, হাতিয়ার ব্যবহারের পর্যায়ে তারা পৌঁছুতে পারে নি। তাদের মধ্যে আবার যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান তারা জঙ্গলের সবচেয়ে উঁচু তলায় বসবাস করতে লাগল, আরও ভালোভাবে এ গাছে সে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে শিখল, আরও ভালো করে গাছের ডালপালা আঁকড়ে ধরতে শিখল।

যে-সব বনমানুষ একটু কম চটপটে তাদের ভাগ্যটা হল অন্য রকম। তারা গাছের জীবনে তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারল না। তাদের মধ্য থেকে যারা সবচেয়ে বড় আর বলশালী কেবল তারাই টিকে রইল। কিন্তু যে জীব আকারে যত বড় আর ভারী তার পক্ষে গাছে বাস করা তত কঠিন। কাজেই ইচ্ছে থাক আর না-ই থাক এই প্রকাণ্ড বনমানুষদের গাছ থেকে নেমে আসতে হল মাটিতে। যেমন গরিলারা। তারা আজও জঙ্গলে বাস করে জঙ্গলের প্রথম তলায়। আর মাটিতে তারা লাঠি আর পাথর দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করে না, করে তাদের শক্তিশালী চোয়ালের অস্ত্র বিশাল বিশাল কষের দাঁত দিয়ে।

এমনি করে মানুষ আর তার আত্মীয়-কুটুম্বদের পথ আলাদা আলাদা হয়ে গেল।

হারানো সূত্র

মানুষ রাতারাতি দু'পায়ে হাঁটতে শেখে নি। প্রথম প্রথম মানুষের হাঁটাচলার ভঙ্গি সম্ভবত ছিল বিশ্রী, সে হয়ত স্থিরভাবে পাও ফেলতে পারত না। তখন মানুষ, মানে আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, বনমানুষ দেখতে কেমন ছিল?

জীবন্ত বনমানুষ আজ আর কোথাও নেই। তবে মাটির নীচে খোঁজাখুঁজি করলে কোথাও না কোথাও কি তাদের হাড়গোড় পাওয়া যাবে না? এই সমস্ত হাড়গোড় খুঁজে পেলে বানর থেকে মানুষের উৎপত্তির সঠিক প্রমাণ পাওয়া যেত। বানর থেকে আধুনিক মানুষে রূপান্তরের যে ধারা এই বনমানুষেই হচ্ছে তার মাঝখানের যোগসূত্র। কাদামাটি ও বালুর গভীরে, নদীর পলিস্তরের নীচে এই সূত্র বেমালুম হারিয়ে গেছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়তে জানেন। কিন্তু মাটি খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করার আগে স্থির করে নিতে হয় কোথায় খুঁড়তে হয়, কোথায় খুঁজতে হয় এই হারানো সূত্র? পৃথিবীর সর্বত্র হাতড়ে হাতড়ে দেখা কি অতই সহজ? মাটির নীচে কোথায় প্রাচীন মানুষের হাড়গোড় আছে তা খুঁজে বার করতে যাওয়া বোধহয় মরুভূমির বালুর ভেতরে হারানো ছুঁচ খোঁজার চেয়েও কঠিন।

গত শতাব্দীর শেষে বিখ্যাত জার্মান জীববিজ্ঞানী এর্ন্স্ট হেকেল একটা অনুমান প্রকাশ করলেন — আচ্ছা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে পিথেকানথ্রোপাস বলা হয় সেই বনমানুষের হাড়গোড় দক্ষিণ এশিয়ার কোথাও কি পাওয়া যেতে

এখানে বেনগাওয়ান নদীর তীরে পিথেকানথ্রোপাসের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে।

পারে না? তিনি ম্যাপে ঠিক দেখিয়েও দিলেন যে সুন্দা দ্বীপ হল সেই জায়গা যেখানে, তাঁর ধারণায়, পিথেকানথ্রোপাসের হাড় থাকা সম্ভব।

অনেকেরই কিন্তু মনে হল যে হেকেলের ধারণার তেমন একটা ভিত্তি নেই। কিন্তু ধারণাটা বৃথা গেল না। এমন একজন লোকের দেখা পাওয়া গেল যাঁর এই ধারণায় এত বেশি বিশ্বাস ছিল যে তিনি সমস্ত কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাল্পনিক পিথেকানথ্রোপাসের কাল্পনিক হাড়ের খোঁজে সুন্দা দ্বীপে যাত্রা করলেন। তিনি হলেন আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরসংস্থানবিদ্যার অধ্যাপক ইউজিন দুবোয়া। তাঁর বহু সহকর্মী অধ্যাপক ঘাড় নেড়ে বলাবলি করতে লাগলেন, এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করলেন যে সুস্থ মস্তিষ্কের কোন লোক একাজ করতে পারে না। এই সব লোকেরা নিজেরা ছিলেন ধীরস্থির প্রকৃতির। রোজ ছাতা হাতে করে আমস্টার্ডামের শান্ত পথ ধরে বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি — এই হল তাঁদের অভ্যস্ত ভ্রমণ।

দুবোয়া তাঁর দুঃসাহসী পরিকল্পনা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে সামরিক চাকরীতে যোগ দিলেন। সামরিক বাহিনীর ডাক্তার হয়ে তিনি আমস্টার্ডাম থেকে যাত্রা করলেন সুদূর সুমাত্রা দ্বীপে।

সুমাত্রায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে দুবোয়া মহা উৎসাহে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিলেন। তাঁর নির্দেশমতো খননকর্মীরা মাটি খুঁড়তে লেগে গেল, খুঁড়তে খুঁড়তে মাটির পাহাড় জমে গেল। একমাস যায়, দেখতে দেখতে দু'মাস, তিনমাসও কেটে গেল, কিন্তু পিথেকানথ্রোপাসের হাড় আর মেলে না।

মানুষ কোন কিছু হারালে যখন তার খোঁজ করে তখন তার অন্তত এটা জানা থাকে যে হারানো জিনিসটা কোথাও না কোথাও আছে এবং ভালোমতো খোঁজাখুঁজি করলে তার সন্ধান নিশ্চয়ই মিলবে। দুবোয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সে রকম নয়। তাঁর একমাত্র সম্বল ছিল অনুমান; পিথেকানথ্রোপাসের হাড় যে আছেই এমন কথা জোর দিয়ে প্রমাণ করার উপায় তাঁর ছিল না। তবু তিনি জিদ ধরে রইলেন—খোঁজাখুঁজির কাজ চালিয়ে গেলেন। এমনি করে বছর পেরিয়ে যায়, দেখতে দেখতে দু'বছর, তিন বছরও কেটে যায়, কিন্তু হারানো সূত্রের সন্ধান আর মেলে না।

দুবোয়ার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়ত অনেক আগেই অকারণ খোঁজা ছেড়ে দিত। দুবোয়ারও হয়ত মাঝে মাঝে সন্দেহ হত। কিন্তু যে কাজ তিনি করবেন বলে ভেবেছেন তা মাঝপথে ছেড়ে দেবার পাত্র দুবোয়া নন।

সুমাত্রায় পিথেকানথ্রোপাসের সন্ধান না পেয়ে তিনি ঠিক করলেন সুন্দা
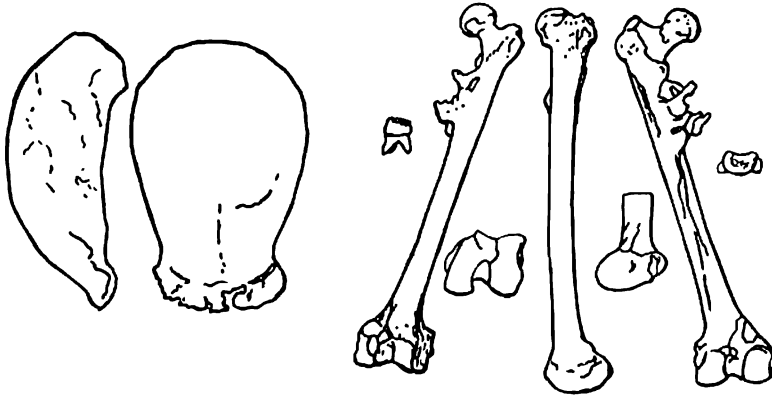
পিথেকানথ্রোপাসের হাড়।

দ্বীপমালার অন্য দ্বীপ জাভায় গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবেন। এখানে ভাগ্য প্রসন্ন হল তাঁর ওপর। ত্রিনিল গ্রামের কাছাকাছি একটা জায়গায় তিনি পিথেকানথ্রোপাসের মাথার খুলির ওপরের অংশ, নীচের চোয়ালের ভাঙা টুকরো, গোটা কয়েক দাঁত আর ঊরুর হাড় পেলেন।

নিজের পূর্বপুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে না-পাওয়া মুখের যে গড়নের কথা দুবোয়া কল্পনা করেছিলেন তা হল নীচু, ক্রমে ঢালু হয়ে আসা কপাল, আর কপালের নীচে যেখানে ভ্রূজোড়া থাকে সেখানে মোটা হাড়ের খাঁজ — তারই নীচে, কোটরের ভেতরে ঢুকে আছে চোখজোড়া। এই মুখটার সঙ্গে মানুষের চেয়ে বানরেরই মুখের মিল বেশি। কিন্তু মাথার খুলির ওপরের অংশ ভালো করে দেখার পর দুবোয়ার কোন সন্দেহ রইল না যে পিথেকানথ্রোপাস বানরের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি যে-কোন বানরের চেয়ে তার মস্তিষ্কের গহ্বরের আয়তন বেশি।

খুলির ওপরের অংশ, দাঁত এবং হাড়ের কয়েকটা ভাঙা টুকরো — এগুলো অবশ্য খুবই কম। কিন্তু তাহলেও, এ থেকেই দুবোয়া অনেকগুলো তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। ঊরুর হাড় এবং হাড়ের গায়ে পেশীবহুল কন্ডরের প্রায় অলক্ষিত দাগ ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার পর দুবোয়া এই সিদ্ধান্তে এলেন যে পিথেকানথ্রোপাস ইতিমধ্যে কোন রকমে হাঁটতেও শিখেছিল।

দুবোয়া অনায়াসে কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন তাঁর পূর্বপুরুষকে, দেখতে পেলেন কুঁজো হয়ে লম্বা লম্বা হাতদুটো ঝুলিয়ে হাঁটুর কাছে পা বাঁকিয়ে বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গায় সে টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে। ঝোলা ভুরুর নীচেকার কোটরের ভেতর থেকে তার চোখজোড়া তাকিয়ে আছে নীচের দিকে — খাবারের সন্ধানে।

এই জন্তুটা অবশ্যই বনমানুষ নয়, কিন্তু তাই বলে সত্যিকারের মানুষও নয়। দুবোয়া স্থির করলেন তাঁর এই আবিষ্কারের একটা নতুন নাম দেবেন। তিনি এর নাম দিলেন পিথেকানথ্রোপাস ইরেক্টাস (যে পিথেকানথ্রোপাস সোজা হয়ে চলে), কারণ বনমানুষের তুলনায় সে অবশ্যই সোজা হয়ে চলত।

তোমরা হয়ত ভাবছ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। পিথেকানথ্রোপাসের সন্ধান যখন পাওয়া গেল তখন আর কী? কিন্তু এখান থেকেই শুরু হল দুবোয়ার জীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়। মাটির স্তর খোঁড়া অনেক সহজ কিন্তু মানুষের বদ্ধমূল কুসংস্কারের স্তর ভেদ করা অনেক বেশি কঠিন।

যারা জিদ ধরে বলেছিল যে বানর থেকে মানুষের উৎপত্তির তত্ত্ব কোনমতেই

স্বীকার করবে না, দ্যুবোয়ার আবিষ্কারের বিরুদ্ধে তারা প্রবল আপত্তি তুলল, প্রতিবাদের ঝড় বইয়ে দিল। গির্জার যত পাদ্রী-পুরোহিত ও তাঁদের অনুগামীরা উঠে পড়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যে দ্যুবোয়ার পাওয়া ঐ মাথার খুলিটা আসলে একটা গিবনের আর ঊরুর হাড় একালের কোন মানুষের। এই ভাবে দ্যুবোয়ার বনমানুষকে মানুষ ও বনমানুষের একটি আঙ্কিক যোগফলে পরিণত করেই তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা দ্যুবোয়ার আবিষ্কারের প্রাচীনত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন, প্রমাণ করতে চাইলেন যে দ্যুবোয়ার পাওয়া ঐ হাড় লক্ষ লক্ষ বছর ত দূরের কথা, অল্প কয়েক বছর হল মাটির নীচে পড়ে ছিল। মোট কথা, মাটি খুঁড়ে পিথেকানথ্রোপাসকে ফের কবরস্থ করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি দেখা গেল না।

পিথেকানথ্রোপাস দেখতে সম্ভবত এই রকম ছিল। তাকে সত্যিকারের মানুষ বলা যায় না বটে, আবার বানরও ঠিক বলা চলে না।

দ্যুবোয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে অসীম সাহসের পরিচয় দিলেন। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গুরুত্ব যাঁরা বুঝতেন তাঁরা সকলেই তাঁকে সমর্থন জানালেন। বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে দ্যুবোয়া ঘোষণা করলেন যে পিথেকানথ্রোপাসের মাথার খুলি মোটেই গিবনের নয় — গিবনের সামনের দিকে বের-করা কপাল থাকে না, কিন্তু পিথেকানথ্রোপাসের থাকে।

বছরের পর বছর কেটে গেল। পিথেকানথ্রোপাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আর কাটল না। এমন সময় বিজ্ঞানীরা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন নতুন এক বনমানুষ। পিথেকানথ্রোপাসের সঙ্গে তার অনেক মিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক বিজ্ঞানী চীনের রাজধানী বেইজিং-এর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে চীনা ওষুধ দেখার জন্য এক ওষুধের দোকানে ঢোকেন। দোকানে নানা রকমের সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস সাজানো ছিল। সেগুলোর মধ্যে ছিল মানুষের আকৃতির মতো দেখতে ভেষজ গুণসম্পন্ন জিনসেং শেকড়, জীবজন্তুদের

হাড়গোড়, দাঁত আর রাজ্যের যত তাবিজ কবচ।

হাড়গোড়ের মধ্যে বিজ্ঞানী এমন একটা দাঁত খুঁজে পেলেন যাকে কোনমতেই কোম জন্তুর দাঁত বলা চলে না। অথচ আজকের দিনের মানুষের দাঁতের সঙ্গেও তার তফাত চোখে পড়ার মতন। তিনি দাঁতটি কিনে ইউরোপের এক মিউজিয়মে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তাঁরা সেটাকে 'চীনা দাঁত' নাম দিয়ে সযত্নে তালিকাভুক্ত করে রাখলেন।

দুই দশকেরও বেশি সময় কেটে গেল। অবশেষে নেহাৎই আকস্মিকভাবে বেইজিং-এর অনতিদূরে চৌকৌতিয়ান্ গুহায় ঐরকম আরও দুটো দাঁতের সন্ধান পাওয়া গেল। পরে ঐ দাঁত যার, তার কঙ্কালটাও পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা তার নাম রাখলেন সিনানথ্রোপাস।

সত্যি বলতে গেলে কি তার পুরো কঙ্কালটা পাওয়া যায় নি। নানা ধরনের কতকগুলো হাড়গোড়ের সমষ্টিমাত্র। তার মধ্যে ছিল গোটা পঞ্চাশেক দাঁত, তিনটি খুলি, এগারোটি চোয়াল, এক টুকরো জঙ্ঘাস্থি, মেরুদণ্ডের হাড়, কণ্ঠাস্থি, হাতের কবজি, পায়ের গোড়ালির এক টুকরো হাড়।

এ থেকে তোমরা যেন আবার ভেবে বসো না যে গুহাবাসীটির তিনটি মাথা আর একটি পা ছিল। এর ব্যাখ্যা খুবই সহজ। গুহায় শুধু একজন নয় পুরো এক দল সিনানথ্রোপাস থাকত। লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্যে বহু হাড়গোড়ই হারিয়ে গেছে। বন্য জন্তুরাও সেগুলোকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে-সব হাড়গোড় পাওয়া গেছে তা থেকেও ধারণা করতে অসুবিধা হয় না কেমন দেখতে ছিল এই গুহাবাসীরা। বিজ্ঞানীর দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দিলেই হল, তিনি পুরো মানুষটাকে টেনে বার করবেন।

সেই সুদূর অতীতযুগের নায়ক কেমন ছিল দেখতে?

স্বীকার করতে বাধা নেই, আহা-মরি সুন্দর চেহারা তার মোটেই ছিল না। বরং তাকে দেখতে পেলে তোমরা হয়ত ভয়ে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যেতে। মুখটা সামনের দিকে বাড়ানো, লোমশ লম্বা লম্বা হাতজোড়া — তখনও বানরের সঙ্গে তার রীতিমতো মিল। প্রথম কয়েক মুহূর্তের জন্য বানর বলে মনে হলেও একটু পরেই কিন্তু তোমাকে মত বদলাতে হবে। তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে, আচ্ছা, বানর কি মানুষের মতো এমন সোজা হয়ে হাঁটতে পারে? মানুষের মুখের সঙ্গে কি বানরের মুখের এতখানি মিল থাকতে পারে? তুমি যদি ধীরে ধীরে সিনানথ্রোপাসের পেছন পেছন তার গুহায় যেতে পারতে, তাহলে তোমার সমস্ত সন্দেহই দূর হয়ে যেত।

বিজ্ঞানীরা সিনানথ্রোপাসের মাথার খুলি থেকে তার চেহারা গড়ে তোলার চেষ্টা **করেন।**

বাঁকা পায়ে বিশ্রীভাবে থপ্ থপ্ করে নদীর ধার দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ হয়ত সে বসে পড়ল বালির ওপর। একটা বড় পাথরের ওপর তার নজর পড়ল। পাথরটা হাতে নিয়ে সে ভালো করে নিরীক্ষণ করে আরও একটা পাথরের ওপর সেটাকে ঠুকল। তারপর জিনিসটাকে সঙ্গে নিয়ে সে আবার পথ চলতে শুরু করল।

তাকে অনুসরণ করে চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছুবে খাড়া পাড়ে। সেখানে গুহার মুখে এসে জড় হয়েছে সমস্ত গুহাবাসী। ওরা ভিড় করে গাদাগাদি হয়ে আছে। এক দাড়িওয়ালা লোমশ বুড়ো পাথরের অস্ত্র দিয়ে হরিণের মাংস কাটছে। তার পাশে মেয়েরা হাত দিয়ে মাংস টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে। বাচ্চারা মাংসের টুকরোর জন্য বায়না করছে। সমস্ত দৃশ্যটাকে আলোকিত করে তুলছে গুহার ভেতরকার প্রজ্জ্বলিত ধুনি।

এই বারে তোমাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। কোন বনমানুষের পক্ষে কি ধুনি জ্বালানো বা পাথরের অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব?

কিন্তু পাঠক সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করতে পারে, সিনানথ্রোপাস যে অস্ত্র বানাতে পারত এবং আগুনের ব্যবহার জানত তার প্রমাণ কী?

চৌকৌতিয়ানের গুহাই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। এই গুহা খোঁড়ার সময় তার ভেতরে হাড়গোড় ছাড়াও আরও বহু জিনিস পাওয়া গেছে। সেগুলোর
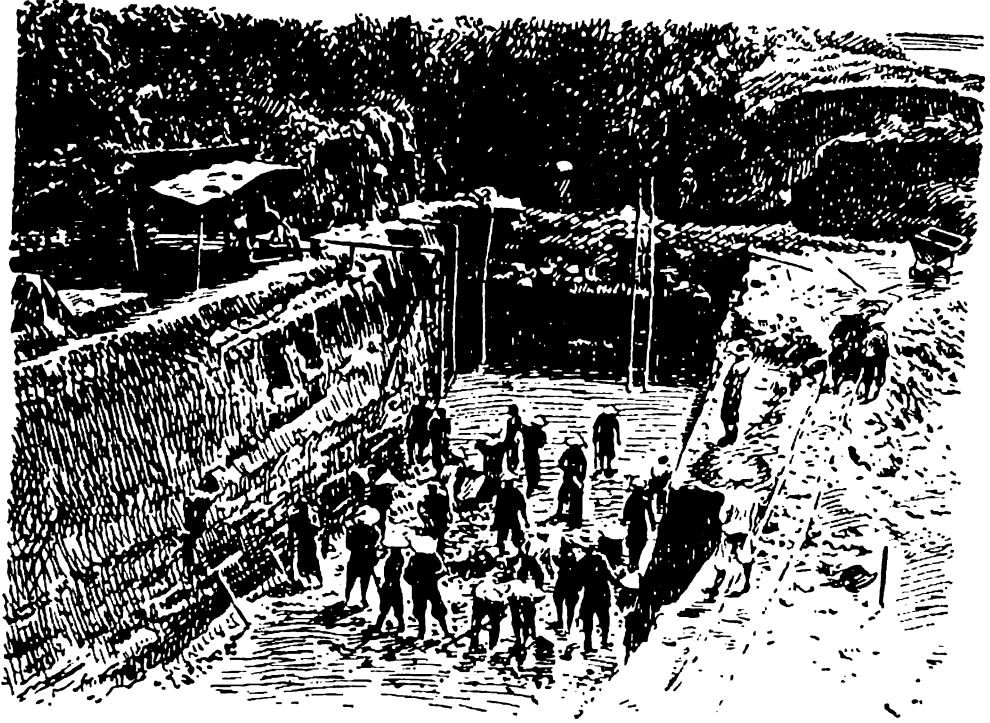
প্রত্নতত্ত্ববিদরা পিথেকানথ্রোপাসের হাড়গোড়ের খোঁজে জাভায় খননকার্য চালাচ্ছেন।

মধ্যে ছিল মাটি মেশানো ছাইয়ের একটা পুরু স্তর এবং একগাদা স্থূল পাথুরে হাতিয়ার।

হাতিয়ার পাওয়া গেছে দু' হাজারেরও বেশি, কিন্তু ছাইয়ের স্তর সাত মিটার সমান পুরু। এতে বোঝা যায় সিনানথ্রোপাসরা বহুকাল এই গুহায় বাস করে এবং বহু বছর ধরে তারা আগুন জ্বালিয়ে রেখে ছিল। আগুন খুব সম্ভব তারা তখনও জ্বালাতে শেখে নি, তবে খাওয়ার জন্য ফলমূল বা হাতিয়ারের পাথর জোগাড় করার মতো আগুনও হয়ত জোগাড় করে এনে রাখত। জঙ্গলের দাবানল থেকে আগুন পেতে কোন বাধা নেই। আগুন জ্বলতে দেখলে সিনানথ্রোপাস হয়ত সাবধানে জ্বলন্ত খড়ি নিয়ে আসত বাড়িতে। তারপর গুহার ভেতরে ঝড়বৃষ্টির আড়ালে মহামূল্য রত্নের মতো তাকে সযত্নে রক্ষা করত।

মানুষ আইন লঙ্ঘন করল

আমাদের নায়ক পাথর আর লাঠি হাতে নিতে শিখল। সঙ্গে সঙ্গে তার জোর আর স্বাধীনতা গেল বেড়ে। ধারেকাছে উপযুক্ত কোন ফলমূল বা বাদামের গাছ থাকল কি না থাকল এখন আর তাতে তার কিছু আসে যায় না। খাদ্যের সন্ধানে সে তার আজন্ম পরিচিত জায়গা ছেড়ে দূরে যেতে পারে। জঙ্গলের একটা ছোট জগৎ ছেড়ে আরেকটা ছোট জগতে যেতে পারে, সমস্ত আইনকানুন লঙ্ঘন করে অনেকক্ষণ খোলা জায়গায় থাকতে পারে, এমন সমস্ত খাদ্য সে খুঁজে বার করতে পারে যা খেয়ে দেখার কথা সে এতকাল ভাবতেও পারে নি।

এই ভাবে দুঃসাহসিক অভিযানে পরিপূর্ণ জীবনের একেবারে গোড়ায় মানুষ প্রকৃতিতে বিদ্যমান সমস্ত আইনকানুন ভাঙতে শুরু করল। বৃক্ষবাসী এই জীবটি সত্যি সত্যিই গাছ থেকে নেমে মাটিতে চলাফেরা করতে লাগল। শুধু কি তাই? সে পেছনের দু' পায়ে দাঁড়াতেও পারে, আর সে যেভাবে হাঁটতে শুরু করেছে তার বংশে কেউ কখনও সেভাবে হাঁটত না। তার ওপর সে আবার এমন সব খাবার খায় যা তার খাওয়ার কথা নয় এবং সে সব খাবারও সে সংগ্রহ করে একেবারে অভিনব উপায়ে।

প্রকৃতিতে জীবজন্তু ও গাছপালা পরস্পর 'খাদ্যশৃঙ্খলে' বাঁধা। জঙ্গলে কোথাও হয়ত দেখতে পাবে কাঠবিড়ালি পাইনের বাদাম খাচ্ছে, আবার কাঠবিড়ালিকে খাচ্ছে জংলা বেজি। পাইনের বাদাম — কাঠবিড়ালি — জংলা বেজি: এই নিয়ে হল একটা শৃঙ্খল। কিন্তু কাঠবিড়ালি ত আর শুধু পাইনের বাদামই খায় না — ব্যাঙের ছাতা, অন্যান্য বাদাম, এই রকম আরও কত কি-ই না খায়। আবার কাঠবিড়ালিকেও শুধু যে জংলা বেজিতেই খায় এমন নয় — আরও সমস্ত হিংস্র প্রাণী আছে যারা ওদের খায়। এই যেমন ধর বাজপাখি। তাহলে পাওয়া যাচ্ছে দ্বিতীয় আরেকটি শৃঙ্খল: ব্যাঙের ছাতা ও বাদাম — কাঠবিড়ালি — বাজপাখি। জঙ্গলের সমস্ত অধিবাসীই এই রকম শৃঙ্খলে বাঁধা। আমাদের নায়কও

তার পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে পুরোপুরি 'খাদ্যশৃঙ্খলে' বাঁধা ছিল। সে ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত, আর নিজে হত তলোয়ার-দাঁত বাঘের শিকার।

হঠাৎ কিনা আমাদের নায়ক এই শৃঙ্খল ভাঙতে শুরু করে দিল! আগে যা কখনও খায় নি এখন সে তা খেতে আরম্ভ করেছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার পূর্বপুরুষেরা ছুরি-দাঁত বাঘের মতো হিংস্র জন্তুজানোয়ারের খাদ্য ছিল। এখন আর সে তাদের খাদ্য হতে রাজি নয়।

কোথা থেকে তার এত সাহস হল? যে মাটিতে হিংস্র পশুদের তীক্ষ্ন দাঁত তার জন্য ওঁত পেতে আছে গাছ থেকে সেখানে নেমে আসার সাহস সে পেল কী করে? গাছের নীচে ভয়ঙ্কর কুকুর বসে আছে দেখেও গাছ থেকে বিড়ালের নেমে আসা আর এ ত একই কথা।

মানুষ তার নিজের হাতের জোরেই এই সাহস পেল। যে পাথরখানা সে হাতে তুলে নিল, যে লাঠি তার খাদ্যসন্ধানের কাজে লাগত, তা-ই সে নিজেকে রক্ষার কাজে লাগাল। মানুষের প্রথম হাতিয়ারই হল তার প্রথম অস্ত্র। তা ছাড়া জঙ্গলে সে একা একা ঘুরে বেড়ায় না। কোন বন্য জন্তু আক্রমণ করলে গোটা দল সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। তারা এখন আর নিরস্ত্র নয়।

তা ছাড়া আগুনের কথা ভুললে চলবে না। আগুনের সাহায্যে মানুষ অতি ভয়ংকর জন্তুকেও ভয় দেখাতে পারে, তাকে তাড়াতে পারে।

হাতের ছাপ

মানুষ আগে যে শৃঙ্খলে গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল একবার তা থেকে কোন রকমে মুক্ত হওয়ামাত্র গাছ থেকে জমি, জঙ্গল থেকে নদীর উপত্যকা ধরে সে চলতে থাকল।

কিন্তু মানুষ যে নদীর উপত্যকা ধরে চলত এটা আমরা জানলাম কী করে? যাতায়াতের যে চিহ্ন সে রেখে গেছে তা থেকেই আমরা এমন সিদ্ধান্ত করতে পারছি। তোমরা প্রশ্ন করবে কেমন করে আজ এতকাল পরেও সে চিহ্ন থেকে গেল?

যাতায়াতের পথে সচরাচর যে পদচিহ্ন পড়ে আমরা তার কথা বলছি না। আমরা যে চিহ্নের কথা বলছি তা হল হাতের ছাপ।

আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগেকার কথা। ফ্রান্সের সোম নদীর উপত্যকায় একদল শ্রমিক মাটি খুঁড়ছিল। প্রাচীনকাল থেকে নদীবাহিত পলির নীচে যে-

সমস্ত বালি, কাঁকর আর পাথর এসে জমা হয় তারা সেগুলো খুঁড়ে তুলতে থাকে।

সে অনেককাল আগেকার কথা। সোম নদীর তখন বয়স কম, ধরণীর বুক চিরে সবে তার যাত্রা শুরু হয়েছে — সেই সময় সে এমন খরস্রোতা ছিল, তার শক্তি এত ছিল যে বড় বড় পাথরের চাঁই সে স্রোতের মুখে টেনে নিয়ে যেত। টেনে নিয়ে যাবার সময় পাথরে পাথরে ঘষা লাগত আর তারই ফলে পাথরের গায়ের সমস্ত অমসৃণ ভাব চলে যেত, ভাঙাচোরা শিলাগুলো পালিশ হয়ে গিয়ে ছোট ছোট নুড়িপাথরের আকার ধারণ করত। পরে নদীর গতিবেগ অনেকটা কমে এলো, নদী শান্ত হয়ে এলো। তখন ঐ সব পাথর আর নুড়ির ওপর পলিমাটি ও বালি জমে উঠল। ঐ সব জমে থাকা কাদামাটি আর বালির মধ্যেই শ্রমিকরা গাঁইতি দিয়ে খুঁড়ে নুড়িপাথর পাচ্ছিল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে কিছু কিছু পাথর পালিশ ছিল না। বরং ছিল অমসৃণ — যেন কেউ তাদের দু'পাশ থেকে ভেঙে দিয়েছে। তাদের এমন আকার কে দিতে পারে? এ ত আর নদীর কাজ হতে পারে না — তার কাজ হল পাথর পালিশ করা।

এই অদ্ভুত পাথরগুলো বুশে দ্য পের্থে নামে এক স্থানীয় অধিবাসীর নজরে পড়ে। বুশে দ্য পের্থে ছিলেন বিজ্ঞানী। তাঁর বাড়িতে সোম অববাহিকার মাটির ভেতর থেকে খুঁজে পাওয়া এটা-ওটা নানা জিনিস। সেগুলোর মধ্যে ম্যামথের দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ, গুহা-ভালুকের মাথার খুলি — এই সব ছিল। আজকের দিনের গোরু-ভেড়ার মতো সেই প্রাচীনকালে ঐ সমস্ত ভয়ংকর দানবও প্রায়ই সোম নদীতে জল পান করতে আসত। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষ কোথায়? বুশে দ্য পের্থে কোথাও তার কোন হাড়গোড় খুঁজে পেলেন না।

এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল বালির ভেতরে খুঁজে পাওয়া এই অদ্ভুত পাথরগুলো। কে অমন করে ওগুলোর দু'পাশ ধারাল করতে পারে? বুশে দ্য পের্থে সাব্যস্ত করলেন এ কাজ একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব। বিজ্ঞানী প্রবল উত্তেজিত হয়ে খুঁজে পাওয়া জিনিসগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। এগুলো প্রাচীন মানুষের দেহাবশেষ নয় বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহে তার চিহ্ন — তার কাজের চিহ্ন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এ কাজ নদীর নয়, কারও হাতের।

বুশে দ্য পের্থে তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে একটা বই লিখলেন। বইটার একটা জবরদস্ত নামও দিলেন: 'সৃষ্টিরহস্য — জীবন্ত প্রাণীর উদ্ভব ও বিকাশ সংক্রান্ত রচনা'।

এর পরই শুরু হয়ে গেল লড়াই। পরবর্তীকালে দুবোয়ার ওপরে যেমন হয়েছিল তেমনি বুশে দ্য পের্থের ওপরও চারদিক থেকে আক্রমণ চলল। চাঁই চাঁই

একমাত্র মানুষের হাতেই পাথর এই রকম আকার পেতে পারে। বল্লমের আগা, চামড়া পালিশ করার চাকতি ও কাটারি।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা উঠে পড়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যে পুরাতন বস্তুর শৌখিন সংগ্রহকারী এই গ্রাম্য লোকটির বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই, তার পাথরের 'কুড়ুল' হল জাল আর তার এই বই বেআইনী ঘোষণা করা উচিত, কারণ এতে মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে গির্জার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। বুশে দ্য পের্থে আর তার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে লড়াই চলল পুরো পনেরোটি বছর। ক্রমে বুশে দ্য পের্থের বয়স বাড়ল, তাঁর চুলে পাক ধরল, কিন্তু তিনি একগুঁয়ের মতো লড়াই চালিয়ে গেলেন, পৃথিবীতে মানবজাতির প্রাচীনত্ব প্রমাণের চেষ্টা থেকে তিনি নিবৃত্ত হলেন না। প্রথম বইটির কিছুকাল পর তিনি আরেকটি বই লিখলেন, তারপর আরও একটি।

লড়াইটা সমানে-সমানে ছিল না, তবু শেষ পর্যন্ত বুশে দ্য পের্থেরই জয় হল। দুই বিখ্যাত ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লিয়েল ও যোসেফ্ প্রেস্টউইচ এগিয়ে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। তাঁরা সোম উপত্যকায় এসে খাদগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন, বুশে দ্য পের্থে-এর সংগৃহীত বস্তুগুলোও পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর খুব ভালো করে বিচার-বিবেচনা করে জানালেন যে দ্য পের্থের সংগৃহীত হাতিয়ারগুলো খাঁটি জিনিস — ফ্রান্সে যখন হাতি ও গণ্ডার ঘুরে বেড়াত সেই সময় ফ্রান্সে বসবাসকারী আদিম মানুষের হাতিয়ার ওগুলো।

লিয়েল-এর বই 'প্রাচীন মানুষের ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ' দ্য পের্থের বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করে দিল। তখন সবাই বলতে শুরু করল দ্য পের্থে, সত্যি কথা বলতে গেলে কি, নতুন কিছুই আবিষ্কার করেন নি, আদিম মানুষের হাতিয়ার এর আগেও পাওয়া গেছে।

লিয়েল বেশ কৌতুক করে তার উত্তরে বললেন, 'যখনই বিজ্ঞানের কোন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয় তখন লোকে প্রথমে তা অশাস্ত্রীয় বলে রব তোলে, কিন্তু এরাই আবার পরে বলে এ ত অনেক আগেই সকলের জানা।'

দ্য পের্থে এককালে যে রকম সমস্ত পাথুরে হাতিয়ার আবিষ্কার করেছিলেন এখন সেরকম হাতিয়ার আরও অনেক পাওয়া যেতে লাগল। সেগুলো প্রায়ই পাওয়া যায় বিভিন্ন নদীর তীরে পাথরের টুকরো আর বালি খুঁড়তে গিয়ে।

এই ভাবে একালের শ্রমিকের গাঁইতি মাটির নীচে সেই সব সময়কার হাতিয়ার খুঁজে বার করতে লাগল যখন মানুষ সবে কাজ করতে শিখেছিল।

পাথরের হাতিয়ারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হল অন্য এক টুকরো পাথরের সাহায্যে দু'ধার ভাঙা পাথরের টুকরো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় পাথরের সেই কুচি ও ভাঙা টুকরো যেগুলো পাথরখানা ভাঙার সময় ছিটকে পড়েছিল।

এই পাথরের হাতিয়ারগুলোই হল সেই হাতের ছাপ যা চিনে চিনে আমরা নদীর উপত্যকায় ও চড়ায় এসে পড়ি। সেখানে, নদীর পলি ও চড়ার মধ্যে মানুষ তার নকল কষের দাঁত ও নখের উপযুক্ত সামগ্রীর সন্ধান করত।

এ কাজ ছিল সত্যিকারের মানুষের কাজ। পশুপাখিরা তাদের খাবার নয়ত বাসা বাঁধার জিনিসের সন্ধান করতে পারে মাত্র। তারা কখনই নকল দাঁত অথবা নখ বানানোর উপযুক্ত জিনিসের সন্ধান করতে যাবে না।

জীবন্ত কোদাল আর জীবন্ত জালা

আমরা সকলেই জীবজন্তুর নানা রকম কারিকুরির কথা শুনেছি, পড়েছি। এই সব জীবজন্তু ঘরবাড়ি বানায়, তারা রাজমিস্ত্রী, ছুতোর ও তাঁতির, এমনকি দর্জির কাজও করে। যেমন ধর, আমরা জানি বীভাররা তাদের ধারাল ও মজবুত দাঁত দিয়ে যে ভাবে গাছ কেটে ফেলে তা কাঠুরেদের গাছ কাটার চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়; শুধু তা-ই নয়, তারা গাছের কাটা গুঁড়ি ও ডালপালা দিয়ে সত্যিকারের বাঁধ তৈরি

করে — এর ফলে নদীর কূল ছাপিয়ে গিয়ে একটা বদ্ধ জলাশয় তৈরি হয়। বীভারেরা সেখানে থাকতে ভালোবাসে।

আর জঙ্গলের অতি সাধারণ যত লাল পিঁপড়ে! পিঁপড়ের বাসা একটা লাঠি দিয়ে একটু খুঁড়লেই দেখতে পাবে কেমন কায়দার বহুতলা দালান সেটা — এ যেন পাতার তৈরি খাঁটি একটা স্কাইস্ক্রেপার।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে: কোন এক সময় পিঁপড়ে কিংবা বীভার কি তাহলে মানুষের নাগাল ধরে ফেলতে পারে না? দশলক্ষ বছর বা ঐরকম কিছু সময়ের পর কি এমন হতে পারে না যে পিঁপড়েরা পিঁপড়ে-সংবাদপত্র পড়বে, পিঁপড়ে-কারখানায় কাজ করবে, পিঁপড়ে-এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে উড়বে, রেডিওতে পিঁপড়ে ভাষায় বক্তৃতা শুনবে? না, এটা কোন কালেই হবে না। তার কারণ মানুষ আর পিঁপড়ের মধ্যে একটা খুব গুরুতর পার্থক্য আছে।

কী সেই পার্থক্য?

মানুষ পিঁপড়ের চেয়ে বড় — এটাই কি সেই পার্থক্য?

না।

তাহলে পিঁপড়ের ছটা পা আর মানুষের মাত্র দুটো — এই পার্থক্য কি?

না, আমরা যে পার্থক্যের কথা বলছি তা একেবারেই অন্য।

মানুষ কাজ করে কী ভাবে? মানুষ খালি হাত বা দাঁত দিয়ে কাজ করে না। সে কাজ করে কুড়ুল, কোদাল, হাতুড়ি দিয়ে। কিন্তু পিঁপড়ের বাসায় যতই খোঁজাখুঁজি কর না কেন কোন কালে কুড়ুল বা কোদাল কিছুই দেখতে পাবে না। পিঁপড়ে কোন কিছু কেটে দু'ভাগ করতে হলে তার মাথার সঙ্গে লাগানো জীবন্ত কাঁচি ব্যবহার করে। কোন খাল কাটতে হলে সে চালায় তার চারটে জীবন্ত কোদাল, যা সব সময় তার সঙ্গেই থাকে। এগুলো হল তার চারটে পা। সামনের দুই পায়ে সে মাটি খোঁড়ে আর পেছনের দু'পায়ে সে-মাটি সরিয়ে দেয় আর মাঝের দু'পা দিয়ে সে দেহের ভার রক্ষা করে।

এমনকি পিঁপড়ের যে বাসনকোসন তাও জীবন্ত। এমন এক জাতের পিঁপড়ে আছে যাদের বাসায় জীবন্ত জালায় ভর্তি অনেক ভাঁড়ার দেখতে পাওয়া যায়। মাটির তলায় অন্ধকার নীচু ভাঁড়ারঘরে একটার ওপর আরেকটা ঠাসাঠাসি করে ছাদের মাথায় সারি সারি ঝোলে হুবহু একরকম দেখতে অনেকগুলো জালা। সেগুলো নিশ্চল হয়ে থাকে। কিন্তু একটা পিঁপড়ে সেই ভাঁড়ারে ঢুকল, সে তার শুঁড় দিয়ে একটা জালার গায়ে কয়েকটা ঘা মারল — অমনি জালাটা সাড়া দিয়ে নড়েচড়ে উঠল।

তখনই বোঝা যায় ওটার মাথা, বুক, পা — সবই আছে। আর যেটাকে আমরা জালা বলে ভাবছিলাম সেটা আসলে হল ছাদের কড়ির গায়ে ঝুলে থাকা পিঁপড়ের বিশাল ফোলা পেট। পিঁপড়েটা চোয়াল ফাঁক করল, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো এক ফোঁটা মধু। যে শ্রমিক-পিঁপড়েটা কিঞ্চিৎ জলযোগ করতে এসেছিল সে ঐ ফোঁটাটা চেটে নিয়ে ফের কাজে ফিরে গেল। জালা-পিঁপড়েটা আবার ঘুমিয়ে পড়ল একই রকম দেখতে অন্য জালাগুলোর মাঝখানে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ পিঁপড়েদের যন্ত্রপাতি কেমন 'জীবন্ত'! মানুষের যন্ত্রপাতি ও বাসনকোসনের মতো কৃত্রিম সেগুলো নয়। সেগুলো প্রকৃতিদত্ত — এমনই যে তাদের কাছ থেকে কখনও আলাদা করা যায় না।

বীভারের হাতিয়ারও জীবন্ত। গাছ কেটে মাটিতে ফেলার জন্য তার কুড়ুলের

জীবন্ত জালার ভাঁড়ারঘর।

চারপেয়ে কারিগরেরা বাঁধ তৈরি করছে।

দরকার হয় না। এই কাজের জন্য সে তার দাঁত ব্যবহার করে। তার মানে বীভার বা পিঁপড়ে কেউই তাদের নিজেদের হাতিয়ার বানায় না। তারা তৈরি যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়েই জন্মায়।

প্রথম নজরে এটাকে ভালোই বলে মনে হয়। জীবন্ত যন্ত্রপাতি হারানোর কোন ভয় নেই। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই কারও বুঝতে বাকি থাকে না যে এসব যন্ত্রপাতি আসলে ততটা ভালো নয়। এগুলোকে বদলানো যায় না, এদের উন্নতি সাধন করা যায় না।

বুড়ো বয়সে বীভারের ছেদনযন্ত্র যখন ভোঁতা হয়ে যায় তখন সেই ছেদনযন্ত্রকে সে শানওয়ালার কাছে নিয়ে যেতে পারে না। পিঁপড়েও আরও ভালো আর তাড়াতাড়ি করে যাতে মাটি খোঁড়া যায় তার জন্য উন্নত ধরনের নতুন পা কামারের দোকানে ফরমাস দিতে পারে না।

কোদাল-হাতে মানুষ

মনে কর অন্যান্য জীবজন্তুর মতো মানুষেরও কাঠের, লোহার বা ইস্পাতের হাতিয়ারের বদলে আছে কেবল জীবন্ত হাতিয়ার। তাহলে নতুন কোন হাতিয়ার সে উদ্ভাবন করতে পারত না, পুরনোগুলোও সারাতে পারত না। কোদালের দরকার হলে কোদালের আকারের হাত নিয়েই জন্মাতে হত তাকে। এই কল্পনাটাই অবশ্য উদ্ভট। তাহলেও ধরা যাক, এরকম এক কিম্ভুতের জন্ম হল। সে হয়ত মাটি খুঁড়তে ওস্তাদ হবে, কিন্তু নিজের এই বিদ্যা সে আর কাউকে শেখাতে পারবে না — ঠিক যেমন প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ অন্যকে দৃষ্টি দান করতে পারে না। ঐ কোদাল-হাত নিয়েই তাকে সর্বক্ষণ চলাফেরা করতে হত, আর বলাই বাহুল্য, ফলে ঐ হাত আর কোন কাজে লাগানো যেত না। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই কোদালেরও আয়ু শেষ হত। জন্মসূত্রে খননকারী এই লোকটি নিজের কোদাল তার বংশধরকে দিয়ে যেতে পারে একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই যদি তার নাতিনাতনী বা তাদের সন্তান-সন্ততিদের কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে কোদাল নিয়ে জন্মায়।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জীবন্ত হাতিয়ার উত্তরাধিকারসূত্রে বংশধররা একমাত্র তখনই পেতে পারে যখন তাতে তাদের ক্ষতি না হয়ে বরং উপকারই হয়। মানুষ যদি হুঁচোর মতো মাটির নীচে থাকত, তাহলে কোদাল-হাত তাদের অবশ্যই দরকার হত। কিন্তু যে জীব মাটির ওপরে থাকে এরকম হাত তার পক্ষে বাড়তি বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ নকল হাতিয়ার না হয়ে জীবন্ত, প্রকৃতিদত্ত নতুন হাতিয়ার সৃষ্টি হওয়ার জন্য কত শর্তই না পূরণ হওয়া চাই! কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মানুষ অন্য পথ ধরল। কবে হাতের বদলে কোদাল গজাবে তার জন্য অপেক্ষা করে না থেকে সে নিজেই নিজের কোদাল তৈরি করে নিল — শুধু কোদাল কেন, ছুরি, কুড়ুল আরও কত হাতিয়ার।

মানুষ তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে কুড়িটা আঙুল আর বত্রিশটা দাঁত পেয়েছে তার সঙ্গে সে যোগ করল আরও হাজার হাজার অতি বিচিত্র সব জিনিস — খাটো, লম্বা, সরু, মোটা, ধারাল, ভোঁতা। কোনটা দিয়ে ফুটো করা যায়, কোনটা দিয়ে কাটা যায়, কোনটা দিয়ে বা পেটানো যায়। এগুলোই তার নকল আঙুল, কাটার দাঁত, কষের দাঁত, নখ আর হাতের মুঠি। আর এসব ছিল বলেই অন্যান্য জীবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মানুষ এত দ্রুত এগিয়ে যায় যে তার নাগাল ধরার সাধ্যই কারও রইল না।

মানুষ-কারিগর আর নদী-কারিগর

মানুষ যখন সবে মানুষ হতে শুরু করেছে তখন প্রথম প্রথম সে কোন হাতিয়ারই বানাত না, বানাতে পারতও না। আমরা এখন যেমন ব্যাঙের ছাতা কিংবা ফলমূল কুড়োই মানুষও তেমনি তার পাথুরে নখ আর দাঁত কুড়িয়ে বাড়িয়ে যোগাড় করত। নদীর চড়ায় ঘুরে ঘুরে সে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়াত প্রকৃতির নিজের হাতে চাঁছাছোলা ও ধার-দেওয়া পাথর। এককালে যেখানে দুরন্ত কোন নদী থাকায় তার ঘূর্ণীতে একটার গায়ে আরেকটা পাথর প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা খেয়ে পালিশ হয়েছে এই রকম সব 'প্রাকৃতিক' ছুঁচালো পাথর কখন কখন তার হাতে পড়ত। বুঝতেই পারছ যে ঘূর্ণীপাক-কারিগর তার কাজ কারও কোন উপকারে লাগবে কিনা এই নিয়ে কখনও তেমন একটা মাথা ঘামায় নি। তাই প্রকৃতির হাতে তৈরি অমন হাজার হাজার পাথরের মধ্যে মানুষের কাজে লাগতে পারে এমন পাথর খুব কমই পাওয়া যেত।

ফলে মানুষ নিজেই পাথর থেকে তার যা দরকার গড়ে নিতে লাগল — সে হাতিয়ার বানাতে শুরু করল। মানুষের ইতিহাসে এর পর বহুবারই এমন ঘটেছে যে মানুষ প্রকৃতিতে যা পেয়েছে, নিজের হাতে গড়া কৃত্রিম জিনিস দিয়ে তা বদল করেছে। প্রকৃতির বিশাল কর্মশালার এক কোণে সে তার নিজের কর্মশালা বসিয়ে নতুন নতুন এমন সমস্ত জিনিস বানিয়েছে যা প্রকৃতিতে নেই।

পাথরের হাতিয়ারের বেলায় যেমন হয়েছে হাজার হাজার বছর পরে ধাতুর বেলায়ও তা-ই ঘটল। বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক ধাতু খুঁজে বার করা খুব একটা সহজ কাজ নয়, মানুষ তাই তার বদলে খনি থেকে ধাতু তুলে এনে গলাতে আরম্ভ করল। আর মানুষ যতবারই প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া জিনিস থেকে নিজের হাতে কিছু গড়ার দিকে পা বাড়িয়েছে ততবারই সে প্রকৃতির কঠোর বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে, স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গেছে।

গোড়ায় নিজের হাতিয়ারের উপাদান তৈরি করার ক্ষমতা মানুষের ছিল না। প্রকৃতিতে যে তৈরি উপাদান পাওয়া যেত তাকেই নতুন আকার দিতে শেখা — এই দিয়ে তার হাতেখড়ি।

কোন একটা পাথর হাতে নিয়ে আরেকটা পাথরের সঙ্গে ঠুকে সেটাকে সে গড়ে পিটে নিত। এই ভাবে পাওয়া গেল একটা বিশাল ছুঁচালো আকারের হাতিয়ার। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এর নাম দিয়েছেন কাটারি। পাথরের অন্যান্য কুচিও কাজে লাগত — সেগুলো দিয়ে কাটা ছেঁড়া ভাঙার কাজ চলত।

মাটির গভীর নীচে প্রাচীনতম যে সমস্ত হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেগুলোর সঙ্গে প্রকৃতির হাতে গড়াপেটা পাথরের এত মিল থাকে যে অনেক সময় বলা কঠিন মানুষ না প্রকৃতি — কে তাদের কারিগর। কিংবা ঠান্ডা আর গরম, সেই সঙ্গে জলের সংযোগ — তাতেও ত পাথর ভেঙে যেতে পারে, ফেটে যেতে পারে।
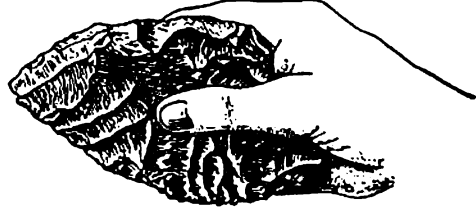
পাথরের তৈরি কাটারি।

কিন্তু এ ছাড়া আরও এমন অনেক হাতিয়ার পাওয়া গেছে যেগুলো সম্পর্কে কোন সন্দেহই উঠতে পারে না। পুরনো নদীর চড়ায় ও তীরে, যেখানে এখন খননের কাজ চলছে, সেখানে কাদা আর বালির পুরু স্তরের নীচে আদিম মানুষের পুরো কারখানা খুঁজে পাওয়া গেছে। সেখানে যেমন তৈরি কাটারি ছিল, তেমনি ভবিষ্যতে হাতিয়ার বানানোর জন্য পাথরের টুকরোও জমা করা ছিল। রাশিয়ার দক্ষিণে সুখুমি অঞ্চলের উপকূলবর্তী স্তরভূমিতে এবং ক্রিমিয়ায় কিক্-কোব গুহায় কাটারি পাওয়া যায়। কাটারি তৈরির জন্য জমা করা এই চকমকির টুকরোগুলো হাতে নিয়ে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবে কোন জায়গায় ঘা মেরে চাকলা খসিয়ে মানুষ পাথরের কিনারা ধারাল করত, কেমন করে তাকে কাটছাঁট করে সমান করত।

কেন এমন হয় তাও বোঝা খুব সহজ। প্রকৃতিতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা হয় না, সেখানে সবই হয় পরিকল্পনা ছাড়া। নদীর ঘূর্ণীপাক কোন কিছু না ভেবেই পাথরগুলোকে এলোপাতাড়ি ঘা মেরে চলে। মানুষও ঐ এক কাজই করে, কিন্তু তার কাজের পেছনে উদ্দেশ্য আছে, সে কাজ করে সজ্ঞানে। এই ভাবে জগতে প্রথম দেখা দিল উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা। মানুষ প্রকৃতির তৈরি পাথরকে যেমন আরও ভালো করতে থাকে তেমনি একটু একটু করে প্রকৃতিকে বদল করতে থাকে, নিজের মতন করে গড়েপিটে নিতে থাকে।

এতে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে আরও এক ধাপ ওপরে উঠে গেল, তার স্বাধীনতা গেল আরও বেড়ে। প্রকৃতি হাতিয়ারের উপযোগী পাথর জমা করে রেখেছে কিনা এখন আর তার ওপর মানুষকে নির্ভর করতে হয় না। এখন সে নিজেই নিজের হাতিয়ার বানাতে পারে।

জীবনবৃত্তান্তের সূচনা

কোন মানুষের জীবনবৃত্তান্ত সচরাচর শুরু হয় তার জন্মস্থান ও জন্মতারিখ দিয়ে। যেমন ধর: '১৮৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর তাম্বোভ শহরে ইভান ইভানভিচ ইভানভের জন্ম হয়।' এই একই তথ্য আবার বেশ জমকাল রীতিতেও প্রকাশ করা যায়। যেমন: '১৮৯৭ সালের নভেম্বরের এক বর্ষণমুখর দিন। তাম্বোভের উপকণ্ঠস্থ এক ক্ষুদ্র গৃহে ইভান ইভানভিচ ইভানভ নামে যে মানবসন্তানটির জন্ম হল পরবর্তীকালে তিনি তাঁর পরিবার ও জন্মস্থানের মুখ উজ্জ্বল করেন।'

আমরা ইতিমধ্যে আমাদের উপাখ্যানের তৃতীয় অধ্যায়ে চলে এসেছি, অথচ এখন পর্যন্ত বলাই হয় নি কবে কোথায় আমাদের নায়কের জন্ম হয়। এটাও স্বীকার করতে হবে যে তার নামকরণও করি নি আমরা। কোথাও আমরা তার নাম দিয়েছি 'বনমানুষ', কোথাও 'আদিম মানুষ', আবার কোথাও বা একেবারেই অস্পষ্টভাবে বলেছি 'আমাদের জংলী পূর্বপুরুষ'।

এবারে আত্মপক্ষসমর্থনে দু'-একটা কথা বলার চেষ্টা করি। প্রথমে নামের কথাই বলি। শত ইচ্ছে থাকলেও আমরা নায়কের নাম উল্লেখ করতে পারি নি, কারণ তার নাম অনেক, অসংখ্য।

যে-কোন জীবনচরিতের পৃষ্ঠা ওল্টাও — দেখতে পাবে প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নায়কের একই নাম। নায়ক বড় হতে থাকে, তার বয়স বাড়তে থাকে, গোঁফদাড়ি গজায়, কিন্তু নাম তার সচরাচর বদলায় না। জন্মের সময় তার নাম ইভান হলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ইভানই থেকে যায়।

আমাদের নায়কের বেলায় কিন্তু অতটা সহজ নয়। এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে সে এতটা বদলাচ্ছে যে আমরা চাই আর না চাই, তার নামও বদলাতে হচ্ছে। আদিমতম যে মানুষ বানরের মতো দেখতে, তাকে পিথেকানথ্রোপাস, সিনানথ্রোপাস, হাইডেলবার্গ মানুষ — এই সব নামে ডাকা হয়।

যাকে আমরা হাইডেলবার্গ মানুষ বলি তার দেহাবশেষ পাওয়া যায় জার্মানির হাইডেলবার্গ শহরে — তা-ও আবার তার একটিমাত্র চোয়াল। কিন্তু সেই চোয়াল দেখেও আমরা বলতে পারি যে ঐ চোয়ালের অধিকারীকে সঙ্গতকারণেই মানুষ আখ্যা দেওয়া যায়। তার দাঁত জন্তুর মতো নয় — মানুষের মতো। তার কষের দাঁতও বানরের কষের দাঁতের মতো নয় — অন্যগুলোর তুলনায় বেরিয়ে থাকত না।

কিন্তু তাহলেও হাইডেলবার্গ মানুষকে একেবারে খাঁটি মানুষ বলা চলে না।

তার থুতনি বনমানুষের থুতনির মতো যেরকম ভেতর দিকে চলে গেছে তা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

পিথেকানথ্রোপাস, সিনানথ্রোপাস, হাইডেলবার্গ মানুষ! — এখানেই আমরা পাচ্ছি আমাদের নায়কের তিন-তিনটে নাম। এই নামগুলো তার একই বয়সের, বিকাশের একই পর্যায়ের।

কিন্তু আমাদের নায়কের পরিবর্তনে এখানেই ছেদ পড়ল না। সে ধীরে ধীরে আরও বেশি করে আজকের মানুষের মতো হয়ে উঠতে লাগল। শিশু যেমন শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়, তেমনি করেই আদিমতম মানুষের পরে হল নিয়ানডারথ্যাল মানুষ, নিয়ানডারথ্যাল মানুষের পর — ক্রো-ম্যাগনন মানুষ।

একজন নায়কের কত নাম! কিন্তু না, তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। এই অধ্যায়ে আমাদের নায়কের নাম পিথেকানথ্রোপাস — সিনানথ্রোপাস — হাইডেলবার্গ মানুষ। এই মানুষই নদীর ধারে ঘুরে ঘুরে হাতিয়ারের উপাদান খুঁজে বেড়াত। এই মানুষই পাথরের সঙ্গে পাথর ঠুকে এবড়ো-খেবড়ো স্থূল ধরনের কাটারি বানাত — তাদের সে-সমস্ত হাতিয়ার আজকাল নানা পুরনো নদীর পলির নীচে পাওয়া যাচ্ছে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ, আমাদের নায়কের নামকরণ অত সোজা নয়। আর তার জন্মতারিখ? সে বলা ত আরও কঠিন। আমরা বলতে পারি না অমুক সালে আমাদের নায়কের জন্ম হয়। তার কারণ এই যে মানুষ কোন এক বছরে রাতারাতি মানুষ হয়ে ওঠে নি। মানুষের হাঁটা শিখতে, হাতিয়ার তৈরি করা শিখতেই লেগে যায় লক্ষ লক্ষ বছর। মানুষের বয়স কত — এই প্রশ্নের উত্তরে নেহাৎই মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে আনুমানিক দশ লক্ষ বছর।

সবচেয়ে কঠিন হল আমাদের নায়কের জন্মস্থান কোথায় তা সঠিক বলা। এই কাজ করতে গিয়ে আমরা বার করার চেষ্টা করি কোথায় বাস করত তার পূর্বপুরুষ — মাটি খুঁড়ে বার-করা সেই বনমানুষ-পূর্বপুরুষ যার থেকে মানুষ, শিম্পাঞ্জী ও গরিলার উদ্ভব। বিজ্ঞানীরা এই বনমানুষের নাম দিয়েছেন ড্রায়োপিথেকাস। ড্রায়োপিথেকাসের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল তারা অনেক জাতের। কোন কোন সূত্র ধরে আমরা চলে যাই মধ্য ইউরোপে, কোনটি ধরে পূর্ব আফ্রিকায়, কোনটি ধরে বা দক্ষিণ এশিয়ায়।

এসমস্ত বিষয়ে যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে তাঁরা আমাদের বলেন যে গত কয়েক বছরে দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু কৌতূহলোদ্দীপক সূত্র খুঁজে

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাচীন বানরের মাথার খুলির যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় তা অনেকটা মানুষের মাথার খুলির মতো। এই অস্ট্রালিয়োপিথেক বনমানুষের চেহারা কেমন হতে পারত ছবিতে এঁকে দেখানো হয়েছে।

পাওয়া গেছে। সেখানে এমন সমস্ত বানরের অস্থি পাওয়া গেছে যারা পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারত এবং জঙ্গলে বাস না করে খোলা জায়গায় বাস করত।

তখন আমাদের একথাও মনে পড়ল যে পিথেকানথ্রোপাস ও সিনানথ্রোপাসের অস্থি পাওয়া গেছে এশিয়ায়, অথচ হাইডেলবার্গ মানুষের চোয়াল পাওয়া গেছে ইউরোপে। এর পর তাহলে একবার চেষ্টা করে বলে দেখি মানুষের জন্মস্থান কোথায়! দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কোন্ মহাদেশ তা-ই বের করা কঠিন।

আমরা এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করে দিলাম। আচ্ছা, যেখানে মানুষের আদিমতম হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেখানে খুঁজে দেখলে হয় না? কারণ মানুষ যখন হাতিয়ার বানাতে শুরু করে তখনই না সে মানুষ হয়ে ওঠে। হয়ত এসব হাতিয়ার আমাদের সাহায্য করবে কোথায় মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তা বার করতে? আমরা পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে যেখানে যেখানে প্রাচীনতম হাতিয়ার — কাটারি পাওয়া গেছে সেই জায়গাগুলো চিহ্ন দিয়ে রাখলাম। মানচিত্রে অসংখ্য বিন্দু আঁকা হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি বিন্দু পড়ল ইউরোপে, তবে আফ্রিকা ও এশিয়ার কোন কোন জায়গায়ও কিছু কিছু পড়ল।

এ থেকে কেবল একটি সিদ্ধান্তই করা যায়: মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে পূর্ব গোলার্ধে, তাও আবার কোন এক বিশেষ জায়গায় নয় — বিভিন্ন জায়গায়।

সম্ভবত তা-ই ঘটেছিল, কেননা একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে মানবজাতির আবির্ভাব ঘটে কোন বিশেষ একজোড়া বানর-বানরী থেকে — 'বনমানুষ আদম' ও 'বনমানুষ ইভ' থেকে। বানর থেকে মানুষে বিবর্তন বিশেষ কোন একটা জায়গায় কেবল একটি বানরগোষ্ঠীর মধ্যে ঘটে নি — যে-সমস্ত

বনমানুষ দু'পায়ে হাঁটা এবং দু'হাতে কাজ করা রপ্ত করে তারা যেখানে যেখানে বাস করত, সর্বত্রই একই সঙ্গে এটি ঘটে। আর যেই মুহূর্তে তারা কাজ শুরু করে দিল তখনই দেখা দিল এক পুনর্গঠিত নতুন শক্তি যা তাদের রূপান্তর করল মানুষে। সেই শক্তির নাম শ্রম।

মানুষ সময় পেল

সবাই জানে আমরা কী করে লোহা পাই, কী করে পাই কয়লা কিংবা আগুন।

কিন্তু সময় কেমন করে পাওয়া যায় বলতে পার?

সেটা খুব কম লোকেরই জানা আছে।

অথচ মানুষ অনেক আগে শিখেছিল কী করে সময় পাওয়া যায়। মানুষ যখন হাতিয়ার বানাতে শিখল তখন তার জীবনে দেখা দিল এক নতুন ধরনের পেশা, সত্যিকারের মানুষের পেশা — শ্রম। কিন্তু শ্রমে সময় লাগে। পাথরের হাতিয়ার বানাতে গেলে প্রথমে খুঁজে বার করতে হয় উপযুক্ত পাথর। সব রকম পাথর ত আর কাজে লাগবে না!

হাতিয়ার তৈরির পক্ষে সবচেয়ে ভালো হল কঠিন আর নিরেট চকমকি পাথর। কিন্তু ও রকম চকমকি পাথর পায়ের নীচে যেখানে সেখানে পড়ে থাকত না, সেগুলোকে খুঁজে খুঁজে বার করতে হত। পাথরের খোঁজে অনেক সময় চলে যেত মানুষের, কখন কখন আবার এত খোঁজাখুঁজি করেও কোন ফল পাওয়া যেত না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে তাকে কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত কম নিরেট চকমকি পাথর নিতে হত, নতুবা বেলেপাথর বা চুনাপাথর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত।

উপযুক্ত পাথর হয়ত শেষকালে খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু সেটাকে দরকার মতো আকার দিতে গেলে আরেকটা পাথরের সঙ্গে ঠুকে ঠুকে চেঁছে পালিশ করতে হয়। অর্থাৎ আরও একটা পাথর চাই। এতেও সময় কম লাগত না। মানুষের আঙুলগুলো তখনও এখনকার মতন এমন কুশলী ও চটপটে হয়ে ওঠে নি — সবে কাজ করতে শিখছে। বুঝতেই পারছ, পাথরের স্থূল কাটারি বানাতে অনেক সময় চলে যেত।

কিন্তু সময় পাওয়া যায় কোত্থেকে?

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ অবসর সময় খুবই কম পেত — সম্ভবত আজকের দিনের সবচেয়ে ব্যস্তবাগীশ লোকের চেয়েও কম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে খাবারের

খোঁজে বনেজঙ্গলে আর ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। খাদ্যোপযোগী যা কিছু হাতের সামনে পেত নিজের মুখে ফেলত কিংবা বাচ্চাদের মুখে তুলে দিত। খাদ্যসংগ্রহ এবং খাওয়া — এতেই ঘুমের সময়টুকু ছাড়া বাকি সবটা সময় তার চলে যেত। তা ছাড়া খাবারও এমন ছিল যে খুব বেশি করে না খেলে চলত না। খাবার বলতে যদি ফলমূল, বাদাম, শামুক, ইঁদুর, গাছের শীষ, কন্দ, পোকামাকড় — এই রকম সব খুচরোখাচরা জিনিস হয়, তাহলে একগাদা করে ত খেতেই হবে!

এখন যেমন হরিণের পাল ঘাস আর কচি শেওলা দাঁতে কেটে চিবোতে চিবোতে চরে বেড়ায়, মানুষের পালও তেমনি চরে বেড়াত বনেজঙ্গলে। সারাটা দিন যদি তার খাদ্যের সন্ধানে আর খাবার চিবোতে চিবোতেই কেটে যায়, তাহলে সে কাজ করবে কখন?

এখানেই দেখা গেল কাজের একটা অলৌকিক শক্তি আছে। কাজ যেমন সময় নেয় তেমনি সময় দেয়ও।

এই দেখ না কেন, যে কাজ অন্যের করতে আট ঘণ্টা সময় লাগে সে কাজটা তুমি যদি চার ঘণ্টায় করতে পার তার অর্থ এই হবে নাকি যে তুমি চার ঘণ্টা সময় হাতে পেলে? তুমি যদি মাথা খাটিয়ে এমন কোন হাতিয়ার বার করতে পার যা দিয়ে কাজ করতে তোমার আগের চেয়ে অর্ধেক সময় লাগে, তাহলে বাকি অর্ধেক সময়টা তোমার হাতে এসে যাচ্ছে।

সেই প্রাচীনকালেও সময় পাবার এই উপায়টুকু মানুষ বার করেছিল। পাথর চাঁছাছোলা করে হাতিয়ার গড়তে ঘণ্টার ’পর ঘণ্টা সময় লেগে যেত ঠিকই, কিন্তু পরে এই ধারাল পাথর দিয়ে গাছের ছালের নীচ থেকে কীটপতঙ্গ বার করা অনেক সহজ হত। পাথর দিয়ে একটা লাঠি ছুঁচালো করাও কম সময়সাপেক্ষ নয়, কিন্তু এই লাঠি দিয়েই পরে মাটি খুঁড়ে খাবার মতো শেকড়বাকড় খুঁজে বার করা কিংবা ঘাসপাতার ভেতর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে এমন সব ছোট ছোট জন্তু মারা অনেক সহজ হত।

এর ফলে খাদ্যসংগ্রহের কাজ আরও দ্রুত চলতে লাগল, তার মানে মানুষ আরও বেশি সময় পেল কাজের। খাবারের খোঁজে আগে যতটা তাকে ঘুরতে হত তা থেকে বেশ খানিকটা সময় বাঁচানোর ফলে এখন সেই সময়টা মানুষ হাতিয়ার বানানোর কাজে লাগাল, হাতিয়ারগুলোকে সে করতে লাগল আরও ভালো, আরও বেশি ধারাল। প্রত্যেকটি নতুন হাতিয়ার আবার তাকে দিতে লাগল বেশি খাবার, তার মানে আরও বেশি সময়।

বিশেষত, মানুষ অনেকটা সময় পেত শিকার করে। কারণ মাংস খেয়ে মানুষ আধঘণ্টার মধ্যে সারাদিনের জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারত। কিন্তু প্রথম প্রথম মাংস খাওয়ার সুযোগ তার কদাচিৎ ঘটত। লাঠি বা পাথর দিয়ে বড় কোন বন্য জন্তুকে মারা কঠিন, আর মেঠো ইঁদুর জাতীয় প্রাণী থেকে কতটুকুই বা মাংস পাওয়া যায়!

মানুষ তখনও সত্যিকারের শিকারী হয়ে ওঠে নি।

যোগাড়ে মানুষ

আজকালকার দিনে যোগাড়ে হওয়া কঠিন কাজ নয়। আমরা অনেকেই সারা দিন ব্যাঙের ছাতা আর ফলমূল কুড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে কাটিয়েছি। শেওলার মধ্যে কোন ব্যাঙের ছাতার পাটকিলে রঙের টুপি দেখতে পেলে কিংবা পথ চলতে চলতে হঠাৎ ঘাসের মধ্যে ভোরের আলোর মতো লাল টুকটুকে মখমলী কোন ব্যাঙের ছাতা নজরে পড়ে গেলে কী মজাই না লাগে! শেওলা কি ঘাসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পাড় আঁকা ছত্রাকের শক্ত মোটা ডাঁটা টেনে বার করতে কী আনন্দ যে লাগে!

কিন্তু যদি ব্যাঙের ছাতা আর ফলমূল যোগাড় করাই তোমার একমাত্র কাজ হত, তাহলে? তোমার পেট কি তাহলে সব সময় ভরা থাকত? ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে গেলে কখন কখন এমন হয় যে তুমি ডালা ভর্তি করে তারপরও আঁচল ভরে ব্যাঙের ছাতা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলে। আবার কখন কখন এমনও হয় যে সারা দিন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে শেষকালে একটা মাত্র ব্যাঙের ছাতা নিয়ে বাড়ি ফিরলে।

আমাদের জানাশোনা একটা দশ বছরের মেয়ে সব সময় জঙ্গলের দিকে বেড়াতে বেরোলেই গর্ব করে বলত, 'যাব, একশটা ভালো ব্যাঙের ছাতা নিয়ে বাড়ি ফিরব!' কিন্তু বাড়ি সে ফিরে আসত প্রায়ই খালি হাতে। বাড়িতে যদি তার অন্য কোন খাবার না থাকত, তাহলে তাকে না খেয়ে শুকিয়েই মরতে হত।

সেই আদি যুগে যোগাড়ে মানুষের অবস্থাটা ছিল এর চাইতেও কঠিন। সে যে না খেয়ে শুকিয়ে মারা যেত না তার একমাত্র কারণ এই যে খাবারের ব্যাপারে তার খুঁতখুঁতানি ছিল না আর সারা দিন সে খাবারের সন্ধানেই ঘুরত। বৃক্ষবাসী পূর্বপুরুষদের তুলনায় বেশি বলশালী আর স্বাধীন হলে কী হবে তখনও সে রীতিমতো অসহায়, অর্ধ-উপবাসী জীব।

তার ওপর আবার পৃথিবীর বুকে নেমে আসছিল এক মহাপ্রলয়।

আসন্ন মহাপ্রলয়

কোন এক কারণে, ঠিক কেন তা আজও জানা যায় নি, উত্তরের বরফের প্রান্তর আবার নিচে নামতে আরম্ভ করল। বিরাট বিরাট তুষার নদ, হিমবাহ, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উপত্যকার মধ্য দিয়ে খাত কেটে পর্বতের গায়ে কন্দর সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়া থেঁৎলে, চূড়াকে চূড়া ভেঙে-চুরে জঞ্জালের স্তূপ নিয়ে চলল তাদের বুকে। হিমবাহের গলিত তুষারের সামনের দিকটা থেকে সৃষ্টি হল জলের নদী; পাহাড়পর্বত ভাসিয়ে পৃথিবীর বুকে আপনার পথ কেটে বয়ে চলল তারা।

দিগ্বিজয়ী বাহিনীর কাতারের মতো উত্তর থেকে চলতে লাগল হিমবাহ। গভীর খাদ আর পর্বতমালার উপত্যকা থেকে বরফের চাপগুলো মিত্র বাহিনীর মতো এগিয়ে আসতে লাগল সেই অগ্রসরমান উত্তরের বরফের প্রান্তরের সঙ্গে যোগ দিতে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার আশেপাশের দেশের উপত্যকায় ইতস্তত ছড়ানো বিরাট বিরাট পাথরের চাপ দেখেই সেই সব বরফের নদীর গতিপথ চিনতে পারি। কখনো হয়ত হঠাৎ কারেলিয়ার কোন জঙ্গলের পাইন গাছের ঝাড়ে এক মস্ত শেওলা জড়ানো পাথরের চাপ দেখবে। ওটা ওখানে এলো কেমন করে? সেটাকে এনেছিল কোন হিমবাহ।

এর আগে কয়েকবার উত্তরের বরফের প্রান্তর নিচে গড়িয়ে নেমেছিল। কিন্তু এবার সেগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে এলো। রাশিয়ায় হিমবাহগুলো যেখানে আজ ভোলগগ্রাদ ও দ্নেপ্রপেত্রোভ্স্ক শহর আছে ততখানি পর্যন্ত দক্ষিণে সরে আসে। সেগুলো জার্মানির মাঝামাঝি পাহাড়গুলো পর্যন্ত এগোল আর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সবটাই ছেয়েই ফেলল। উত্তর আমেরিকার বড় বড় হ্রদগুলি থেকে আরও দক্ষিণে চলে গিয়েছিল সেগুলো।

সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি নামে নি। মানুষের বসতিতে তাদের তুষার নিঃশ্বাসের ছোঁয়াচ তখন-তখনি লাগে নি। স্থলচর জীবের আগে জলচর জীবেরাই এই তুষার নিঃশ্বাসের আঁচ পেয়েছিল।

সমুদ্রের উপকূল তখনও গরম ছিল। বনেজঙ্গলে তখনো লরেল আর ম্যাগনোলিয়ার বাহার ছিল। সমতলভূমিতে বড় বড় ঘাস পায়ে মাড়িয়ে দলে-মলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতী আর গণ্ডারের দল তখনও চরে বেড়াত। তবে সমুদ্রের জল হচ্ছিল ঠাণ্ডা থেকে আরও ঠাণ্ডা। মহাসাগরীয় স্রোত — মহাসমুদ্রের মাঝখানে যে-সব নদী বইছে তারাই উত্তরের হিমবাহ থেকে ঠাণ্ডা বয়ে নিয়ে এলো সঙ্গে করে। কখনো কখনো হিমবাহ সঙ্গে করে নিয়ে আসত তারা।

সমুদ্রোপকূলের পলিস্তর থেকে এখনও বেশ বোঝা যায় কী করে সেই গরম সমুদ্রগুলো হিমের সাগর হয়ে গিয়েছিল। স্থলে তখনও গরম আবহাওয়ার জীবজন্তু বসবাস করলেও সমুদ্রের অধিবাসীরা ইতিমধ্যে বদলে যাচ্ছিল। সে আমলের সঞ্চিত ভূস্তরের মধ্যে আমরা এমন অনেক শামুক জাতীয় প্রাণীর খোলস পেয়েছি যা শুধু ঠাণ্ডা জলেই থাকতে পারে।

জঙ্গলের যুদ্ধ

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ডাঙায়ও তুষার প্রান্তরের আবির্ভাব অনুভূত হতে লাগল। বেশ বুঝতে পারছ, সুমেরুর তুষার প্রান্তরের দক্ষিণে গড়িয়ে নামতে আরম্ভ করা মোটেই হাসির কথা নয়। ফলে উত্তরের ফার জঙ্গল নামতে লাগল দক্ষিণে। সুমেরুর তুষার প্রান্তর যুদ্ধে নামল জলাভূমির পাইন বনের বিরুদ্ধে। জলাভূমির পাইন বন পালাবার সময় তার চাপে ঘন পাতাওয়ালা গাছগুলোর দফা শেষ হয়ে গেল।

হাজার বছরের মহাযুদ্ধ বাধল জঙ্গলের।

এখনো জঙ্গলের যুদ্ধ চলেছে।

ফার ও অ্যাস্পেন গাছ সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ফার গাছ চায় ছায়া আর অ্যাস্পেন চায় আলো। ফারের জঙ্গলে অ্যাস্পেন গাছগুলো গুল্মলতার মতো মাথা গুঁজে থাকে। ফার গাছ তাদের চেপে ধরে বাড়বার কোন সুযোগ দেয় না। কিন্তু যেই না মানুষ এসে ফার গাছগুলো কেটে ফেলে তখনি উজ্জ্বল আলোয় অ্যাস্পেন গাছে প্রাণের জোয়ার নামে — তারা দ্রুত বাড়তে থাকে। চারপাশের সমস্ত কিছুই দ্রুত বদলাতে থাকে। ফার গাছের তলায় ছায়াবিলাসী শেওলাগুলো মরে যায়। খুবই ছোট বলে যে-সব অল্পবয়সী ফার গাছ কাঠুরেদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল সূর্যের প্রখর তাপে তারাও শুকিয়ে যায়। যতক্ষণ তাদের মা সেই বড় বড় ফার গাছ তাদের আশ্রয় দিত ততক্ষণ তাদের

ঘন ছায়ার আড়ালে তারা মনের সুখে বেড়ে উঠত। সূর্যের হাত থেকে বাঁচবার উপায় না পেয়ে তারা শুকিয়ে মরে।

কিন্তু অ্যাস্পেনদের শুরু হল বিজয় উৎসব। আগে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সামান্য সূর্যের কিরণ আসত তাতেই বাঁচতে হত তাদের। কিন্তু এখন তো ফার গাছ কাটা হয়ে গেছে; অ্যাস্পেনদেরই কর্তৃত্ব এখন। দেখতে দেখতে অন্ধকার ফার জঙ্গলের জায়গায় আলোবিলাসী অ্যাস্পেন গাছের বন গড়ে উঠল।

কিন্তু সময় এগিয়ে চলে। সময় বিরাট কর্মী। ধীরে ধীরে জঙ্গলের ঘরবাড়ির উপর তার হাতের ছাপ পড়ে। অ্যাস্পেনের ঝাড় বড় থেকে আরও বড় হয়, তাদের ঘনপাতার আগা আরও ঘন হয়ে জড়াজড়ি করে থাকে। তাদের তলায় প্রথমে ছিট্‌কে-পড়া সূর্যের আলো লাগলেও ক্রমেই ঘন আঁধার হতে থাকে। অ্যাস্পেন গাছ বিজয়ী হল বটে, তবে সে বিজয়ই তার কাল হল।

কোনও লোক নিজের ছায়ার হাতে প্রাণ হারিয়েছে বলে কোন নজির নেই। কিন্তু গাছের জীবনে তা ঘটে। যে-সব ছোট ছোট ফার গাছগুলো কোনও রকমে টিকে ছিল তারা অ্যাস্পেনের ছত্রছায়ায় বাড়তে লাগল। ঝরা পাতার পুরু কম্বল জমিকে বেশ গরম রাখে। দেখতে দেখতে জমি ছেয়ে যায় খোঁচা খোঁচা ছোট সবুজ ফারের চারার শীষে। কয়েক কুড়ি বছর যেতে না যেতেই ফার গাছগুলোর মাথা হয়ে ওঠে অ্যাস্পেনের সমান সমান, জঙ্গল হয়ে পড়ে মিশালী, বিচিত্র, অ্যাস্পেনের হালকা সবুজ রঙ ফারের গাঢ় সবুজ রঙের ছুঁচলো মাথা ভেদ করে দেখা দেয়। ফারের মাথা বেড়েই চলে উঁচুতে, অবশেষে তাদের ঘন আঁধার করা ডালপালা অ্যাস্পেন পাতায় আর সূর্যের আলো পড়তে দেয় না।

তাতেই অ্যাস্পেনের দফারফা। তারা ফারের ছায়ায় শুকিয়ে মরতে থাকে। ফার প্রতিষ্ঠা করে নিজের দাবি। আবার তার পুরানো জায়গায় গজিয়ে ওঠে ফারের বন।

কাঠুরেদের কুড়োল বনের জীবনে বিড়ম্বনা ঘটালে এই ভাবে চলতে থাকে জঙ্গলের সংগ্রাম।

কিন্তু তুষার যুগের ঠাণ্ডার উৎপাতে তাদের জীবনে যে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল তা ছিল আরও কঠোর। গরমের কাঙাল যত গাছ ছিল সব শীতে মরে গিয়ে উত্তরের জঙ্গলের পথ পরিষ্কার করে দিল। ওক্ লিণ্ডেনদের হারিয়ে দিয়ে পাইন, ফার, বার্চের জয়-জয়কার হল। ওক্ আর লিণ্ডেন আবার পিছু হটবার সময় চিরহরিৎ লরেল, ম্যাগনোলিয়া, সাইকামোর-এর শেষ চিহ্নও মুছে দিতে লাগল।

ঠাণ্ডা আর খোলা হাওয়ার মুখে বিলাসে অভ্যস্ত, গরমের কাঙাল গাছগুলোর

টিকে থাকা বেশি কষ্ট হত বলে তারা মরে গিয়ে পথ খোলসা করে দিল বিজয়ী গাছদের। তাদের পক্ষে টিকে থাকা খানিকটা সহজ ছিল পাহাড়িয়া অঞ্চলে। সেখানে দু'পাশে উঁচু প্রাচীরের আড়ালে গভীর খাতে তারা অবরুদ্ধ দুর্গের মতো আশ্রয় নিল। কিন্তু পাহাড়ের উপর থেকে অন্য সব হিমবাহ গড়িয়ে নামতে লাগল তাদের উপর। তাদের আগে আগে অগ্রবাহিনী হিসেবে নামতে লাগল পাহাড়িয়া তুন্দ্রা, ফার এবং বার্চের দল।

বহু সহস্র বছর চলল জঙ্গলের এই যুদ্ধ। বিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশ — গরমের কাঙাল গাছগুলো ক্রমেই সরে যেতে লাগল আরও দূরে, আরও দক্ষিণে।

কিন্তু উত্তরের বিজয়ী জঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধে বিধ্বস্ত জঙ্গলগুলোর মধ্যে যে-সব জীবজন্তু থাকত তাদের কী অবস্থা হল?

আজকের দিনে গাছ কেটে কিংবা আগুন লেগে জঙ্গল ধ্বংস হলে সেখানকার অধিবাসীরা কেউ কেউ ধ্বংস হয়, কেউ বা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। ফার গাছের জঙ্গল কেটে ফেললে তার আদি বাসিন্দারা অর্থাৎ ফার-ক্রস্‌বিল, কাঠ-বেড়ালী ইত্যাদিও উধাও হয় তার সঙ্গে সঙ্গে।

যেখানে তাদের ছায়াঘন ফার গাছের আবাস ছিল — এখন সেখানে গজাল অ্যাস্পেনের জঙ্গলের নতুন আবাস। এই নতুন আবাসে অন্য পাখি আর জীবজন্তুরা আনন্দ করতে লাগল।

আবার যখন অনেক কাল পরে ফার গাছ অ্যাস্পেনের উপর বিজয় লাভ করবে তখন অ্যাস্পেনের জায়গায় নতুন যে ফার জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে তাও শূন্য থাকবে না মোটেই। কাঠবেড়ালী, ক্রস্‌বিল আর তাদের দলবল এসে সেখানে নতুন করে বাসা বাঁধবে।

একটা জঙ্গল যখন মরে যায় কিংবা বেঁচে ওঠে তখন কিন্তু হঠাৎ কতকগুলো গাছপালার কি জীবজন্তুর সমাবেশ হয় না — গোটা এক অখণ্ড জগৎ হিসেবেই তাদের মৃত্যু কিংবা নতুন জীবন লাভ ঘটে।

তুষারযুগে তাই হয়েছিল। গরমের কাঙাল জঙ্গলগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অধিবাসীরা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রাচীনকালের ম্যামথ হাতীরা আর রইল না। গণ্ডার আর জলহস্তীরা চলে গেল দক্ষিণে। মানুষের সেই পুরানো শত্রু ছুরি-দাঁত বাঘের বংশ লোপ পেল।

এই সমস্ত অতিকায় জীবের সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে-সব পশুপাখি সে-জঙ্গলে থাকত তাদের অধিকাংশ হয় মরে গেল, নয়ত চলে গেল দক্ষিণে। এ ছাড়া অন্য কিছু হবার উপায়ও ছিল না। কারণ প্রত্যেক প্রাণীই যে তার নিজের জগৎ, নিজের জঙ্গলের

সঙ্গে শৃঙ্খলে বাঁধা থাকে। সেই জগৎ লোপ পেতে আরম্ভ করলে তার অনেক অধিবাসীদেরও টেনে নিয়ে যায় সঙ্গে করে।

গাছ, গুল্মলতা, ঘাস যখন শুকিয়ে গেল, তখন যে-সব জন্তু তা খেয়ে প্রাণ বাঁচাত আর তার আশ্রয়ে বসবাস করত তারা আহার আর আশ্রয় দুই-ই হারাল। কিন্তু এই সব জন্তুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে-সব জন্তুর শিকারী হিংস্র পশুদেরও পতন হল। কারণ তৃণভোজী জীবের অভাব হলে তাদের খেয়ে যারা প্রাণধারণ করত সেই শিকারী পশুদেরও না খেয়ে মরতে হল।

প্রাচীনকালে নৌকোয় শৃঙ্খল-বদ্ধ দাসেরা যেমন নৌকাডুবি হলে নৌকার সঙ্গেই ডুবে মরত, 'খাদ্যশৃঙ্খলে' বাঁধা এই সব জীবজন্তু আর গাছপালাও জঙ্গল ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই তেমনি লোপ পেত।

বাঁচবার একমাত্র উপায় ছিল শৃঙ্খল ভেঙে অন্য কিছু খেতে আরম্ভ করা, দাঁত আর থাবা বদলে ফেলা আর শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য গায়ে লম্বা লম্বা লোম গজানো। এক কথায়, নিজেকে বদলাতে হয়। কোন জীবের পক্ষে নিজেকে বদলানো যে কত কঠিন তা আমরা জানি। ঘোড়ার বেলায় কী ঘটেছিল একবার মনে করে দেখ। ঘোড়ার পায়ের পাঁচটা আঙুলের জায়গায় একটা করে খুর হতেই কেটে গেল কত কোটি বছর!

দক্ষিণের জন্তুর পক্ষে উত্তরের জঙ্গলের সঙ্গে এঁটে ওঠা বেশ কঠিন কথা; তার চেয়েও বড় কথা হল উত্তরের জঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে তার লোমশ প্রভুরা — যত লোমশ গণ্ডার, ম্যামথ, গুহা-সিংহ, গুহার ভাল্লুক — এরাও সব নেমে এলো।
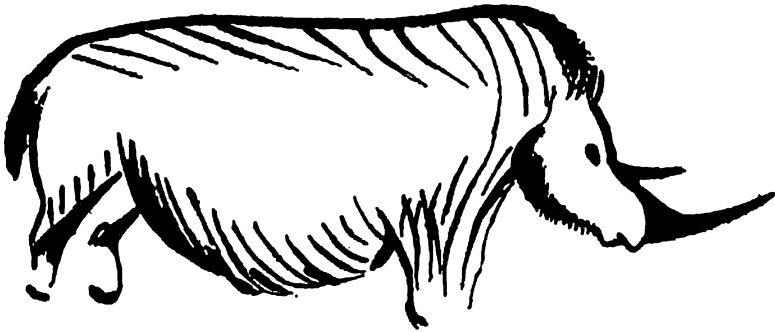
গুহার দেয়ালগাত্রে আঁকা এই গণ্ডারটির সঙ্গে আজকালকার গণ্ডারের তফাত আছে। এর গা উস্‌কো খুস্‌কো পশমে ঢাকা।

এসব জন্তুরা উত্তরের জঙ্গলে মনের সুখে বাস করতে লাগল। তাদের চমৎকার শুরু গরম লোমের কোট ছিল তাদের পরম সম্পদ। দক্ষিণাঞ্চলের হাতী, লোমহীন গন্ডার, ও জলহস্তীর কাছে যে শীত ছিল অসহ্য তা ম্যামথ কিংবা লোমশ গন্ডারের কাছে কিছুই নয়! তা ছাড়া উত্তরাঞ্চলের অনেক জীবজন্তুই শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য গুহায় লুকিয়ে থাকতে শিখেছিল। এটা তাদের নিজের জঙ্গল, নিজের জগৎ বলে সেখানে খাদ্য সংগ্রহ করতেও তাদের বেগ পেতে হত না।

কাজে-কাজেই লুপ্ত জঙ্গলের পুরানো বাসিন্দাদের লড়াই করতে হচ্ছিল এই নতুন প্রভুদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে যে খুব সামান্যই বাঁচতে পেরেছিল তাতে কি আশ্চর্যের কিছু আছে?

আর মানুষ? মানুষের কি হল?

মানুষ ঠিকই টিকে রইল। সে লোপ পেলে আর এ-বই তোমাদের পড়তে হত না।

যে-সমস্ত মানুষ উষ্ণ দেশগুলোতে ছিল তাদের দিন বেশ ভালভাবেই কাটছিল — তবে সেখানের জলবায়ুও খানিকটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। এগিয়ে আসা তুষার প্রান্তরের সবটা বিভীষিকা যে-সব জায়গার ওপর এসে পড়েছিল সেখানকার লোক-জনের অবস্থা হল খুবই সঙ্গীন।

শীতের সেই প্রথম ভয়ঙ্কর দিনগুলোয় প্রথম তুষারপাতের সময় তারা ঠক্‌ঠক্‌ করে কেঁপে, দাঁত কিড়মিড় করতে করতে, গা গরম করার জন্য আর বাচ্চাকাচ্চাদের শীতের হাত থেকে বাঁচাতে সবাই মিলে জড়াজড়ি করে দলাপুটলি হয়ে বসে থাকত।

ক্ষুধা, শীত আর হিংস্র জন্তুরা তাদের মরণের ভয় দেখাত। তাদের চিন্তাশক্তি থাকলে তারা যদি একবার ভাবত চারপাশে কী হচ্ছে, তাহলে হয়ত মনে করত জগতে মহাপ্রলয় ঘটছে।

একটি জগতের শেষ

অনেকবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে জগৎ লোপ পাবে।

মধ্যযুগে লম্বা লেজওয়ালা ধূমকেতু দেখা গেলে মানুষ করজোড়ে বলত:

'প্রলয় ঘটছে বুঝি।'

যখন মহামারীতে, করাল প্লেগে শহরগুলো জনশূন্য হয়ে গোরস্থানগুলি ভরে উঠেছিল তখনো লোকেরা বলত:

'প্রলয় ঘটছে এবার।'

দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহের ভীতিকর দিনগুলোতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরা ফিসফিসিয়ে বলত:

'প্রলয় ঘটছে।'

কিন্তু আদৌ প্রলয় ঘটল না।

আমরা এখন জানি যে ধূমকেতু কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে আসে না, সে নিজের মনে নিজের কক্ষেই সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় — পৃথিবীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তার সম্বন্ধে কী ভাবে না ভাবে তাতে তার কিছুই যায় আসে না।

আমরা এও জানি যে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, এমনকি যুদ্ধেরও মানে এই নয় যে প্রলয় ঘটবে। বড় কথা হল বিপদের কারণ জানা। কারণ জানতে পারলে আরও ভালো করে তার সঙ্গে লড়াই করা যায়।

শুধু যে অজ্ঞ, অশিক্ষিত লোকই প্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে তা নয়। এমন বিজ্ঞানীও আছেন যাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে পৃথিবী ও মানব জাতি লোপ পাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তাঁদের কেউ কেউ বলেন, উত্তাপের অভাবেই একদিন মানবজাতি লোপ পাবে। সে ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থনে তাঁরা নানারকম তথ্যও হাজির করেন। পৃথিবীর কয়লা সরবরাহ ক্রমেই কমে আসছে, জঙ্গল বিরল হয়ে আসছে, জ্বালানি তেলও আর কয়েকশত বছর কুলোবে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর সব জ্বালানি যখন ফুরিয়ে যাবে, কলকারখানার সব যন্ত্রপাতিকেও তখন থামতে হবে। ট্রেন থামবে, ঘরবাড়ি আর রাস্তার বাতি যাবে নিভে। অধিকাংশ লোকই শীত আর ক্ষুধায় মারা পড়বে। যারাও বা বেঁচে থাকবে তারা আবার আদিম বন্য জীবে পরিণত হবে।

পিলে-চমকানো ছবি — তাতে আর সন্দেহ কী!

কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কি?

ভূগর্ভে জ্বালানির সঞ্চয় বিপুল, সব এখনও আমরা আবিষ্কারই করে উঠতে পারি নি। আমাদের ভূতত্ত্ববিদরা নিত্য নতুন তেল ও কয়লার খনি আবিষ্কার করে চলছেন। আমরা কেবল বনজঙ্গল কেটে সাফ করছি না, নতুন নতুন বনজঙ্গল বসাচ্ছিও।

কিন্তু জ্বালানির সঞ্চয় যদি কোন সময় ফুরিয়েই যায়, তাহলেও কি পৃথিবী লোপ পাবে?

না, তা নয়।

কারণ পৃথিবীতে জ্বালানিই আগুন আর তেজের একমাত্র উৎস নয়। তেজের মূল উৎস হল সূর্য। আর এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে যতদিনে সব জ্বালানি

নিঃশেষ হয়ে যাবে ততদিনে লোকেরা সূর্য দিয়েই ট্রেন চালাতে, ঘরবাড়িতে আলো দিতে, কলকব্জার চাকা ঘোরাতে, এমনকি রান্না-বান্নার কাজ করতে শিখবে। এখনই তো সূর্যের তেজে পরিচালিত কয়েকটা পরীক্ষামূলক বৈদ্যুতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর প্রথম সূর্য-চুল্লীও তৈরি হয়েছে।

কিন্তু যাঁরা এত মেতে উঠেছেন পৃথিবীকে সমাধি দেবার জন্য, তাঁরা বলেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, সূর্যও একদিন না একদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে নতুন নক্ষত্রের তুলনায় তার গরম আর তেজ কমে এসেছে। কোটি বছরের পরে সূর্যের তাপ এত কমে যাবে যে পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হয়ে উঠবে। বিশাল বিশাল হিমবাহের প্রবাহ মানুষের হাতে গড়া নড়বড়ে যত সব ইমারত পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে। এখন যেখানে পাম গাছ ঘিরে আছে সেখানে চরে বেড়াবে সুমেরুর ভালুক। মানুষের পক্ষে তা মোটেই সুখকর হবে না।' এটা ঠিকই যে পৃথিবীতে আরেকটা তুষারযুগ এলে খুবই বিপদের কথা। কিন্তু আদিম মানুষও তো বরফে টিকে ছিল। আর ভাবী কালের মানুষ কিনা এখনকার তুলনায় অভাবনীয় বহুগুণ উন্নত বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়েও টিকতে পারবে না?

এমনকি শীতকে জয় করতে হলে তারা কী করবে তাও আমরা আগে থেকে বলে দিতে পারি। পদার্থসমূহের গভীরতম কোষে যে তেজ লুকিয়ে আছে সেই পারমাণবিক তেজ তারা নিয়ে আসবে সূর্যের কিরণের সহায়তায়। আর পারমাণবিক তেজের শেষ নেই। একমাত্র সমস্যা হল কী করে তার উদ্ধার সম্ভব।*

সেই দূর ভবিষ্যতের কথা বন্ধ করে এবার ফিরে আসা যাক অতীতে — আদিম মানুষের যুগে।

---

* নতুন নতুন খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং সেই সঙ্গে যে-সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, সেগুলি সযত্নে কাজে লাগিয়ে বর্তমান যুগে মানুষ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারিক প্রয়োগের অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু দেশে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, সেগুলি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। তাছাড়া, সূর্য, বায়ু, সমুদ্রতরঙ্গ, ভূগর্ভের তাপ ইত্যাদির মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি নিহিত আছে সেগুলি কাজে লাগানোর নানা রকম আধুনিক ও উন্নততর পদ্ধতিও উদ্ভাবন করা হচ্ছে। মূলগত ভাবে নতুন নতুন ধরনের শক্তি (হাইড্রোজেন, থার্মোনিউক্লিয়ার ইত্যাদি) সৃষ্টি করার এবং মানবজাতির কল্যাণে তা ব্যবহারের কাজ চলছে।

আরেকটি জগতের শুরু

মানুষ তার নিজস্ব জঙ্গলে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল তা না ভাঙলে জঙ্গল-জগতের প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারও বিলোপ ঘটত।

তবু জগতে প্রলয় ঘটছিল না, শুধু রূপান্তর ঘটছিল মাত্র। আগের জগতের আয়ু ফুরিয়ে আসছিল, সে জায়গায় নতুন জগতের আরম্ভ হচ্ছিল।

এই পরিবর্তনশীল নতুন জগতে টিকে থাকতে হলে মানুষকেও বদলাতে হচ্ছিল। তার আগের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাকে নতুন কোন খাবার খেতে অভ্যেস করতে হবে। ফার আর পাইনের শক্ত শক্ত বীচিগুলো দক্ষিণের জঙ্গলের রসাল ফল খেতে অভ্যস্ত দাঁতের পক্ষে মোটেই উপযোগী ছিল না।

উষ্ণ আবহাওয়ার বদলে শুরু হল ঠান্ডা আবহাওয়া। সূর্য যেন পৃথিবীকে বেমালুম ভুলে গেল। সূর্যের উজ্জ্বল আলো ও উত্তাপ ছাড়াই বাঁচতে শেখার দরকার দেখা দিল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাকে আর এক জাতের লোক হয়ে উঠতে হবে!

জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যে মানুষের পক্ষেই একমাত্র তা সম্ভব ছিল। তোমরা দেখেছ এর আগেই সে শিখেছিল নিজেকে বদলাতে। জগতের সব প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র সেই শিখেছিল এ কাজ করতে।

মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী ছুরি-দাঁত বাঘ আপনাআপনি লোমের কোট গজাতে পারত না, কিন্তু মানুষ পারত। মাত্র একটা ভালুক মেরে তার ছাল ছাড়িয়ে নিলেই হল।

ছুরি-দাঁত বাঘ আগুন জ্বালাতে পারত না, কিন্তু মানুষ পারত। সে ইতিমধ্যেই আগুনের ব্যবহার শিখে নিয়েছিল। সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যেখানে সে নিজেকে যেমন বদলাতে পারত তেমনি প্রকৃতিকেও পারত বদলে নিতে।

তারপর থেকে হাজার হাজার বছর কেটে গেলেও আমরা এখনও বুঝতে পারি মানুষ প্রকৃতিতে কি অদলবদল করেছিল, আর নিজেই বা বদলেছিল কতটা।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু অপূর্ব সাফল্য অনেক সময়ই বিপুল ধ্বংসাত্মক শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এই ধরনের অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটলে সমগ্র মানবজাতির জন্য নিউক্লিয়ার ঘটিত বিপর্যয় অনিবার্য।

মানবজাতির মাথার ওপর নিউক্লিয়ার অস্ত্রের যে বিপজ্জনক খড়্গ ঝুলছে তা অপসারণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্বের শান্তিকামী সকল শক্তি চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখছে না। এই প্রচেষ্টা সফল হলে নতুন নতুন ধরনের শক্তি

পাথরের পাতার বই

আমাদের পায়ের তলার পৃথিবী একটা বড় বইয়ের মতো। ভূত্বকের প্রতিটি স্তর, যা কিছু জমছে তার এক একটি স্তর — বইটির এক একটি পৃষ্ঠা। তার সর্বশেষ পৃষ্ঠায় — সকলের উপরের স্তরে আমরা বাস করছি। প্রথম পৃষ্ঠাগুলো মহাসাগরের অতলের তলায় কোথাও, নয়ত মহাদেশের ভিত্তির গভীরে নিহিত।

তার আগে কী ঘটেছে, এই প্রথম পৃষ্ঠার আগের অধ্যায়গুলোতে কী ছিল তা শুধু কল্পনাই করা সম্ভব। তবে পৃষ্ঠাগুলো যতই আমাদের কাছাকাছি হচ্ছে ততই সেগুলো পড়া হচ্ছে সহজ।

কতকগুলো পৃষ্ঠা গরম লাভার আগুনে পুড়ে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। তাতে জানা যায় কেমন করে মাটির তলা থেকে গলিত লাভার বন্যা এসে পৃথিবীর গায়ে এ'টে বসে বিরাট পর্বতমালা সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য পৃষ্ঠায় জানা যায় কী করে এক একবার পৃথিবীর বুকে সমুদ্রের জলরাশি ছড়িয়ে গিয়ে পরেই আবার তা সরে গিয়ে ভূত্বকের উত্থান পতন হল।

এই সমুদ্রের শুক্তি দিয়ে গড়া সাদা পৃষ্ঠার বা স্তরের ঠিক পরেই আসছে কয়লার মতো কালো পৃষ্ঠা। তা কয়লাই বটে। এই সব কৃষ্ণপিণ্ডের মধ্যে থেকেই একদা পৃথিবীর বুকে যে অতিকায় অরণ্য ছিল তাদের ইতিহাস জানা যায়। যে-সব জঙ্গল পরে কয়লায় পরিণত হয়েছিল সেখানকার অধিবাসী জীবজন্তুর হাড় আর গাছের পাতার ছাপ পাওয়া যাবে কোন কোন জায়গায় — ঠিক যেমন বইয়ের পাতার ছবিতে দেখি।

এমনি করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে আমরা পৃথিবীর ইতিহাস আগাগোড়া জানতে পারি। আর সেই শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে, একেবারে ওপরের পৃষ্ঠাগুলোতেই মাত্র আমাদের নায়ক, মানুষের উদ্ভব হয়েছে। প্রথম প্রথম মনে হতে পারে সে হয়ত এই বৃহৎ বই-এর প্রধান নায়ক নয়। প্রাচীন অতিকায় হাতী অথবা গণ্ডারের মতো দানবীয় জীবের পাশে তাকে সামান্য পার্শ্বচরিত্র মনে হতে পারে। কিন্তু পড়তে পড়তে যতই এগোব ততই দেখা যাবে যে নতুন নায়ক প্রথম স্থান লাভ করছে। অবশেষে এমন একটা সময় আসে, যখন মানুষ যে শুধু এই বড় বই-এর নায়কই হয়ে ওঠে তা নয় — একজন গ্রন্থকারও হয়ে ওঠে সে।

অনুসন্ধানের মতো জরুরী সমস্যা সমাধানের পেছনে মানবশক্তি ও উপকরণ ব্যয় করা সম্ভব।

নদীর তীরের ঐ খণ্ডিত জায়গাটা দেখ না কেন। তুষারযুগের পরিত্যক্ত জমাট স্তূপের মধ্যে একটা স্পষ্ট কালো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সে ছাপ পড়েছে অঙ্গারের। এই বালু আর কাদার ঠিক মধ্যে এই কয়লার স্তর এলো কোথা থেকে? সেখানে কি দাবানল লেগেছিল?

তা যদি দাবানলেরই চিহ্ন হবে তবে ত পোড়া জিনিস অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকার কথা — অথচ এখানে অঙ্গারের ছোট্ট একটা স্তর রয়েছে। কেবলমাত্র কোন ধুনির আগুনেরই এত ছোট ছাপ থাকতে পারে। আর একমাত্র মানুষের পক্ষেই সে বহ্ন্যুৎসব করা সম্ভব।

আর ঠিক জেনো আগুনের কাছে আমরা মানুষের হাতের অন্যান্য ছাপও পাব — পাথরের হাতিয়ার, ইতস্তত ছড়ানো শিকার করা জীবজন্তুর হাড়গোড়।
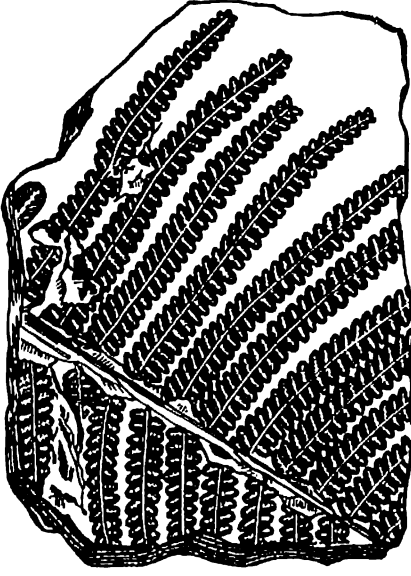
পাথুরে কয়লার স্তরে ফার্ণগাছের যে সমস্ত ছাপ পাওয়া যায় জায়গায় জায়গায় সেগুলো দেখে মনে হয় ঠিক যেন কোন বইয়ের ছবি।

আগুন আর শিকার — আমরা দুটো জিনিস পেলাম যা নিয়ে মানুষ তুষারের সম্মুখীন হয়েছিল।

মানুষ জঙ্গল ছাড়ল

উত্তরের কঠিন জঙ্গলে মানুষ কুড়োবার মতো প্রায় কিছুই পেল না। সেজন্য সে জঙ্গলের মধ্যে অন্য কিছু শিকারের সন্ধান করতে লাগল; এমন কিছু যা অন্যের কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায় থাকে না, শিকারীর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যায়, তার সঙ্গে মোকাবিলা করে।

এমনকি পৃথিবীর উষ্ণতর জায়গাতেও এ সময় ক্রমেই বেশি করে মানুষের খাদ্যতালিকায় মাংস স্থান পেতে আরম্ভ করেছিল। মাংসে পেট বেশি ভরে, মাংসে গায়ে জোর হয় বেশি, আর কাজের জন্য হাতে সময়ও পাওয়া যায় বেশি। বাড়বার মুখে মানুষের মস্তিষ্কের পক্ষে মাংসের মতো পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যই দরকার।

মানুষ যতই হাতিয়ারের উন্নতি সাধন করছিল ততই শিকার তার জীবনের বেশি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে উঠছিল।

উত্তরাঞ্চলে শিকার জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠল। মানুষ আর ছোট ছোট জীবজন্তু শিকার করে সন্তুষ্ট থাকতে পারছিল না। তার বড় শিকার দরকার হয়ে পড়ছিল। উত্তরাঞ্চলে শিকার করাও কঠিন হয়ে উঠেছিল। যেমন বরফ তেমনি তুষারঝঞ্ঝা — আর হাড়জমানো আবহাওয়া। তার মানে লোকের হাতে এমন মাংস থাকা চাই যা বহুদিন চলে।

তাহলে কেমন জীবজন্তু শিকার করতে আরম্ভ করল মানুষ?

জঙ্গলে অনেক বড় বড় পশু ছিল। জঙ্গলের ভেতরে খোলা জায়গায় হরিণ চরে বেড়াত, তারা শেওলা খেয়ে প্রাণধারণ করত। বন্যবরাহ জঙ্গলের মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলত। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বড় বড় জন্তু জঙ্গলে থাকত না — তারা থাকত সমতল ভূমিতে যেখানে ঝোপঝাড় গজায় সেখানে। সেখানে সীমাহীন প্রান্তরে দলে দলে চরে বেড়াত লোমশ বুনো ঘোড়া। পায়ের তলে পৃথিবী কাঁপিয়ে চলত কুঁজো ষাঁড়ের দল, বজ্রনাদ করতে করতে বিচরণ করত বাইসনের পাল। চলন্ত পাহাড়ের মতো অতিকায় লোমশ দৈত্য ম্যামথ মন্থর গতিতে চলত।

আদিম মানুষের কাছে এরাই ছিল চলন্ত মাংসের আধার — জীবন্ত প্রলোভন — চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে দূরে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

এমনি করে শিকারের পিছু পিছু মানুষ তার জন্ম আর লালন পালনের আদিম বনভূমি ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সমভূমি আর উপত্যকায় দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল তার বসতি। তার জ্বালানো আগুন, শিকারের ঘাঁটি সব আমরা দেখতে পাই জঙ্গল থেকে বহুদূরে। সেখানে বনবাসী মানুষ, যোগাড়ে মানুষ কখনও থাকত না কিংবা থাকতেও পারত না।

যে কথা পড়তে জানা দরকার

আদিম মানুষের শিকারের ঘাঁটিতে আজও তাদের শিকার করা পশুর হাড় দেখতে পাওয়া যায়। সে সব হল ঘোড়ার হলদে ছোপ ধরা পাঁজর, গবাদি পশুর মাথার শিং খুলি, বন্যবরাহের বাঁকানো দাঁত। কখনো কখনো এসব হাড়ের বিরাট স্তূপ পাওয়া গেছে, যা থেকে মনে হয় মানুষ প্রায়ই এক জায়গায় বহুদিন বসবাস করত।

সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে ঘোড়া, বন্যবরাহ, বাইসনের হাড়ের সঙ্গে ম্যামথেরও অতিকায় হাড় পাওয়া গেছে — তাদের বিশাল মাথার খুলি, লম্বা ধনুকের মতো দীর্ঘদন্ত, গুঁড়ানোর যন্ত্রের মতো দেখতে ভিতরের দাঁত, এবং শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের অতিকায় পা।

যে জীব ম্যামথের মতো অতিকায় দৈত্য শিকার করতে পারে সে না জানি কত সাহসী আর বলশালী। ম্যামথের শব টুকরো টুকরো করে কেটে শিবিরে নিয়ে আসতে হলে তার চেয়েও বেশি শক্তি দরকার হত, কারণ ম্যামথের এক একটা পায়েরই ওজন হবে প্রায় ২৭ মণ। মাথার খুলিটা এমনই যে তার ভেতরে একটা লোকের জায়গা হতে পারত।
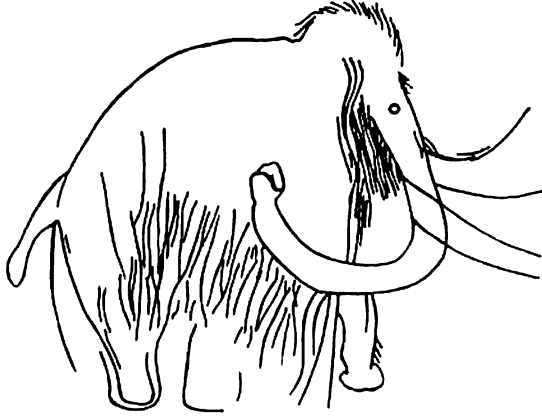
গুহার দেয়ালের গায়ে আদিম শিল্পী ম্যামথের ছবি এঁকে রেখে দিয়েছে।

এমনকি হাতী শিকারের জন্য বিশেষ ধরনের রাইফেল-বন্দুকে সজ্জিত আধুনিক শিকারীর পক্ষেও ম্যামথের সঙ্গে এ'টে ওঠা সহজ হত না। অথচ আদিম মানুষের কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। তার অস্ত্রশস্ত্র বলতে সম্বল ছিল শুধু পাথ-রের ছোরা, আর ডগায় ধারালো পাথর বসানো এক ধরনের বর্শা।

অবশ্য যোগাড়ে মানুষ আর শিকারী মানুষের মধ্যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে মানুষের পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও বদলেছে — সেগুলো আরো ধারালো আর ভালো হয়েছিল। পাথরের ছোরা কি বর্শার ফলক করতে হলে মানুষকে প্রথমে বাইরের চটা খসিয়ে ফেলতে হত, তারপর যত উ'চু-নীচু আর এবড়ো-খেবড়ো সব পালিশ করে নিয়ে, পাথরটাকে পরতে পরতে টুকরো করতে হত — সকলের শেষে ঐ সব পরত থেকে তার দরকার মতো ধারালো ফলা বেছে নিতে হত তাকে।

পাথরের মতন এমন অনমনীয় ও অনুপযোগী জিনিস থেকে ছোরা তৈরি করতে হলে বেশ নৈপুণ্য চাই। সেজন্য একবার এমন একটা হাতিয়ার তৈরি করতে পারলে মানুষ আর সেটাকে কাজ শেষ হয়ে গেলে ফেলে না দিয়ে যত্ন করে তুলে রেখে দিত; ভোঁতা হয়ে গেলেই আবার ধার দিত তাতে। কাজ ও সময়ের দাম দিতে শিখেছিল বলেই সে তার হাতিয়ারের যত্ন নিত।

তবে যত যাই কর না কেন, পাথর পাথরই। ম্যামথের মতো জীবের মুখোমুখি হতে গেলে ডগায় ফলা লাগানো বর্শা হল নগণ্য অস্ত্র মাত্র। কারণ ম্যামথের চামড়া ছিল ইস্পাতের সাঁজোয়া পাতের মতো মোটা।

তবুও মানুষ ম্যামথ মারত। তাদের শিবিরে পাওয়া মাথার খুলি আর দীর্ঘদন্ত থেকেই আমরা জেনেছি।

এই অতিকায় পশুর সঙ্গে আদিম মানুষ এ'টে উঠত কেমন করে? এটা বুঝতে পারে একমাত্র তারাই যারা 'মানুষ' শব্দটি পড়তে পারে, যারা 'মানুষ' বলতে গিয়ে বোঝায় 'লোকেরা'। মানুষ একা নয়, লোকেরাই সম্মিলিত শক্তি দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করতে শেখে, শিকার করতে শেখে, আগুন জ্বালাতে শেখে, ঘরবাড়ি বানাতে শেখে, চাষ করতে শেখে। মানুষ একা নয়, মানবসমাজই কোটি কোটি লোকের শ্রমে গড়ে তুলেছে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান।

মানুষ একা থাকলে চিরকাল পশুই থেকে যেত। কিন্তু সমাজবদ্ধ শ্রম তাকে পরিণত করল মানুষে।

অনেক বইতে আদিম শিকারীদের দেখানো হয়েছে রবিনসন ক্রুসোর মতো নিজেই গভীর অধ্যবসায়ে নিজের সব কিছু কাজ করে নিচ্ছে। কিন্তু মানুষ যদি সত্যিই রবিনসন ক্রুসোর মতো এমন নিঃসঙ্গ হত, লোকেরা যদি একই

সমাজবদ্ধ না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বাস করত, তাহলে তারা কোন দিন মানুষ হয়ে উঠত না, কিংবা সভ্যতার সৃষ্টি করতে পারত না।

আসলে ডিফো'র বইতে যেভাবে আঁকা আছে, রবিনসন ক্রুসোর জীবন মোটেই তেমন ছিল না। গল্পটির ভিত্তি হিসেবে ডিফো এমন এক নাবিকের কাহিনী নিয়েছিলেন কোন এক সময় যে সত্যিই জীবিত ছিল। এই নাবিকটি একটি জাহাজের বুকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়েছিল। সেজন্য তাকে মহাসাগরের মধ্যে এক নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে চলে যায়। অনেক বছর পরে কয়েকজন ভ্রমণকারী দ্বীপটিতে বেড়াতে এসে সেই নাবিকটিকে সম্পূর্ণ একক নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখতে পান। কিন্তু বৃদ্ধ নাবিকটি কথা বলা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন আর তাঁকে মানুষের চেয়ে বন্য জন্তুর মতোই দেখাচ্ছিল বেশি। যদি আজকের যুগেও একেবারে একা ও নিঃসঙ্গ থাকলে মানুষের পক্ষে মানুষের মতো থাকা কঠিন হয়, তাহলে আদিম মানুষের কাছে কী আশা করা যেতে পারে?

নির্জন দ্বীপে রবিন্‌সন ক্রুসো।

মানুষ একত্রে বাস করত, একসঙ্গে শিকার করত, আর একসঙ্গে হাতিয়ার বানাত বলেই না মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিল! গোটা দলটাই মিলে একত্রে অতিকায় ম্যামথ শিকারে যেত। একটা নয়, ডজন ডজন বর্শা গিয়ে বিঁধত জানোয়ারের লোমশ গায়ে। মানুষ দল বেঁধে অনেক হাত-পাওয়ালা একটা জন্তুর মতো ম্যামথের পেছনে ধাওয়া করত। আর শুধু যে ডজন ডজন হাতই ছিল তা নয় — ডজন ডজন মাথাও খাটত সেই সঙ্গে।

মানুষের চেয়ে ম্যামথ বহুগুণ বড় আর শক্তিশালী হলেও মানুষ ছিল বেশি চালাক।

ম্যামথের ওজন এত যে তার পক্ষে মানুষকে পায়ের তলে পিষে মেরে ফেলা কিছুই নয়। কিন্তু লোকেরা তার এই বিরাট মেদিনীকাঁপানো ওজনটাকেই লাগাল তাকে কাবু করতে।

তারা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে যে তৃণভূমিতে সে বাস করত সেখানেই আগুন ধরিয়ে দিত। আগুনের হল্কায় চোখ ধাঁধিয়ে যেত ম্যামথের, গায়ের লোমে আগুন লেগে গিয়ে ম্যামথ বেচারা আগুনের তাড়নায় ইতস্তত ছুটে বেড়াত। আর মানুষের চালাকির ফলে আগুনের হল্কার ভয়ে তাকে সোজা ছুটে আসতে হত জলাভূমিতে। কাদার মধ্যে পা ফেলামাত্রই ম্যামথটা জলাভূমির বুকে একটা অনড় দালানের মতো গেঁথে যেত। আতঙ্কিত চিৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সে প্রথমে এক পা তারপর আর এক পা কাদা থেকে তুলতে চেষ্টা করত; কিন্তু যতই সে বেশি করে চেষ্টা করত ততই তার পাগুলো গভীরে বসে যেত। তখন তাকে মেরে ফেলাই ছিল মানুষের একমাত্র কাজ।

খেদিয়ে নিয়ে এসে একটা ম্যামথকে মারা সোজা কথা নয়, কিন্তু তাকে নিজেদের শিবিরে টেনে নিয়ে যাওয়া ছিল আরও কষ্টকর। তাদের শিবির থাকত বন্যার নাগালের বাইরে, সাধারণত নদীর উঁচু পাড়ে। নদীর জল পানীয় হিসেবে লোকেরা ব্যবহার করত আর নদীর তীরে ও চড়ায় প্রয়োজনীয় হাতিয়ারের পাথর কুড়োত।

তার মানে সেই মরা ম্যামথটিকে নিচু জলাজমি থেকে টেনে উঁচুতে আনতে হবে। এখানেও এবার একজোড়া হাত শুধু নয়, ডজন ডজন হাত লাগল কাজে। ধারালো পাথর দিয়ে তারা পরম অধ্যবসায়ে সেই ম্যামথের পুরু চামড়া, শক্ত শক্ত শিরা-উপশিরা, বড়ো বড়ো পেশীগুলো খণ্ড খণ্ড করে কেটে, ছড়িয়ে ফেলত। অভিজ্ঞ লোকেরা — বৃদ্ধরা তাদের সন্ধিগুলো দেখিয়ে তাড়াতাড়ি মাথা আর পা পৃথক করে কাটবার কায়দা শিখিয়ে দিত। অবশেষে সেটা কাটা হয়ে গেলে টুকরো টুকরো করে তারা শিবিরে বয়ে নিয়ে যেত।

ডজন ডজন লোক হাত মিলিয়ে এক সুরে চিৎকার করতে করতে প্রকাণ্ড লোমশ পাগুলো টেনে নিয়ে যেত; নয়ত মাটিতে শুঁড় ঝোলাতে ঝোলাতে মাথাটা বয়ে নিয়ে যেত।

শিবিরে পৌঁছানোর পর দরদর করে ঘামে নেয়ে তারা অবসন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু তখন কী মহোৎসবই না শুরু হত! সবাই জানত ম্যামথ মানেই হল মহোৎসব — যেমনটি বহুকাল তাদের ভাগ্যে জোটে নি। জানত ম্যামথ হল তাদের বহু বহুদিনের খোরাক।

যুদ্ধের শেষ

অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ শেষ হল; বিজয়ী বেশে মানুষ বেরিয়ে এলো অবশেষে। সবচেয়ে বড় পশুকেই সে দিল হারিয়ে।

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল। প্রত্যেক শতাব্দে, প্রত্যেক সহস্রাব্দে লোকসংখ্যা বেড়েই যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই বসতি স্থাপন করল।

যা ঘটল তা অন্য কোন জীবের জীবনে ঘটতে পারে নি। ধর, খরগোসের পক্ষে কি মানুষের মতো সংখ্যায় এত বেড়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে?

অবশ্যই সম্ভব নয়। কারণ খরগোসের সংখ্যা যেমন বাড়বে তেমনি নেকড়ের সংখ্যাও বাড়বে এবং নেকড়েরাই তখন খরগোসের সংখ্যা রাখবে কমিয়ে।

তার মানে পৃথিবীতে জীবজন্তুর ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে পারে না। একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে যা তাদের অতিক্রম করা কঠিন।

অন্যান্য জীবের মতো তার চারদিকে যে প্রাকৃতিক বাধা ও শৃংখল ছিল তা মানুষ নিজের চেষ্টায় বহু কাল আগেই সরিয়ে ফেলেছিল। হাতিয়ার বানাতে শেখার পর সে এমন সব খাবার খেতে শুরু করেছিল যা আগে কখনও খায় নি এবং প্রকৃতির কাছ থেকে দাক্ষিণ্যও সে আদায় করে নিচ্ছিল। আগে যে জায়গায় মানুষের একটি দলেরই খাবার জুটত, এখন সেখানে দুটি কি তিনটি দলের খাবার জুটছিল।

পরে সে যখন বড় বড় পশু শিকার আরম্ভ করল তখন সে প্রকৃতির রাজ্যে নিজের স্থান আরও বাড়িয়ে নিল।

এখন আর তাকে খাওয়ার জন্য ছোট ছোট গাছ-গাছড়া জোগাড় করতে হবে না।

বাইসন, ঘোড়া আর ম্যামথরা তারই খাদ্যসংস্থানের জন্য চরে বেড়াত। এই সব পশু পালে পালে সমতল ভূমিতে বিচরণ করে পর্বতপ্রমাণ ঘাস খেত। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তারা ঘাস খেয়ে মোটা হল, আরো মাংসল হল। তাই একটা বাইসন অথবা ম্যামথ মারলে মানুষ পেত বিপুল পরিমাণ পুষ্টিকর ও তেজস্কর খাদ্য।

আদিম মানুষের আঁকা ম্যামথ, বাইসন ও ঘোড়া।

আর তখন তাদের সঞ্চয়েরও খুব দরকার হত। তুষারঝঞ্ঝা অথবা জমে যাওয়া আবহাওয়ায় শিকার করা সম্ভব নয়। সেই সুখের দিন আর ছিল না যখন সারা বছরই থাকত গরম।

তবে একটা পরিবর্তনের সঙ্গেই আসে অন্য পরিবর্তন। একবার খাবার সঞ্চয় শুরু করলে মানুষকে দীর্ঘকাল একই জায়গায় থাকতে হত। অত তাড়াতাড়ি সে স্থান পরিবর্তন করতে পারত না। কারণ ম্যামথের মরা দেহটা তো আর কাঁধে করে নড়াচড়া করা সম্ভব নয়।

মানুষকে যে কেন ঘরছাড়া যাযাবর জীবন শেষ করে দিতে হল তার অবশ্য আরও কারণ ছিল। আগে যে-কোন গাছই রাত্রে তাকে আশ্রয় দিতে পারত, হিংস্র পশুর হাত থেকে পারত বাঁচাতে। এখন আর হিংস্র পশুকে তার তেমন ভয় ছিল না। কিন্তু তার একটা শত্রু দেখা দিয়েছিল — শীত। এই নতুন শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তার প্রয়োজন ছিল নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।

মানুষ দ্বিতীয় প্রকৃতি গড়ল

অবশেষে এক সময় এলো যখন মানুষ সেই বিশাল হিমের রাজ্যে নিজের জন্য ছোট্ট একটা গরম জগত সৃষ্টি করার কাজে হাত দিল।

কোন গুহার মুখে কিংবা ঝুঁকে-পড়া কোন চূড়ার নিচে সে নিজের জন্য চামড়া ও ডালপালা দিয়ে ঘরোয়া ছোট্ট আকাশ বানিয়ে নিল — সেখানে না রইল বর্ষা, না বরফ, না হাওয়া, না কিছু। নিজের সেই ছোট্ট জগতের মধ্যে সে বসাল এক জ্বলন্ত সূর্য। সেই অগ্নিকুণ্ড রাতে দিত আলো আর শীতে দিত উত্তাপ।

এখনও কতগুলো প্রাচীন শিকারী-বসতির জায়গায় অনেক গর্ত দেখা যায় যার মধ্যে খুঁটি পুঁতে এই 'আসমানী সামিয়ানা' — কুটিরের ছাদ খাড়া করে রাখা হত। খুঁটি দিয়ে ঘেরা জায়গার মাঝখানে এখনো সেই কৃত্রিম সূর্যের মতো চুল্লীর চারপাশে ছড়ানো পোড়া পাথর নজরে পড়ে।

দেওয়ালগুলো বহু আগেই পড়ে গিয়ে ধ্বংস হয়েছে। পচে গেছে। তবে এখন তাদের অস্তিত্ব না থাকলেও বুঝতে কষ্ট হয় না ঠিক কোথায় সেগুলো ছিল। গুহার অভ্যন্তরের এই ছোট্ট জগৎটি তারস্বরে ঘোষণা করে তার সৃষ্টিকর্তা মানুষের কথা।

পাথরের ছুরি, চাঁছার অস্ত্র, পাথরের চটা আর ভাঙা টুকরো, পশুর বিক্ষিপ্ত হাড়গোড়, চুল্লীর অঙ্গার আর ছাই — এ সমস্তই বালু আর কাদার সঙ্গে এমন ভাবে মিশে রয়েছে যে তা কখনই মানুষের ছোঁয়া না লাগলে প্রকৃতিতে ওভাবে পাওয়া যেত না। এতকাল আগে লোপ-পাওয়া বসতিগুলো ছাড়িয়ে অদৃশ্য দেওয়াল থেকে কয়েক পা এগোলেই আর মানুষের হাতের কোনও ছোঁয়াচ পাবে না। না আছে জমিতে কোন হাতিয়ার, না আছে অঙ্গার, কি বহ্ন্যুৎসবের ছাই বা হাড়গোড়।
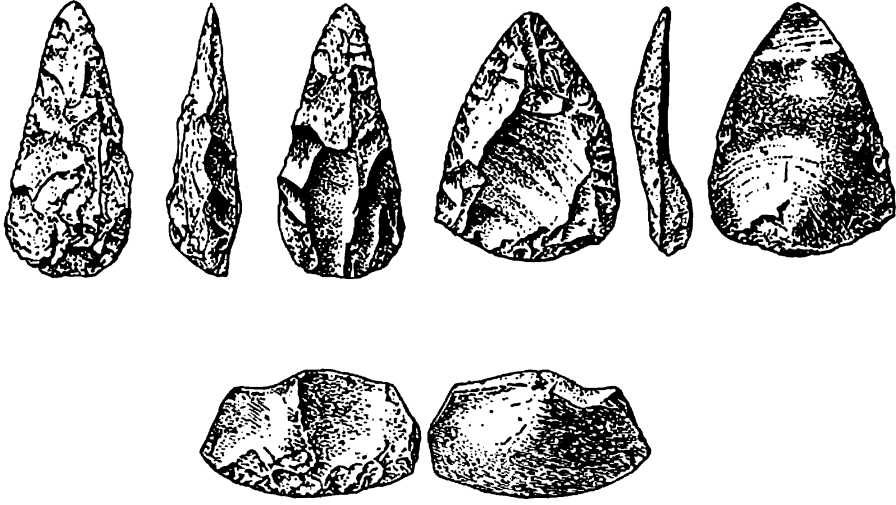
এই হাতিয়ারগুলো তৈরি করতে কম পরিশ্রম আর সময় ব্যয় হয় নি।

তবেই দেখ, মানুষের তৈরি এই দ্বিতীয় পৃথিবী চার পাশের সব কিছু থেকে এখনও এক অদৃশ্য রেখা দিয়ে আলাদা হয়ে আছে।

যে মাটিতে মানুষের হাতের ছাপ সংরক্ষিত আছে আমরা যখন তা খুঁড়ে পাথরের ছোরা, চাঁছার জিনিস খুঁজে বার করে সেগুলো নিরীক্ষণ করি, যে-চুল্লীর আগুন সেই কোনকালে নিভে গেছে তার অঙ্গার হাতড়ে দেখি তখন স্পষ্টই বুঝতে পারি যে সেই আগের জগতের শেষ মানেই মানুষের জগতের শেষ নয়। কারণ মানুষ ইতিমধ্যেই নিজের ছোট্ট জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

অতীতের সন্ধানে প্রথম যাত্রা

বাইসন ও ম্যামথ শিকারীদের শিবিরগুলোতে দু'জাতের পাথরের হাতিয়ারই সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় — এক হল দু'দিকে ধার দেওয়া তিনকোনা পাথর। অন্যটি — একমুখে ধার দেওয়া অর্ধবৃত্তাকার ফালি। স্পষ্টতই এই হাতিয়ারগুলোর প্রত্যেকটার বিশেষ বিশেষ ব্যবহার ছিল, তা না হলে সেগুলো এত বিভিন্ন হত না।

কিন্তু ঠিক ঠিক কি ধরনের কাজ ছিল সেগুলোর? অবশ্য শুধু তাদের দিকে তাকিয়েও আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

তবে সবচেয়ে ভালো হয় প্রস্তর যুগে ফিরে গিয়ে দেখা লোকজন কীভাবে পাথরের হাতিয়ার দিয়ে কাজকর্ম করত।

উপন্যাসে প্রায়ই আমরা দেখতে পাই লেখক বলছেন, 'চলুন দশবছর পেছিয়ে যাই।' ঔপন্যাসিকদের পক্ষে সে কথা বলা বেশ সহজ, তাঁরা যখন যেখানে খুশি যেতে পারেন। আর নায়কদের সম্বন্ধেও যা খুশি তাই লিখতে পারেন। কিন্তু আমরা যারা সত্যি ঘটনা লিখতে বসেছি তারা কী করব? কোন কিছু বানিয়ে বলার অধিকার আমাদের নেই। তা ছাড়া আমাদের বছর দশেক পিছিয়ে গেলেও চলবে না, যেতে হবে লক্ষ লক্ষ বছর পিছিয়ে।

তথাপি ফিরে যাওয়া যেতে পারে প্রস্তর যুগে।

তা করতে হলে তোমার এই দীর্ঘ যাত্রার উপযোগী জিনিসপত্র যোগাড় করে নিতে হবে। প্রথমেই তোমার চাই কম্পাস আর একখানা মানচিত্র। এগুলো তোমার বেড়ানোর থলিতে ভরে নিও আর একটা বন্দুক নিতে ভুলো না কিন্তু (প্রস্তর যুগে শিকার না করে বাঁচতে পারবে না)। এবার কাছাকাছি বন্দরে গিয়ে একখানা জাহাজের টিকিট কাট।

এই টিকিট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজে চেপে বসো। জাহাজ তোমাকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তোমার আকাঙ্ক্ষিত স্থানে পেঁৗছে দেবে।

অস্ট্রেলিয়াতে এখনও এমন লোক আছে যারা পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করে।

অস্ট্রেলীয় শিকারী।

পাথরের হাতিয়ার কেমন করে ব্যবহার করতে হয় তা জানবার জন্য তাদের কাছে যেতে হবে আমাদের। ঊষর মরুভূমি ডিঙিয়ে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন কাঁটা-গাছের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমরা সে দেশের গহনে অস্ট্রেলীয় শিকারীদের দেশে প্রবেশ করতে পারি। নদীর পাড়ে গাছের নীচে দেখা যাবে গাছের বাকল আর লতাপাতায় তৈরি তাদের কুটির।

শিশুরা কুটিরের চারধারে খেলা করছে। মেয়ে পুরুষরা মাটিতে বসে কাজ করছে। লোমশ টুপির মতো ঝুলমি ঝুলমি চুল আর লম্বা দাড়িওলা এক বুড়ো শিকার-করা ক্যাঙারুর ছাল ছাড়াচ্ছে। যে পাথরের অস্ত্র দেখবার জন্য আমরা এতদূর দেশে ভ্রমণে বেরিয়েছি ঠিক সেই রকম তিনকোনা ছোরা নিয়েই বুড়ো কাজ করছে।

তার মানে কিন্তু এ নয় যে আজকের অস্ট্রেলিয়াবাসীরা আদিম মানুষ। আদিম মানুষ আর তাদের মধ্যে হাজার হাজার পুরুষের ব্যবধান। যে পাথরের ছোরা তারা ব্যবহার করছে সেগুলো অতীতের চিহ্নমাত্র; তবে অতীতের এই চিহ্নই অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে পারবে আমাদের। কাজের সময় অস্ট্রেলীয়দের দেখলেই বুঝতে পারবে যে বড় তেকোনা ছোরাটা হল পুরুষের অস্ত্র — শিকারীর অস্ত্র। এগুলো দিয়ে তারা শিকার মেরে, নিহত শিকারের ছাল ছাড়িয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে কাটে। আরও একটি প্রাচীন হাতিয়ার — সেই অর্ধবৃত্তাকার ছুরিটা কী কাজে লাগে তা দেখতে গেলে যেতে হয় আরও দূরে — অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে, টাসমানিয়া দ্বীপে। এই কিছু দিন আগেও মেয়েরা সেখানে এই রকম ছুরি দিয়ে পোশাক কাটছাঁট করত, চামরা চাঁছত, ফালি করত।

এ দুটো জিনিসের ভেতর কাজের ধারার পার্থক্য থেকেই বোঝা যায় যে, শিকার করে প্রাণধারণের সময়েই আদিম মানুষদের জীবনে শ্রমবিভাগ দেখা দিয়েছিল।

কাজ ক্রমেই বেশি জটিল হয়ে উঠছিল। সেটা আরও ভালো করে করতে হলে একজন লোককে একটা কাজ করতে হবে — আর কাউকে করতে হবে অন্য কাজ। পুরুষরা যতক্ষণে শিকার খুঁজে তার পিছু ধাওয়া করত, মেয়েরাও ততক্ষণ চুপ করে বসে থাকত না। তারা কুটির নির্মাণ করত, পোশাক কাটছাঁট করত, শিকড়বাকড় যোগাড় করত, নয়ত ভাঁড়ারের তদারক করত।

এ ছাড়াও আর একরকমের শ্রমবিভাগ ছিল — তা ছোট আর বড়দের মধ্যে।

হাজার বছরের পাঠশালা

কোন কাজ করতে হলে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। আকাশ থেকে এ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কারুর কাছ থেকে শিখতে হয় তা।

যদি কোন ছুতোরকে নিজে কুড়োল, করাত, র‍্যাঁদা আবিষ্কার করতে হত এবং কীভাবে সে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে তাও ঠিক করতে হত, তাহলে পৃথিবীতে একটা ছুতোরেরও দেখা মিলত না।

যদি ভূগোল শিখতে হলে আমাদের প্রত্যেককেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হত, আবার আমেরিকা আবিষ্কার করতে হত, আবিষ্কারের নেশায় ঘুরতে হত আফ্রিকায়, চড়তে হত গৌরীশৃঙ্গে, নয়ত নিজে নিজেই গুণতে হত পৃথিবীর যত অন্তরীপ আর যোজককে — তাহলে একটা জীবনে তা মোটেই হত না — সে জীবন এখনকার তুলনায় হাজার গুণ বড় হলেও নয়।

আমরা যতই উন্নতির পথে এগিয়ে যাই ততই লোকের শিখবার জিনিস বেড়ে যায়। প্রত্যেকটি নতুন প্রজন্ম পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বেশি করে জ্ঞান, খোঁজখবর আর আবিষ্কারের সন্ধান লাভ করে। প্রত্যেক বছরেই নতুন নতুন বিজ্ঞানের অবিষ্কার হচ্ছে আর বিজ্ঞানের সংখ্যাও বাড়ছে সব সময়। বেশি দিনের কথা নয় তখন ছিল একমাত্র পদার্থবিদ্যা (ফিজিক্স)। এখন হয়েছে ভূ-পদার্থবিদ্যা (জিওফিজিক্স) এবং জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা (এ্যাস্ট্রোফিজিক্স)। আগে ছিল শুধুমাত্র রসায়ন। এখন হয়েছে ভূ-রসায়ন (জিওকেমিস্ট্রি), জৈব-রসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি) এবং কৃষি-রসায়ন (এ্যাগ্রোকেমিস্ট্রি)। নতুন জ্ঞানের তাগিদে বিজ্ঞানও জীবন্ত জীবকোষের মতো বেড়েই চলেছে।

প্রস্তর যুগে স্বভাবতই কোন বিজ্ঞান ছিল না। মানুষ সবেমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা জমাতে আরম্ভ করেছিল। আজকের মতো মানুষের কাজও তেমন জটিল ছিল না বলে তা শিখতেও বেশি সময় লাগত না। কিন্তু তাদেরও তখন কিছু না কিছু শিখতে হত।

বন্যজন্তুর সন্ধান করা, তাদের ছাল ছাড়ানো, কুটির নির্মাণ, পাথরের ছোরা তৈরি করা — এই সব জিনিসেই নৈপুণ্য দরকার হত। কোথা থেকে আসে সে নৈপুণ্য?

মানুষ কুশলী কারিগর হয়েই পৃথিবীতে জন্মায় না। তাকে শিখে-পড়ে অমন হতে হয়।

এ থেকেই আমরা স্পষ্ট জানতে পারি জীবজন্তু থেকে মানুষ কত এগিয়ে

গেছে। জীবজন্তু যেমন বংশপরম্পরায় গায়ের রঙ, বা শরীরের গঠন তার বাপ-মা'র কাছ থেকে লাভ করে, তেমনি সে উত্তরাধিকার-সূত্রেই তাদের কাছ থেকে পায় সমস্ত জীবন্ত হাতিয়ার আর সেগুলো ব্যবহারের কৌশল। শুয়োরের বাচ্চাদের শেখাতে হয় না কি করে মাটি খুঁড়তে হয়; কারণ গর্ত খোঁড়ার জন্য ছুঁচলো মুখ নিয়েই তার জন্ম। তীক্ষ্ণদন্ত জীবের পক্ষে চিবিয়ে গাছ কেটে ফেলা মোটেই কঠিন নয়। কেননা বুঝতেই পারছ তার কাটবার যন্ত্রপাতি তার মুখের মধ্যেই গড়ে ওঠে। এই জন্যই জীবজন্তুদের কারখানা কি পাঠশালা কিছুই নেই।

হাঁসের ছানা ডিম ফুটে বেরিয়েই মাছি ও কাঁকড়া ধরতে যায়, যদিও এ কাজ তাকে কেউ শেখায় নি। কোকিলের ছানা অন্যের বাসায় বাপ-মা ছাড়াই বড় হয়। কিন্তু শরৎকাল আসামাত্র বড়দের সাহায্য ছাড়াই তারা পথে নেমে পড়ে এবং দিব্যি আফ্রিকার পথ ধরে, যদিও সে পথ তাদের কেউ দেখিয়ে দেয় নি। অবশ্য জীবজন্তুরা যে কিছু কিছু কলাকৌশল ও রীতিনীতি বাপ-মায়ের কাছ থেকে একেবারে রপ্ত করে না এমন নয়। তবে সেগুলো পাঠশালায় শেখা বিদ্যার ধারেকাছে যায় না।

কিন্তু মানুষের কথা আলাদা। মানুষকে নিজের হাতিয়ার বানাতে হয়, সে তা সঙ্গে নিয়ে জন্মায় না। তার মানে সে বংশপরম্পরায় বাপ-মা'র কাছ থেকে হাতিয়ার ব্যবহারের জ্ঞান লাভ করে না — তাকে সে-জ্ঞান লাভ করতে হয় শিক্ষকদের কাছ থেকে, নয়তো বয়স্কদের সঙ্গে কাজ করতে করতে।

ব্যাকরণের সূত্র আর অঙ্ক কষবার নিয়ম-কানুন জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শেখা থাকলে আলসে ছাত্রদের কী আনন্দই না হত! তাদের আর তাহলে স্কুলে যেতে হত না। কিন্তু এটা তাদের পক্ষে মোটেই ভালো হত না। স্কুল না থাকলে মানুষ নতুন কিছুই শিখতে পারত না। কাঠবেড়ালীদের কলাকৌশল আর রীতিনীতির মতো মানুষের কলাকৌশল, রীতিনীতি — সব ঠিক একই স্তরে আবদ্ধ হয়ে থাকত।

মানুষের সৌভাগ্য এই যে সে তৈরি-করা অভ্যেস নিয়ে জন্মায় না। মানুষ অনুশীলন করে, জ্ঞানলাভ করে এবং প্রত্যেক পুরুষেই মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে কিছু নতুন জিনিস জমে। অভিজ্ঞতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। জ্ঞানের সীমাকে মানবজাতি ক্রমশই অতিক্রম করে চলেছে।

প্রত্যেক স্কুলের ছেলেই পড়াশুনা করে। হাজার বছরের স্কুল মানুষকে শিখিয়েছে বিজ্ঞান, কলাকৌশল ও ললিতকলা, দিয়েছে তাকে তার গোটা সভ্যতাটুকু।

প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষ এই হাজার বছরের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। প্রৌঢ় অভিজ্ঞ শিকারীরা শিকারের কঠিন কলাকৌশল শিখিয়েছে ছোটদের, জীবজন্তু মাটিতে যে দাগ রেখে যায় সেগুলোর পার্থক্য ধরতে শিখিয়েছে তাদের; আর ভয় দেখিয়ে শিকার হাতছাড়া না করে কিভাবে গুড়ি মেরে শিকার ধরতে হয় তাও দেখিয়ে দিয়েছে সকলকে। আজকালকার দিনে শিকারীকে তার নিজের অস্ত্র তৈরি করে নিতে হয় না। সেই অর্থে আগের তুলনায় এখন শিকারী হওয়া সহজ হলেও এখনও শিকার করতে বেশ নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। প্রস্তর যুগে শিকারীদের নিজের অস্ত্র — গদা, ছোরা, বর্শার ফলক, সব নিজেকেই তৈরি করতে হত। বয়স্ক শিক্ষকের কাছ থেকে ছোটদের অনেক কিছু শিখতে হত।

মেয়েদেরও কাজ শিখতে হত। মেয়েদের শুধু গৃহকর্ত্রী হলেই হত না — একাধারে স্থপতি, কাঠুরে ও দর্জি হতে হত।

প্রত্যেক গোষ্ঠীতে থাকত অভিজ্ঞ পুরুষ আর নারী। তারা দীর্ঘ ও কঠোর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেত পরবর্তী বংশধরদের।

কিন্তু কী করে তারা নিজেদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা দান করত অন্যদের? দেখিয়ে আর বলে-কয়ে — আর সেজন্য তাদের দরকার হল ভাষা।

কোন জন্তুর তো আর তার বাচ্চাকে জীবন্ত হাতিয়ার — থাবা, দাঁত — এই সবের ব্যবহার শেখাতে হয় না — সেজন্যই জন্তুদের কথা বলতে শেখারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষকে কথা বলতে শিখতে হল। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্যও বটে আর নিজের অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য বয়স্ক থেকে তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত করবার জন্যও বটে, মানুষের পক্ষে ভাষা অপরিহার্য হয়ে উঠল।

প্রস্তর যুগে মানুষ কী করে কথা বলত?

অতীতের সন্ধানে দ্বিতীয় যাত্রা

আবার চল অতীতে ফিরে যাই। তবে এবারে আরও সহজে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা যাক, কী বল? এবার যাত্রার জন্য জাহাজে চড়তে হবে না। বাড়িতে বসেই এ-কাজ চলতে পারবে।

আমরা রেডিও ঘোরালেই ঘর থেকে না বেরিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই দেশের যে-কোন জায়গায় পেঁছে যেতে পারি। টেলিভিশন সেট থাকলে আমরা যে শুধু শুনতেই পাব তা নয়, দেখতেও পাব — হাজার হাজার মাইল দূরের লোকজনকে।

কিন্তু যে-সব লোকের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান মাইলের ব্যবধান নয় — বৎসরের পর বৎসরের ব্যবধান, তাদের দেখব কী করে, তাদের কথা শুনবই বা কেমন করে?

স্থানের দূরত্বকে যেমন অতিক্রম করা যায় তেমনি কালের দূরত্বকেও অতিক্রম করার কোন উপায় আছে কি?

হ্যাঁ, আছে। সবাক চলচ্চিত্র।

পর্দার উপরে আমরা সারা জগতটাকেই দেখতে পাই — আজকের জগতই শুধু নয় — অতীতের জগতও। কিন্তু এই সবাক চলচ্চিত্র এমনি এক জাহাজ যা মাত্র কয়েক বছর আমাদের নিয়ে যেতে পারে, — যে সময় এই জাহাজ তৈরি হয়েছিল সেই সময় পর্যন্ত। প্রথম সবাক চলচ্চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল অতি অল্পকাল আগে — ১৯২৭ সালে।

আরও অতীতে আমাদের যেতে হলে আমাদের একটা জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে উঠতে হবে — এবং প্রত্যেকটা জাহাজই হবে কিন্তু আগের জাহাজটা থেকে খারাপ। জাহাজ থেকে আমাদের পাল-তোলা নৌকায় — তারপর পাল-তোলা নৌকা থেকে দাঁড়-টানা নৌকায় চড়তে হবে।

নির্বাক চিত্রের কথা ধর। তার মধ্যে আমরা অতীতের ছবি দেখতে পাই বটে তবে কথা শুনতে পাই না তার।

গ্রামোফোনের কথা ধর। আমরা গলার স্বরের প্রত্যেকটা খাঁজ শুনতে পাই বটে কিন্তু আমরা বক্তার চেহারা দেখতে পাই না।

আর এ জাহাজগুলোও যে-সময় থেকে তারা এসেছে ঠিক সেই সময় পর্যন্তই নিয়ে যেতে পারে আমাদের। নির্বাক চিত্র ১৮৯৫ সালের আগের ঘটনায় নিয়ে যেতে পারে না; গ্রামোফোন আমাদের নিয়ে যেতে পারে না তার আবিষ্কারের বৎসর ১৮৭৭ সালের আগে।

তার আগের সমস্ত স্বর হয়েছে স্তব্ধ। সেগুলো বেঁচে আছে শুধু প্রতীক আর অক্ষরের মধ্যে, মুদ্রিত পুস্তকের সোজা সোজা লাইনের মধ্যে।

ফটোগ্রাফ ও ড্যাগেরোটাইপে মানুষের মুখের হাসি ও চোখের ভঙ্গি ধরা পড়েছে। কোন পুরানো পারিবারিক এ্যালবামে সবুজ মখমলের মলাটের মধ্যে ধাতুর আঙটায় আটকানো দেখতে পাবে কয়েকটি বংশের ছবি।

কার্ডবোর্ডের পৃষ্ঠার মধ্যে দেখবে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ছেলেমেয়েরা যেমন সাজত সেই পোশাকে একটি ছোট মেয়ের আবছা ফটো। মেয়েটি চমৎকার একটা বাগানের বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে — যেমন বেড়া শুধু ফটোগ্রাফারের স্টুডিওতেই দেখা যায়।

সেই পৃষ্ঠাতেই লম্বা ওড়নায় ঢাকা কনের ছবি — আর তার পাশে ফ্রককোট-পরা টেকো-মাথা মোটাসোটা বর। তার হাত রয়েছে শক্তভাবে মার্বেল পাথরের স্তম্ভের তাকে। বিয়ের আংটিটা গোটাটাই নজরে পড়ছে। কনের চেয়ে অন্তত তিরিশ বছরের বড় হল বর; কনেরও কিন্তু মুখে সেই আগের ছোট্ট মেয়েটির মতো সরল ভীরু ছাপ।

আবার চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে তার দেখা পাওয়া গেল। এবার তাকে চেনাই কঠিন। কালো লেসের ওড়না জড়ানো কপালে বলিরেখার ছাপ। চোখে অবসন্ন উদাস ভাব — মুখ পড়েছে ঝুলে। ফটোর নিচে কম্পিত অক্ষরে লেখা 'আমার আদরের নাতনীকে তার দিদিমার উপহার'।

ফটোগ্রাফের এ্যালবামের একটি পৃষ্ঠায় পুরো মানুষের জীবনের ছবি আঁকা রয়েছে।

যতই পিছিয়ে যাব ততই মুখের ভঙ্গিমা, মাথার ভঙ্গি, হাতের ধরণধারণ ফটোগ্রাফে খারাপ উঠবে। এখন আমরা ফটোগ্রাফের ফিল্মে অতি সহজেই টগবগিয়ে-চলা ঘোড়ার কিংবা জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া অবস্থায় সাঁতারুর ছবি তুলতে পারি। কিন্তু সে-যুগে কারুর ফটো তুলতে হলে তাকে একটা বিশেষ চেয়ারে বসিয়ে মাথা আর কাঁধ ঠিক রাখবার জন্য ক্লিপ এঁটে দিতে হত। সেজন্যই যে ছবি উঠত তা যে দেখতে জীবন্ত মানুষের মতো না হয়ে অস্বাভাবিক হত তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

১৮৩৮ সাল — এর আগে আবার ফটোগ্রাফও নেই। আরও যত অতীতে যাব ততই আমাদের এমন সব সাক্ষীসাবুদের উপর নির্ভর করতে হবে যারা ততটা শেখানো-পড়ানো নয় কিংবা ক্যামেরার মতো ততটা সঠিক নয়।

অতীতের ছবি পেতে হলে আমাদের সেই সব সাক্ষ্যপ্রমাণের কথা শুনতে হবে যা ছবি, গ্যালারি, মহাফেজখানা ও লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত হয়েছে।

মাইল-চিহ্নের মতো এমনি করে আমাদের সম্মুখ দিয়ে হাজার হাজার তারিখ পেরিয়ে যাবে। ফের যান বদল করতে হয় আমাদের এই যাত্রায়। এলো ১৪৪০ সাল। এর আগে কোন ছাপা বই ছিল না। মুদ্রিত বই-এর গোটা গোটা অক্ষরের জায়গায় ছিল লতাপাতা আঁকা পত্রনবীশদের লেখা।

নকলনবীশদের হাঁসের পালকের কলম পার্চমেণ্ট কাগজের ওপর ধীরে ধীরে চলতে থাকে আর আমরা অক্ষরের পর অক্ষর ধরে, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই অতীতের পথে। পার্চমেণ্ট থেকে পাপিরাস আর মন্দিরের গায়ে খোদিত অনুশাসনের অনুসরণ করে আমাদের অতীতের পথ চলে গিয়েছে আরও অতীতে।
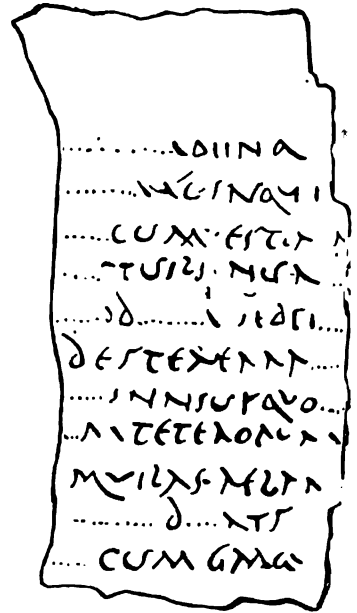
অতীতের সাক্ষী — পার্চমেণ্টে।

রোমক পাণ্ডুলিপি; মাটির ফলকের গায়ে আসিরীয় কিলকলিপি; শিলাপাত্রে আদিম মানুষের আঁকা ছবি।

গভীর থেকে যতই আরও গভীরে যাই ততই সেই সব লোকের লেখা দুর্বোধ্য আর রহস্যময় হয়ে বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে, অবশেষে লিপিই যায় শেষ হয়ে। অতীতের স্বর একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপরে কী আছে?

তখন আমরা মানুষের চিহ্ন খুঁজি মাটির নীচে। ভুলে-যাওয়া কবর খুঁড়ি, প্রাচীন হাতিয়ার খুঁজি, বহুকালের ধ্বংস যাওয়া অট্টালিকার পাথর, বহুযুগ আগের নিভে যাওয়া চুল্লীর অঙ্গার পরীক্ষা করি।

অতীতের এই চিহ্ন থেকেই আমরা জানতে পারি মানুষ কেমন করে থাকত — কেমন করে কাজ করত। কিন্তু সেগুলো কি বলতে পারে কীভাবে তারা কথা বলত, ভাবনা-চিন্তা করত?

নির্বাক ভাষা

আদিম মানুষের শিকারী বসতির গুহার ভেতরে আমরা প্রায়ই স্বয়ং মানুষের, কিংবা আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, তার ধ্বংসাবশেষের দেখা পাই। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত সিমফেরপোলের অদূরে কিইক-কোবা গুহায় সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদরা আদিম মানুষের অস্থি আবিষ্কার করেন। গুহার মাঝখানে আয়তক্ষেত্র আকারের একটা গর্তের মধ্যে আদিম মানুষের কঙ্কালটি ছিল। কাছেই পাহাড় থেকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের চালার নীচে হরিণের হাড়গোড় এবং কিছু পাথরের হাতিয়ারও পাওয়া যায়।

আদি প্রস্তর যুগের মানুষের ঐ একই রকম শিবিরের সন্ধান উজবেকিস্তানের তেশিক-তাশ গুহায়ও পাওয়া গেছে। এখানে আদিম শিকারীরা বাস করত গিরিখাতের ঢালে। এরা সম্ভবত বেশ কুশলী ছিল। এদের প্রধান শিকার ছিল পাহাড়ী ছাগল, যাদের নাগাল পাওয়া খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না।

উজবেকিস্তানের ঐ গুহার ভেতরে পাথরের হাতিয়ার ও জীবজন্তুর হাড়গোড় ছাড়া বছর আষ্টেক বয়সের এক শিশুর মাথার খুলি এবং অস্থিও পাওয়া যায়।

আদি প্রস্তর যুগের মানুষের দেহাবশেষ কেবল রাশিয়ায় নয়, আরও বহু দেশেই পাওয়া যায় — বলতে গেলে আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র তার সন্ধান মেলে।

বিজ্ঞানে তাকে যা বলে ডাকা হয় আমরা সেই নামেই তাকে ডাকব —

নিয়ানডারথ্যাল মানুষ। জার্মানির রাইন প্রদেশের নিয়ানডারথ্যাল নামে এক উপত্যকায় এ ধরনের মানুষের মাথার খুলি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল বলে তার ঐ নামকরণ হয়েছে।

আমাদের নায়কের এবার নতুন নাম দেওয়া খুবই দরকার — কারণ পিথেকানথ্রোপাসের পরে লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যবধানে সে সত্যি সত্যিই এক নতুন লোক হয়েছে। তার মেরুদণ্ডও সোজা হয়েছে, হাতদুটো হয়েছে আরও নমনীয়, মুখটাও হয়েছে আরও বেশি মানুষের মতন।

নায়কের বহিরাকৃতির বিশদ বর্ণনা দেবার অভ্যেস আছে ঔপন্যাসিকদের। তাঁরা তাকে অনন্ত সৌন্দর্যের অধিকারী করতেও কখনও পিছপা হন না; তার চোখগুলো যেন জ্বলন্ত ভাঁটার মতো, নাকটা যেন 'গরুড়পাখির মতো', চুলগুলো 'কাকের ডানার মতো' কালো। কিন্তু তাঁরা কখনো বলেন না তাদের খুলির আয়তন কতটুকু।

আমরা একটু মুশকিলে পড়েছি। আমাদের কাছে খুলির আয়তনই প্রধান; তার চোখের ভঙ্গি, বা কোকিল কণ্ঠের চেয়ে খুলির আয়তনের বিষয়েই আমাদের আগ্রহ বেশি।

নিয়ানডারথ্যাল মানুষের মাথার খুলি সযত্নে মাপজোক করে দেখার পর আমরা সন্তুষ্টচিত্তে বলতে পারি যে পিথেকানথ্রোপাসের তুলনায় তার মস্তিষ্ক আয়তনে বড়।
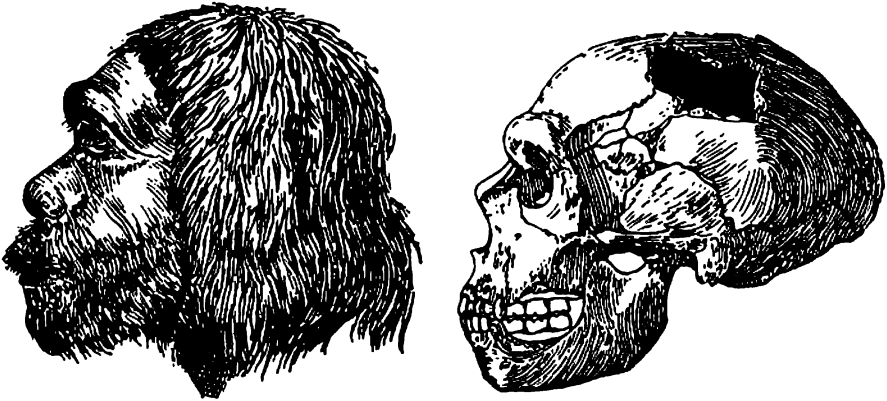
বাঁয়ে — নিয়ানডারথ্যাল মানুষের প্রতিকৃতি, তার মৃত্যুর হাজার হাজার বছর পরে তৈরি; ডাইনে — নিয়ানডারথ্যাল মানুষের মাথার খুলি।

স্পষ্টতই এত হাজার হাজার হাজার বছরের খাটুনি বৃথা যায় নি। খাটুনির ফলে মানুষটিই সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে — বিশেষ করে তার হাতগুলো আর মাথাটা। কারণ যত কাজ সব ত হাতদুটোকেই করতে হয়েছে আর সেই কাজের হুকুম দিতে হয়েছে মস্তিষ্ককে।

পাথরের কুড়োল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে, পাথরটির নতুন আকার দিতে গিয়ে মানুষ অজ্ঞাতসারে নিজেকেই বদলে ফেলছিল — আঙুলগুলোর উন্নতি করছিল — তাদের আরও বেশি নিপুণ আর ক্ষিপ্র করে তুলছিল। মস্তিষ্কেরও সে উন্নতি করছিল। মস্তিষ্ক ক্রমাগতই জটিল হয়ে উঠছিল।

নিয়ানডারথ্যাল মানুষের দিকে তাকালে তক্ষুনি বুঝতে পারবে সে বনমানুষ নয়। তবু তার সঙ্গে বনমামুষের কত যে মিল!

তার ঢালু কপাল চোখের উপর এসে ঝুলে থাকে টুপির কিনারার মতো। দাঁতগুলো থাকে বেরিয়ে।

এযুগের মানুষের সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশি পার্থক্য থুতনি আর কপালে। কপাল আছে পিছিয়ে আর থুতনি বলতে সামান্যই কিছু আছে।

তার নিচু কপালওয়ালা করোটিতে এযুগের মানুষের মস্তিষ্কের কতকাংশের অভাব আছে। আর কাত-করা থুতনি সমেত নিচের চোয়ালটা মানুষের মতো কথা বলার উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি।

এমন কপাল আর নিচের চোয়াল নিয়ে সে মানুষ আমাদের মতো কথা বলতে কি ভাবনা-চিন্তা করতে পারত না।

তবু তাকে কথা বলতে হত। একসঙ্গে কাজ করার পক্ষে তা ছিল অপরিহার্য। মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে গেলেই তাদের একমত হয়ে নিতে হয়। কবে তার নিচের চোয়াল বড় হবে তার অপেক্ষায় বসে থাকলে মানুষের চলবে কী করে? হাজার বছর বসে থাকতে হত তাহলে।

মানুষ নিজের ভাব প্রকাশ করত কেমন করে?

সে নিজের সারা দেহ দিয়েই যথাসাধ্য ভাব প্রকাশ করত। সে তখনও কথা বলার কোন বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাভ করে নি, সেজন্যই সারা দেহ দিয়ে তাকে কথা বলতে হত। মুখের সব পেশী বলত কথা, কাঁধ কথা বলত, পা কথা বলত — আর সবচেয়ে বেশি কথা বলত অবশ্য হাতদুটো।

কখনো কোন কুকুরের সঙ্গে কথা বলেছ? যখন কুকুর তার প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে চায় তখন সে এক দৃষ্টে প্রভুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, নাক দিয়ে তার গা ঘসে, হাঁটুর ওপর থাবা চড়িয়ে দেয়, লেজ নাড়ে আর অধৈর্য হয়ে কুঁক্‌ড়িশুকড়ি

7*

মেরে গোঁ গোঁ করতে থাকে। সে ভাষা দিয়ে কথা বলতে পারে না, সেজন্য তাকে সারা দেহ দিয়ে কথা বলতে হয়— নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত সব কিছু দিয়েই।

আদিম মানুষও ভাষায় কথা বলতে পারত না। কিন্তু মনের ভাব অন্যকে বোঝাবার জন্য ছিল দুটো হাত। হাত দিয়ে সে কাজ করত। কিন্তু কাজের জন্য ভাষারও দরকার হত।

'কাটো' বলতে গিয়ে সে হাতের ভঙ্গি করে দেখাত। 'দাও' না বলে সে হাতের তালু চিৎ করে হাত বাড়িয়ে দিত সামনে। 'এদিকে এসো' না বলে সে নিজের দিকে আসতে দেখাত। সেই সঙ্গে সে স্বর দিয়েও হাতের সাহায্য করত। যার সঙ্গে কথা বলত, তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, সে যাতে তার অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করতে পারে সেজন্য তাকে তর্জনগর্জন করতে, গোঙাতে বা চিৎকার করতে হত।

কী করে তা জানলাম আমরা?

মাটিতে কুড়িয়ে পাওয়া প্রত্যেকটি পাথরের টুকরো হল অতীতের এক একটি অংশ। কিন্তু তাদের ভঙ্গির টুকরো টুকরো অংশ পাব কোথায়? এতকাল আগে যা লোপ পেয়ে গেছে সেই সব হাতের ভঙ্গি আজ উদ্ধার করব কেমন করে?

আদিম মানুষ আমাদের পূর্বপুরুষ না হলে, আজকের আমরা তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু লাভ না করলে তা জানা একেবারেই অসম্ভব হত।

ভঙ্গির ছবি

বেশ কয়েক বছর আগে নেজ পেরসেজ গোষ্ঠীর — যার অর্থ 'বিদ্ধনাসা' জনৈক উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান আদিবাসী লেনিনগ্রাদ ভ্রমনে এসেছিলেন। ফেনিমোর কুপারের বইয়ে যে-সব 'টমাহক' অস্ত্রে সজ্জিত ইণ্ডিয়ানদের বর্ণনা পড় তিনি কিন্তু মোটেই তাদের মতো দেখতে ছিলেন না। তিনি মোকাসিন পরতেন না কিম্বা তাঁর মাথায় পালকও গোঁজা থাকত না। ঠিক আমাদের মতোই ছিল তাঁর পোশাক-পরিচ্ছেদ, আর নিজের ভাষা এবং ইংরেজী দুইই তিনি বিশুদ্ধ ভাবে বলতে পারতেন।

এ দুটি ছাড়াও তিনি এক তৃতীয় ভাষা জানতেন। সেটা বহু প্রাচীনকাল থেকে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে এটাই সবচেয়ে সহজ ভাষা। এ ভাষা শিখতে হলে তোমাদের

মোটেই আমাদের ভাষায় যা নিয়ে এত মাথা ঠোকাঠুকি করতে হয় সেই সব শব্দরূপ ধাতুরূপ পড়তে হবে না, কিংবা কৃদন্ত শব্দ কি অব্যয় নিয়ে হাবুডুবু খেতে হবে না। আর উচ্চারণের ত কোন অসুবিধাই হবে না তোমার — কারণ তোমাকে কিছু উচ্চারণই করতে হবে না। যে ভাষায় এই ইণ্ডিয়ানটি কথা বলতে পারতেন তা শব্দের ভাষা ছিল না, ছিল ভঙ্গির ভাষা।

যদি এই ভাষার অভিধান রচনা করতে চাও, তাহলে সেটা কতকটা এই রকম দাঁড়াবে: —

ভঙ্গি অভিধানের একটি পৃষ্ঠা

ধনুক — একটি হাতে কাল্পনিক ধনুক ধরা থাকবে, অন্য হাতে কাল্পনিক ছিলা ধরে টানবে।

উইগওয়াম (আমেরিকার আদিবাসীদের কুটির) — দু'হাতের আঙুলগুলো ধরে দেখানো দু'ধারে ঢালু ছাদ।

শ্বেতকায় মানুষ — কপালে হাত তুলে টুপির কানার আভাস দেখানো।

নেকড়ে — দুটো কানের মতো করে হাতের দুটো আঙুল বার করে দেখানো।

খরগোশ — ঐ রকমই দুটো আঙুল বার করা হাত — আর তার সঙ্গে আর এক হাত দিয়ে বৃত্তাংশ এঁকে দেখানো। শশকের দুটো কান আর বাঁকানো কাঁধ।

মাছ — হাত খোলা; তালু কাত করা, হাওয়ায় আঁকা বাঁকা করে নাড়ানো। এতে বোঝাচ্ছে একটা মাছ সাঁতরাবার সময় ডানে বাঁয়ে লেজের ঝাঁপটা মারছে।

ব্যাঙ — হাতের পাঁচটা আঙুল একসঙ্গে করে আবার আলগা করা — এই রকম কয়েকবার দেখিয়ে লাগানোর ভঙ্গি করা।

মেঘ — দু'হাতের মুঠো মাথার ওপর, ভাসমান মেঘের অনুকরণ।

বরফ — মাথার ওপরের দুটো মুঠি ধীরে ধীরে আলগা হয়ে বরফের পরতের মতো নীচে নামবে।

বৃষ্টি — দুটো মুঠি আলাদা হয়ে ঝপ্ করে নীচে নামবে।

তারা — দুটো আঙুল মাথার ওপরে তুলে একবার জোড়া লাগবে আর একবার খুলবে — তারার ঝিক্‌মিক্ বোঝাতে।

প্রত্যেকটি চিহ্নই হল হাওয়ায় হাত দিয়ে আঁকা ছবি। ঠিক যেমন প্রাচীনতম

লিপি অক্ষরে রচনা না হয়ে ছবিতে রচিত হত তেমনি হয়ত এই সব প্রাচীন ভঙ্গি ছিল ভঙ্গি-ছবি। তাই বলে ভেবো না আমরা বলছি ইন্ডিয়ানদের বর্তমান ভঙ্গি-ভাষার মধ্যে ঠিক প্রাচীন যুগের সবই আছে। এই ভঙ্গির ভাষায় এমন সব শব্দ আছে যা আদিম লোকের ভাষায় থাকা সম্ভব ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ ধর না যে-সব কথা মাত্র অল্পদিন হল এসেছে: —

মোটরগাড়ি — দুটো চাকার অনুকরণে হাত গোল করে দেখানো। তারপর মোটরের স্টীয়ারিং চালানোর ভঙ্গি করা।

হাতের ভাষায় কথা বলে এমন একজন রেড ইন্ডিয়ান।

ট্রেন — ঐ দুটো চাকা। তার সঙ্গে ধোঁয়া বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ঢেউ খেলানো ভঙ্গি করা।

এগুলো খুবই সাম্প্রতিক ভঙ্গি। তবে এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গির অভিধানে এমন শব্দও দেখতে পাই যা আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া বলেই মনে হয়। যেমন: —

আগুন — উপরের দিকে ঢেউ খেলানো হাতের ভঙ্গি, অগ্নিকুণ্ড থেকে ধোঁয়া উপরে উঠছে।

কাজ — খোলা হাতে বাতাস কাটা।

কে জানে, হয়ত আদিম অধিবাসীরাও 'কাজ কর' একথা বোঝাতে হলে খোলা হাতে বাতাস কাটত।

আমাদের নিজেদের ভঙ্গি-ভাষা

ভঙ্গি-ভাষার এখনও প্রচলন আছে।

আমরা যখন 'হ্যাঁ' বলতে চাই তখন সব সময়েই 'হ্যাঁ' বলি না। অনেক সময়েই শুধু ঘাড় নেড়ে থাকি।

যখন বলতে চাই 'ওখানে' কিংবা 'ঐ দিকে' তখন প্রায়ই একটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই। সে জন্য যে আঙুল ব্যবহার করি তার একটা বিশেষ নামও দেওয়া হয়েছে তর্জনী (যা দেখিয়ে তর্জন করা হয়)।

নত হয়ে আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করি। আমরা ঘাড় নাড়ি, কাঁধ ঝাঁকাই, হাত বাড়িয়ে দিই, ভুরু কোঁচকাই, ঠোঁট কামড়াই। আঙুল দিয়ে ভয় দেখাই, টেবিল চাপড়াই, মেঝেয় লাথি মারি, হাত নাড়ি, মাথায় হাত দিই। বুকে হাত দিই, হাতদুটো যে দিকে ইচ্ছে বাড়িয়ে দিই, করমর্দন করি, বিদায় কালে বাতাসে চুমো ছুঁড়ে দিই।

এসব ভঙ্গির মধ্য দিয়ে একটি কথাও না বলে তোমার গোটা আলাপই হয়ে যাচ্ছে।

এই 'নির্বাক ভাষা' — ভঙ্গির ভাষা যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। আর এর সুবিধেও আছে। কখন কখন আমরা একটিমাত্র ভঙ্গি দিয়ে বিরাট এক বক্তব্য শেষ করতে পারি। সু-অভিনেতা আধঘণ্টার মধ্যে একটিও কথা না বলে শুধু মাত্র ভ্রূ, চোখ, আর ঠোঁটের ভঙ্গি দিয়ে একশটা কথা বলার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারেন।

অবশ্য আমাদের এই ভঙ্গি-ভাষার অপব্যবহার করা উচিত নয়। যা অনায়াসে কথায় প্রকাশ করা যায় তা হাতে-পায়ে ভঙ্গি করে বোঝানো কি উচিত? আমরা ত আর আদিম যুগের লোক নই। পা-ঠোকা, জিভ বের করা, আঙুল দিয়ে কাউকে দেখানো — এসব অভ্যাস যত ছেড়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।

তবে কখন কখন 'নির্বাক ভাষা' অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে পতাকা নেড়ে সংবাদ পাঠাতে দেখেছ? ভেবে দেখছ কি ঝড়ের ঝাপটা, ঢেউয়ের শব্দ আর তার ওপর কখন কখন কামানগর্জন ছাপিয়ে কথা শোনাতে হলে কি চিৎকারই না করতে হত! এসব ক্ষেত্রে মানুষের কাছে কানের কোন দামই থাকে না — এ অবস্থায় চোখই মানুষের সাহায্য করে।

তোমরা নিজেরাও প্রায়ই এই 'নির্বাক ভাষা' ব্যবহার কর। ক্লাশে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে তোমরা হাত তোল। তাই করাও উচিত। কারণ তা না হলে তিরিশ চল্লিশ জন মিলে একসঙ্গে কথা বললে পড়াশুনা করা অসম্ভব।

তাহলে দেখ, আজও সেই ভুলে-যাওয়া অতীতের স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে।

হাজার হাজার বছর ধরে যখন এই 'নির্বাক ভাষা' টিকে আছে, এর দরকার আজও যখন ফুরোয় নি, তখন এ ভাষা কিছুতেই তুচ্ছ হতে পারে না। বহু জাতির লোকের মধ্যেই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এই ভাষা আজও টিকে আছে।

সবাক ভাষারই শেষে জয় হয়েছিল বটে তবে তা আগের ভাষাকে একেবারে তাড়িয়ে দিতে পারে নি। বিজিত ভাষা হল বিজেতা ভাষার দাস। বহুজাতির মধ্যে যে এই ভাষা বিজিত, দাস ও শিশুদের ভাষা হিসেবে থেকে গেছে তারও যে তাৎপর্য নেই তা নয়।

খুব বেশি দিনের কথা নয়, ককেশাস অঞ্চলের তুর্কী ও আর্মেনীয় গ্রামগুলিতে মেয়েদের নিজেদের পরিবারের বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হত না, তারা সংকেত করে কথাবার্তা চালাত তাদের সঙ্গে।

একটি সংকেত ভাষার খোঁজ সিরিয়াতেও এবং আরও নানা দেশে পাওয়া গেছে।

যেমন পারস্যের শাহের দরবারের নফরদের সংকেতে কথা বলতে হত। সমান সমানের মধ্যেই শুধু কথাবার্তা চলত, এই হতভাগ্যরা আক্ষরিক অর্থেই 'বাক্‌ স্বাধীনতা' থেকে বঞ্চিত ছিল।

মানুষ বুদ্ধি অর্জন করল

বনের প্রত্যেকটি জীবই চতুর্দিক থেকে কখন কোন্‌ সংকেত আসবে তার জন্য চোখ-কান খোলা রাখে। ডালের খস্‌খসানি হল — এই বুঝি কোন শত্রু পা টিপে টিপে আসছে। হয় পালিয়ে যাই নয়ত লড়াইয়ের জন্য তৈরি হই।

মেঘের গর্জন হল, বনের মধ্যে ঝড়ের মাতন লাগল — পাতা পড়ল খসে। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাসায় বা গর্তে আশ্রয় নিই।

মাটিতে পচা পাতা আর ব্যাঙের ছাতার গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা শিকারের মৃদু গন্ধও ভেসে আসছে। তাহলে পেছন পেছন ধাওয়া করে শিকারটা ধরি।

প্রত্যেকটি খস্‌খসানি, প্রত্যেকটি গন্ধ, ঘাসের বুকের প্রত্যেকটি দাগ, প্রত্যেকটি ক্যাঁচ-ক্যাঁচানি বা শিসের শব্দ — সব কিছুরই এক একটা অর্থ আছে, অর্থাৎ কিছু না কিছু করার দরকার আছে।

আদিম মানুষও তার চারপাশের জগৎ থেকে যে-সব সংকেত আসত তার জন্য কান খাড়া করে থাকত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে নিজের গোষ্ঠীর অন্য লোকদের কাছ থেকে আসা সংকেতও বুঝতে শিখল।

বনের ভেতরে কোন হরিণের চিহ্ন দেখতে পেয়েছে শিকারী। হাতের ভঙ্গি করে সে তার পেছনের লোকদের সংকেত জানাল। তারা তখনও হরিণটাকে দেখতে পায় নি কিন্তু সংকেতই তাদের সতর্ক করে দিচ্ছে, বলে দিচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে

তৈরি হতে — ঠিক যেন তারা নিজেরাই তাদের সামনে সত্যি। সিত্যই হরিণের শাখাপ্রশাখার মতো শিঙ আর খাড়া-করা কান দেখতে পেয়েছে।

মাটির বুকে হরিণের চিহ্ন হল একটা সংকেত। সেই চিহ্ন যে দেখা গেছে হাত দুলিয়ে তা জানালে সেটা হল আর একটা সংকেত অর্থাৎ সংকেতের সংকেত।

যখনই কোন শিকারী কোন শিকারের চিহ্নের সন্ধান পায়, কিংবা জঙ্গলে লুকোনো কোন জীবজন্তুর খস্‌খস্‌ আওয়াজ শোনে সে তার দলের অন্যদের কাছে সেই সংকেতের সংকেত পাঠিয়ে দেয়।

তাহলে প্রকৃতি মানুষকে যে সঙ্কেত পাঠায় তার সঙ্গে এসে মিলিত হল সঙ্কেতের সঙ্কেত — যে ভাষায় মানুষ দলের অন্যদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে।

ইভান পেত্রোভিচ পাভলভ তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন যে, মানুষের কথা হল 'সংকেতের সংকেত'।

প্রথমে ছিল শুধু ভাব ভঙ্গি ও চিৎকার। চোখ আর কান দিয়ে গ্রহণ করা এই সংকেতগুলি ঠিক কেন্দ্রীয় টেলিফোন স্টেশনের মতো মানুষের মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়। 'পশু আসছে' বলে যেই কোন 'সংকেতের সংকেত' মস্তিষ্কে এলো অমনি মস্তিষ্ক চারদিকে আদেশ দিয়ে পাঠাল: হাতকে হুকুম দিল বর্শা শক্ত করে ধর! কানকে হুকুম দিল: ভালো করে পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ বা ডালের মচ্‌মচানি শোন। জন্তুটি তখনও নজরে পড়ে নি, তারা তার আওয়াজও শোনে নি, কিন্তু মানুষ তার মহড়া নেবার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে।

ভঙ্গি ও চিৎকার যতই বেশি হচ্ছিল, যতই বারে বারে এই সব 'সংকেতের সংকেত' মস্তিষ্কে পাঠানো হতে লাগল — ততই মানুষের করোটির সম্মুখে অবস্থিত এই 'কেন্দ্রীয় স্টেশনের' কাজ যাচ্ছিল বেড়ে। সেজন্যই কেন্দ্রীয় স্টেশন বড় করা দরকার হল। মস্তিষ্কে নতুন নতুন কোষ তৈরি হতে লাগল। এই কোষগুলোর সম্পর্কও হল জটিল থেকে জটিলতর। মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ঘটল — তার আয়তনও বাড়ল।

এই জন্যই পিথেকানথ্রোপাসের তুলনায় নিয়ানডারথ্যাল মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ৪০০-৫০০ ঘন সেন্টিমিটার বড়। মানুষের মস্তিষ্কের উন্নতি হল। মানুষ ভাবতে শিখল।

সূর্যের সম্বন্ধে কোন সংকেত দেখতে বা শুনতে পেলেই তাকে সূর্যের কথা ভাবতে হত, — এমনকি তখন যদি মাঝরাতও হত তাহলেও ভাবতে হত।

যখনই তারা সংকেত করে জানায় যে তাকে বর্শা সঙ্গে করে আসতে হবে, অমনি বর্শার কথা তাকে ভাবতে হল, যদিও তার হাতের কাছে তখন বর্শা হয়ত নেই।

একসঙ্গে কাজ করতে করতে মানুষ কথা বলতে শিখল আর কথা বলতে শিখতে গিয়ে ভাবতেও আরম্ভ করল।

মানুষ তার বুদ্ধি প্রকৃতির দান হিসেবে লাভ করে নি; তাকে সেটা অর্জন করে নিতে হয়েছে।

জিভ আর হাতের ভূমিকা বিনিময় হল কেমন করে

যতদিন পর্যন্ত হাতিয়ার ছিল খুব কম, মানুষের অভিজ্ঞতা ছিল সামান্য, ততদিন পর্যন্ত সাধারণ সব কাজ চালাবার পক্ষে সহজতম ভঙ্গি-ভাষাই ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু কাজকর্ম যতই জটিল হয়ে উঠল ভঙ্গিও ততই জটিল হল তার সঙ্গে সঙ্গে। প্রত্যেক জিনিসেরই নিজস্ব ভঙ্গি দরকার হল আর সে জিনিসের সঠিক বর্ণনা করার জন্য ছবিও এ'কে দিতে হল। সেই জন্যই ছবির ভঙ্গির সৃষ্টি হল। মানুষ হাওয়ায় জন্তু, অস্ত্রশস্ত্র বা গাছপালা আঁকতে লাগল।

ধর একজন সজারুর বর্ণনা দিতে চায়। তাকে শুধু সজারু আঁকলেই চলবে না। সাময়িক ভাবে তাকে সজারুই যেন হতে হবে। সে ভঙ্গি দিয়ে দেখাবে সজারু কী করে থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়ে একপাশে জমা করে। কী করে তার কাঁটা খাড়া করে তোলে। এরকম মূক কথনের জন্য এমন পর্যবেক্ষণ শক্তির দরকার হত যা এখনকার সত্যিকার শিল্পীদের দ্বারাই সম্ভব।

যখন তুমি বল 'জল খাই' তখন তোমার বলা থেকে কেউ বুঝতে পারবে না কেমন করে খাচ্ছ — গেলাস থেকে, না বোতল, না হাতের আঁজলা থেকে।

হাত দিয়ে কথা বলবার সময় মানুষ ঐ ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে না। সে ঐ আঁজলা-করা হাত মুখে তুলে ব্যগ্রভাবে জিভ দিয়ে কাল্পনিক জলে চুমুক দেয়। এতে বোঝা যায় জলটা সুস্বাদু, শীতল, তা খেলে লোকের পিপাসা মিটবে।

আমরা বলি শুধু 'শিকার ধরা' কিংবা 'শিকার করা'। আদিম মানুষরা গোটা শিকারের দৃশ্যই দেখাত ভঙ্গি দিয়ে।

ভঙ্গি-ভাষা যেমন দুর্বল ছিল তেমনি আবার সম্পন্নও ছিল। সম্পন্ন ছিল এই জন্য যে এই ভাষায় জিনিসটা হুবহু ফুটে ওঠে, জিনিসপত্র এবং ঘটনাবলীর ছবি

এতে খুব স্পষ্ট করে আঁকা সম্ভব। এটা দুর্বল ছিল এই জন্য যে এতে 'ডান' কি 'বাঁ' চোখ বলতে হলে ভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে সহজ হলেও শুধুমাত্র চোখ বোঝানো ছিল অনেক বেশি কষ্টকর।

কোনও জিনিসকে ভঙ্গি দিয়ে সঠিক বর্ণনা করা সম্ভব, কিন্তু কোন নিরাকার ধারণাকে কোন ভঙ্গি দিয়েই বোঝানো অসম্ভব।

ভঙ্গি-ভাষার আরও দুর্বলতা ছিল। এ ভাষায় রাত্রে তোমার কথা বলার উপায় ছিল না। কারণ ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে যতই কেন না হাত-পা নাড় — তা দেখার সাধ্য ছিল না কারুর। এমনকি দিনের বেলাতেও সর্বদা ভঙ্গি-ভাষায় কথা বলা সম্ভব হত না।

খোলা মাঠের মধ্যে সহজেই একে অন্যের সঙ্গে ভঙ্গিতে মনের ভাব বিনিময় করতে পারত, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে গাছপালা থাকায় শিকারীরা একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কথাবার্তা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠত।

সেজন্যই মানুষকে শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে হল।

প্রথম প্রথম জিভ আর গলা তেমন ভালো কাজ করতে পারত না। একটি শব্দ থেকে অন্য শব্দের পার্থক্য বোঝাই হত কষ্টকর। প্রত্যেকটাই মনে হত তর্জনগর্জন, কান্না বা গোঙানির শব্দের মতো। জিভকে বশে এনে সুষ্ঠু উচ্চারণ করতে মানুষের বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।

শরীরের সমস্ত ভঙ্গির মধ্যে মুখের ভেতরে জিভের নড়াচড়াই সবচেয়ে কম নজরে পড়ে; অথচ এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে এটা শুনতে পাওয়া যায়।

ইয়েভ গোষ্ঠীর ভাষায় তারা শুধু 'হাঁটা' বলে না। তারা বলে 'জো ঝেঝে' — দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটা; 'জো বোহো বোহো' — মোটা মানুষের গোদা পায়ের চলা; 'জো বুলা বুলা' — কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তড়বড় করে চলা; 'জো পিয়া পিয়া' — ছোট ছোট পা ফেলে চলা; 'জো গভু গভু' — সামনের দিকে ঝুঁকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা। এর প্রত্যেকটি উক্তিই হল শব্দের ছবি; অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি পর্যন্ত এতে সঠিকভাবে বর্ণনা করা আছে।

যত রকমের হাঁটা আছে ততরকমের কথাও আছে এতে।

ভঙ্গির ছবির স্থান গ্রহণ করল শব্দের ছবি।

এমনি করেই মানুষ কথা বলতে শিখল — প্রথমে ভঙ্গি দিয়ে তারপরে শব্দের সাহায্যে।

একটি নদী ও তার উৎস

অতীতের অনুসন্ধান করে আমরা কী আবিষ্কার করলাম?

ভ্রমণকারীরা যেমন নদীর ওপর দিক ধরে যেতে যেতে এক সময় তার উৎসে এসে পৌঁছায় আমরাও তেমনি সেই ছোট্ট নদীটিতে এসে পৌঁছেছি যেখান থেকে মানুষের অভিজ্ঞতার বিরাট প্রবাহ শুরু।

সেই উৎসমুখে আমরা সন্ধান পেয়েছি মানব সমাজের, আর ভাষা-ভাবনার উদ্ভবের।

নদী যেমন প্রত্যেকটি শাখা-নদীর জলের ভারে আরও গভীর ও চওড়া হয়ে ওঠে তেমনি মানুষের অভিজ্ঞতার নদীও ক্রমেই বেশি গভীর ও প্রসারিত হয়ে উঠেছিল — বংশপরম্পরায় নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রবাহে।

বংশের পর বংশ চলে গেছে। কত জাতি আর গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে ধুলোয় মিলিয়ে গেছে — নগর কি গ্রামের আকারে সামান্য স্মৃতিচিহ্নও আর অবশিষ্ট নেই তাদের। মনে হয় কালের করাল্ গ্রাস থেকে বুঝি নিস্তার নেই। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতার বিনাশ ঘটে নি। কালজয়ী হয়ে সে বেঁচে রয়েছে ভাষায়, কলাকৌশলে, বিজ্ঞানে। ভাষার প্রত্যেকটি শব্দ, কাজের প্রতিটি ভঙ্গিমা, বিজ্ঞানের প্রতিটি ধারণা — এসবই হল বংশের পর বংশ ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাসম্ভার।

শাখা-নদীর জল যেমন মূল প্রবাহে মিশলেই হারিয়ে যায় না তেমনি এই সব বংশের পর বংশের কাজকর্মও লোপ পায় নি কিছু। মানুষের অভিজ্ঞতার প্রবাহে অনাদিকালের লোকের কাজ আজকের জীবিতের কাজে মিশে এক অখণ্ড প্রবাহ রচনা করছে।

এই ভাবে আমরা এসে পৌঁছলাম সেই নদীর উৎসমুখে, যা সকল আরম্ভের আরম্ভ। এমনি করেই হল মানুষের উদ্ভব — একটি জীব — যে কাজ করে, কথা বলে আর ভাবে।

বনমানুষ আর মানুষের মধ্যের এই সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যবধানের দিকে চোখ ফেরালে আমরা ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের সেই মহামূল্যবান কথা 'শ্রমই মানুষের স্রষ্টা' — স্মরণ না করে পারি না।

পরিত্যক্ত গৃহে

লোকজন কোন বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় একগাদা জিনিস ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো থাকে। ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ভাঙাচোরা গেলাস বাটি, পুরানো কৌটা— এই সব খালি বাড়ির মেঝে ভরে থাকে। ঠান্ডা চুল্লীর ওপর স্তূপাকার হয়ে থাকে ভাঙা হাঁড়িকুড়ি ও গামলার খোলামকুচি। জানলার তাক থেকে এই পরিত্যক্ত ঘরের দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে চিমনিহীন বাতি। একটা জরাজীর্ণ আরাম-কেদারা ছেঁড়া গদির ভেতর থেকে উঁকিঝুঁকি দেওয়া লালচে চুলের রাশি নিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছে এক কোণে। এই আরাম-কেদারাটা বাড়ির লোকজনের সঙ্গে চলে যেতে পারে নি একমাত্র এই কারণে যে তার একটা পায়া ভাঙা। এসব দেখে তুমি কিন্তু সহজে বলতে পারবে না বাড়ির লোকজন কেমন করে থাকত।

এটাই হল আসল সমস্যা যা প্রত্নতত্ত্ববিদের সামনে দেখা দিল। এই রকম বাড়িতে সকলের শেষে আসেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। বাড়িটাকে অক্ষত অবস্থায় পেলে তাঁর কপাল ভালো বলতে হবে। কিন্তু সাধারণত অধিবাসীরা ছেড়ে যাবার শত শত বৎসর পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ সে-সব জায়গায় গিয়ে হাজির হন। বাড়ির বদলে তিনি দেখতে পান শুধু ধ্বসে-পড়া দেয়াল আর ভিতের অবশিষ্টাংশ। সেজন্য তাঁর কাছে বাসন-কোসনের প্রত্যেকটি টুকরোই হল এক একটা আবিষ্কার। যে-কোন ভাঙাচোরা জিনিস পেলেই সৌভাগ্যবান বলে তিনি মনে করেন নিজেকে।

পুরনো বাড়ির ভাষা যিনি বুঝতে পারেন সেই রকম লোক এই সব পুরানো বাড়ির কাছ থেকে কত কথাই না জানতে পারেন!

খসে-পড়া পাথরের পোশাকে জড়িত পুরানো মিনার, ঘাসে-ভরা দেয়াল — এরা কত লোকজন ও কত ঘটনারই না সাক্ষী!

কিন্তু আরও বাড়ি আছে — পৃথিবীর প্রাচীনতম বাড়ি গুহাগুলো — আরও কত বেশি দেখেছে এই সব গুহা। বুঝতেই ত পারছ, এমন সব গুহা আছে যেখানে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মানুষ বাস করত। আমাদের সৌভাগ্য যে
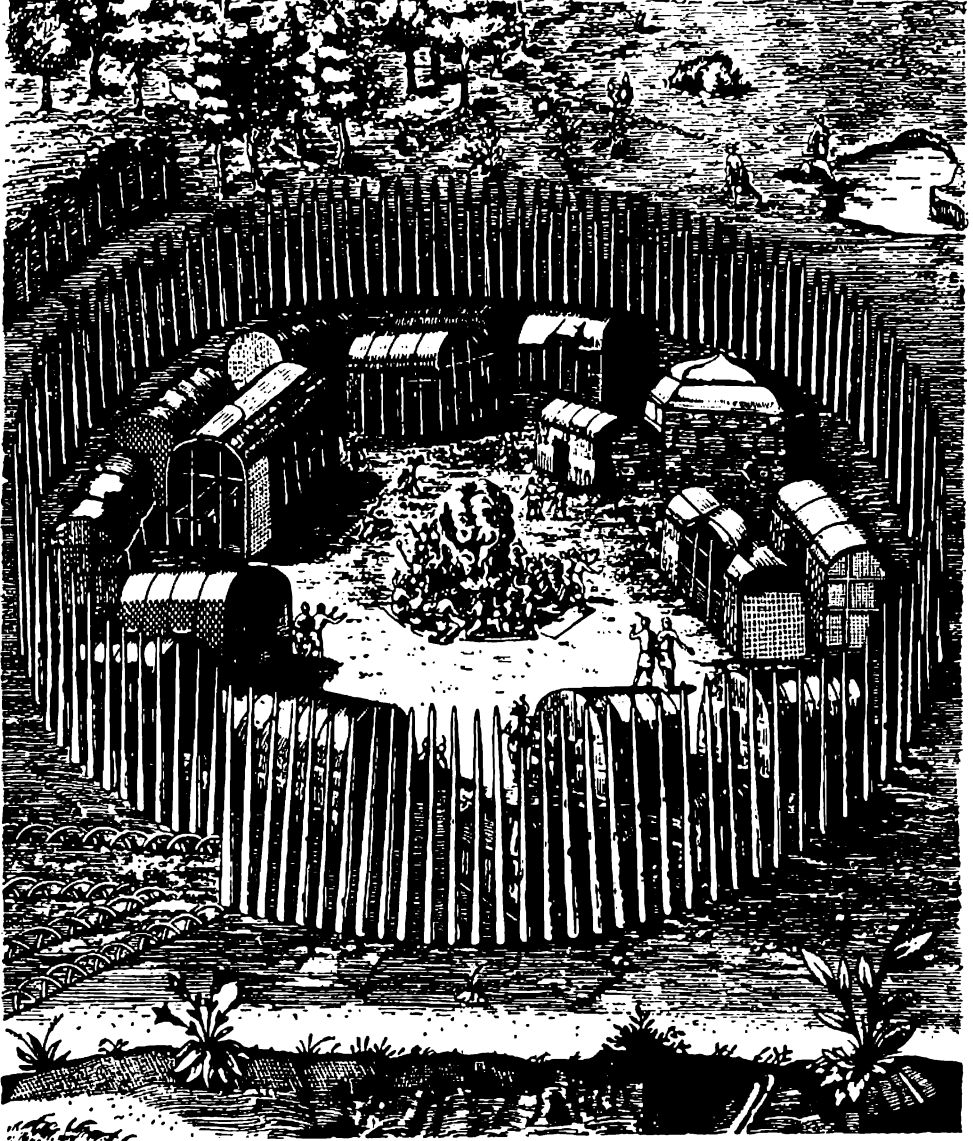
এই মানুষেরা আর গুহায় বাস করে না, মাটির নীচে ঘর করেও বাস করে না, তারা থাকে বাড়িতে। ভার্জিনিয়ায় ষোড়শ শতাব্দীর একটি রেড ইণ্ডিয়ান পল্লী।

পাহাড়পর্বত স্থায়ী জিনিস। মানুষের তৈরি দালানকোঠার মতো গুহার দেয়াল অত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে না।

এমন একটা গুহার কথাই ধর। অসংখ্য বার এর মালিক বদল হয়েছে। প্রথমে ছিল এতে মাটির নীচের জল। জলের সঙ্গে এলো কাদা, বালু আর নুড়ি।

তারপর জল নেমে গেলে সেই গুহায় মানুষের বসতি হল। কাদায় কুড়িয়ে পাওয়া এবড়ো-খেবড়ো ধারাল পাথরের টুকরো থেকেই তা জানা যায়। এই সব ধারাল যন্ত্রপাতি দিয়ে আদিম মানুষ মরা পশু কাটত, হাড় থেকে মাংস ছাড়াত, হাড় ভেঙে তার ভেতর থেকে মজ্জা বের করত। অর্থাৎ এই গুহায় যারা এসেছিল তারা ইতিমধ্যেই শিকারী হয়ে উঠেছিল।

তারপর বহুকাল কেটে গেল। মানুষ সে-গুহা পরিত্যাগ করল। অন্য অধিবাসীরা সেখানে বাস করতে আরম্ভ করল। এর দেয়ালগুলো ঘসে মেজে পালিশ করা হল। এ হল গুহা-ভল্লুকের কাজ। বাড়ির পাথরের দেয়ালে তার লোমশ পিঠের ঘসা লেগে এমন হয়েছে। আর তার খোদ অস্তিত্বও সেখানে আছে — মানে তার চওড়া কপাল আর লম্বা মুখওয়ালা করোটি আছে সেখানে।

পরের স্তরে আবার আমরা মানুষের আবাসের চিহ্ন দেখতে পাই: অগ্নিকুণ্ডের অঙ্গার আর ছাই। ভাঙাচোরা হাড়গোড়, পাথর আর হাড়ের তৈরি হাতিয়ার। আবার সেই গুহায় মানুষ এসে বাসা বেঁধেছিল। আমরা এসব মানুষ দেখতে পাই না কিন্তু তাহলেও তাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে পারি। সেজন্য কেবল দরকার তাদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র লক্ষ্য করা। অনভিজ্ঞ চোখে দেখলে এগুলো ভাঙা টুকরো আর পাথরের কুচি ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। কিন্তু খুব ভালো করে পরীক্ষা করলেই এগুলোর মধ্যে ভবিষ্যতের মোটা ছুঁচ আর ছুরি চিনতে পারবে। কোন হাতিয়ারের ধার ছুরির মতো ধারাল, কোনটার ডগা মোটা ছুঁচের মতো তীক্ষ্ন।

ওগুলোই হল আমাদের যন্ত্রপাতির ঠাকুর্দা। সবচেয়ে প্রাচীনটি হল একটা হাতুড়ি — গোল করা পাথরের নোড়া।

আমরা যদি জঞ্জাল সরিয়ে গুহার তলা ভালো করে খুঁজি, তাহলে ঐ হাতুড়ি-ঠাকুর্দার কাছেই দেখতে পাব নেহাই-দিদিমাকেও।

হাতুড়ি-ঠাকুর্দা ছিল পাথরের।

নেহাই-ঠাকুরমা হল হাড়ের।

আধুনিক নেহাইয়ের সঙ্গে এই হাড়ের নেহাইয়ের আকাশ পাতাল পার্থক্য। কিন্তু তাহলে কী হবে, ভালো করে পরীক্ষা করলেই দেখবে সেটা মন্দ কাজ দিত

হাতিয়ারে আরও বৈচিত্র্য এলো। দুটো ফলা, একটা তুরপুন ও তীব্রধার পাথরের ফলক, বিভিন্ন ধরনের উঁখো।

না। এর সারা গায়ে হাতুড়ির দাগ আর আঁচড় কাটা। বেশ বোঝা যায় যন্ত্রপাতি বানানোর ধাক্কা নেহাই বেশ ভালো করেই হজম করতে পারত।

এসব হাতিয়ার থেকে আমরা কী জানতে পারি?

এগুলো থেকে বুঝতে পারি যে গুহার নতুন প্রভুরা আদি অধিবাসীদের তুলনায় অনেক উন্নত। এদের ভেতরে যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে তাতেই মানুষের শ্রম হয়েছে অনেক বিচিত্র এবং জটিল।

গোড়ার দিকে একই রকমের ধারাল পাথর দিয়ে সব কাজ চলত। এখন তারা একটা যন্ত্র দিয়ে কাটত, আর একটা দিয়ে ফুটো করত, অন্যটা দিয়ে চাঁচত আর অন্য একটা দিয়ে চিরত। ডগা ছুঁচল যন্ত্রটা হল তুরপুন। সেটা দিয়ে তারা পোশাক তৈরির সময় চামড়ায় ফুটো করত। পাশে খাঁজকাটা যন্ত্রটা হল চাঁচার। এটা দিয়ে মাংস কেটে তার চামড়া ছাড়ানো হত। আর ঐ ডগা ধারাল জিনিসটা হল বর্শার ফলা।

স্পষ্টই মানুষের কাজ এবং তার ঝামেলাও বেশ বেড়ে গেছে। সময় বদলে গেছে — আবহাওয়া ভয়ংকর, কনকনে ঠাণ্ডা। মানুষকে ভাবতে হচ্ছে নিজেদের জন্য ভালুকের চামড়ার পোশাক তৈরির কথা, শীতের মাংস সরবরাহের কথা, আর মাথা গুঁজবার জন্য গরম আশ্রয়স্থানের বিষয়। একটা যন্ত্র, তা যেমনই হোক

না কেন — তা দিয়ে এত কাজ করা যেত না। একগোছা যন্ত্র দরকার হল তাদের।

আমাদের নিজেদের ঠাকুর্দার বাড়িতে আমাদের যন্ত্রপাতিগুলোর ঠাকুর্দাদেরও দেখা মিলবে।

তবে কালের গ্রাস থেকে যে-সব জিনিস বেঁচেছে তাই শুধু আমরা দেখতে পাই। আর কাল হল খুব খারাপ পাহারাদার। শুধু সবচেয়ে বেশি স্থায়ী, সবচেয়ে বেশি জোরাল জিনিস — যা পাথর আর হাড়গোড়ের তৈরি তাই রেখে দিয়েছে আমাদের জন্য ধরে। কাঠ বা চামড়ার তৈরি যা কিছু তাই কালক্রমে ধ্বংস পেয়েছে। সেজন্যই তুরপুন আমাদের হাতে এলেও সেই তুরপুনে সেলাই করা কোন জামা-কাপড় আমাদের হাতে আসে নি। বর্শার পাথরের ফলকটুকুই এসেছে — যে কাঠের ডাঁটের মাথায় আঁটা ছিল সে বর্শা, তা আর আসে নি।

অবশিষ্ট যতটুকু জিনিস পাওয়া গেছে তা থেকে যা যা খোয়া গেছে সেগুলো আন্দাজ করে নিতে হবে। প্রায় অস্পষ্ট চিহ্ন ধরে, ভাঙা টুকরো-টাকরা থেকে আমাদের ফের গড়ে তুলতে হবে এমন সমস্ত জিনিসপত্র যেগুলো আজকের দিনে নেই — আমাদের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে পচে গলে নষ্ট হয়ে গেছে।

আমাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া যাক্।

খননকার্য করতে হয় সাধারণত ওপর থেকে নীচে, সবচেয়ে উঁচু স্তর প্রথমে খোঁড়া হয়, তারপর ক্রমে ক্রমে নীচে নামতে থাকে — পৃথিবীর অন্তঃস্থলে আর ইতিহাসের অতলে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা যেন উল্টো দিক থেকে বই পড়েন। শেষ অধ্যায় দিয়ে তার যেন পড়া শুরু হয় আর পড়া শেষ হয় প্রথম অধ্যায়ে। আমরা গল্প আরম্ভ করেছি সবচেয়ে নীচু স্তর থেকে — গুহার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় থেকে, আর এখন আমরা উপরে উঠছি — ক্রমেই আমাদের যুগের কাছাকাছি আসছি।

তারপরে গুহায় কী হয়েছিল?

সে স্তর পরীক্ষা করলে দেখা যাবে লোকজন বহুবার গুহা ছেড়ে গিয়ে পরে আবার ফিরে এসেছে সেই গুহায়। গুহায় যখন মানুষ থাকত না তখন সেখানে থাকত হায়না আর ভালুক। ধুলোকাদায় ভরে থাকত গুহা আর তাতে জমে থাকত গুহার ছাদ থেকে খসে-পড়া পাথরের কুচি। বহুকাল পরে মানুষের দল আবার খুঁজে বার করত সেটাকে, তখন আগের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলবার কিছুই অবশিষ্ট থাকত না সেখানে।

বছর কাটে, শতাব্দী কাটে, সহস্র সহস্র বছর কাটে। লোকজন খোলা আকাশের নীচে ঘরবাড়ি বানাতে শিখল। আগে থাকতে গড়া প্রকৃতিদত্ত আশ্রয়স্থল ব্যবহার

পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে হাড় আর শিঙের হাতিয়ারও এসে যুক্ত হল। বল্‌গা হরিণের শিঙের তৈরি ছুরি আর হারপুনের ফলা।

করা তারা ছেড়ে দিল। গুহা খালি হয়ে গেল। কেবল রাখালরাই সবুজ তরাইয়ে পশুচারণ করবার সময় সাময়িক কিছুকালের জন্য গুহায় থাকত, নয়ত কোন পথিক দুর্যোগের সময় পাহাড়ে আটকে পড়লে থাকত সেখানে।

অবশেষে আমরা গুহার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে এসে পড়েছি। আবার লোকজন এলো সেখানে। এবার কিন্তু আর তারা সেখানে বসবাসের জন্য এলো না — এলো প্রাচীনযুগের মানুষ সেখানে কেমন করে থাকত তাই জানতে।

প্রাচীন যুগের মানুষের পাথরের তৈরি হাতিয়ার খুঁড়ে বার করার জন্য এরা এলো আধুনিক যুগের লোহার যন্ত্রপাতি নিয়ে।

অতীত-অনুসন্ধানকারী এই সমস্ত দল পরতের পর পরত খুঁড়ে এই সব গুহার ইতিহাস আদ্যন্ত পড়ে ফেলল।

হাতিয়ারগুলোর তুলনা করে তারা খুঁজে বের করল বংশপরম্পরায় মানুষের নৈপুণ্য কী ভাবে বেড়েছে, কী ভাবে মানুষের অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটেছে। তারা দেখল যে এই হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের হাতিয়ার একই রকম থাকে নি — সর্বদাই তা হয়েছে উন্নত থেকে আরও উন্নত। মামুলি ভোঁতা কাটারির জায়গা নিয়েছে তিনকোনা তীক্ষ্ন ফলক, অর্ধবৃত্তাকার ধারযুক্ত চাঁচার যন্ত্র। তারও পরে দেখা দিল পাথরের ফলা থেকে তৈরি ছুঁচ আর তুরপুন। পাথরের যন্ত্রপাতির সঙ্গে এসে জুটল হাড় আর শিঙের যন্ত্রপাতি। পাথরের উপর কাজ করার নোড়ার পাশাপাশি দেখা দিল হাড়, চামড়া, আর কাঠ নিয়ে কাজের যন্ত্রপাতি। মানুষ

একই পাথর থেকে কাটবার জন্য বাটালি বানাল, চামড়া চাঁছার যন্ত্র বানাল আর কাঠে গর্ত করার জন্য তুরপুন বানাল। মানুষের নকল নখ আর দাঁত হল আরও ধারাল, দেখতে হল আরও অন্য রকমের। যে হাত দিয়ে সে শিকার ধরত তা হতে লাগল আরও লম্বা।

একটা লম্বা হাত

মানুষ যখন বর্শা বানাল — লাঠির ডগায় পাথরের ফলা লাগাল অমনি তার নিজের হাতের দৈর্ঘ্য গেল বেড়ে।

এতে সে হল আরও শক্তিশালী আর সাহসী।

আগে মানুষ ভালুকের মুখোমুখি হলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দৌড়ে পালাত তার কাছ থেকে। গুহাবাসী লোমশ জীবটির সঙ্গে সে শক্তির পরীক্ষা করতে চাইত না। ছোট ছোট প্রাণীদের সে সহজেই কাবু করত, কিন্তু একাকী ভালুকের সামনে আসতে সাহস পেত না। সে বেশ ভালো করেই জানত যে ভালুকের কবল থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা যায় না।

বর্শা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থাই চলেছিল। বর্শা তাকে সাহস দিল। এখন আর সে ভালুক দেখলেই পালায় না। বরঞ্চ সোজাসুজি তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে যায়। ভালুকও তার বিশাল দেহ নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে শিকারীর পানে ছুটত। কিন্তু তার থাবা মানুষের গায়ে লাগবার আগেই একটা তীক্ষ্ন ফলা এসে বিঁধত তার লোমশ ভুঁড়িতে। কারণ বুঝলেই ত, ভালুকের থাবার চেয়ে বর্শা ছিল বেশি লম্বা। আহত ভালুক তখন 'খোঁচার বদলে লাথি' মারবার উদ্দেশ্যে রেগে এগিয়ে যেত বর্শার দিকে — আর তাতে পাথরের ফলা আরও ভালো করে গেঁথে বসত তার নাড়িভুঁড়ির ভেতরে। যদি অবশ্য বর্শার কাঠের ডাঁট কোনও রকমে ভেঙে যেত, তাহলে আর শিকারীর রক্ষা ছিল না; ভালুক তাকে থাবা দিয়ে ধরে পায়ের নিচে ফেলে দাঁত আর থাবা দিয়ে মুখ আর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালুক মানুষের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না; কারণ মানুষ তখন একা একা শিকারে যেত না। তার সাহায্যের জন্য চিৎকার শুনলে গোটা দলই আসত ছুটে। লোকেরা চারিদিক থেকে ভালুককে ঘিরে ধরে পাথরের ছোরার আঘাতে তার দফা রফা করত।

বর্শা মানুষকে এমন সব শিকার দিতে লাগল যা আগে সে স্বপ্নেও ভাবতে
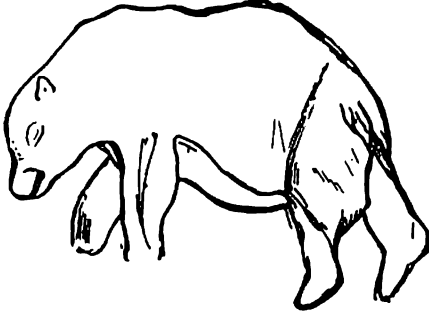
নিহত ভালুক (আদিম শিল্পীর আঁকা)।

পারে নি। গুহার ভেতরকার পাথরের তৈরি ভাঁড়ার ঘরগুলোতে এখনও স্তূপাকার ভালুকের হাড়গোড়ের দেখা মেলে। জমিয়ে রাখার মতো ভালুকের মাংস যে পাওয়া যেত এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ভালো শিকার মিলত মানুষের।

বর্শার সবই ভালো ছিল যদি শুধু ভালুকের মতো পশুই শিকার করতে হত মানুষকে। কিন্তু তা ত নয়, মানুষকে আরও চটপটে আর ক্ষিপ্রগতি জন্তুও ত শিকার করতে হত।

সমভূমিতে বিচরণ করতে করতে হয়ত তাদের দলবল বন্য ঘোড়া কি বাইসনের পালের সম্মুখীন হল। তারা হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোত কিন্তু সামান্য খস্‌খস্‌ আওয়াজ কানে গেলেই পশুর পাল চমকে উঠে বায়ুবেগে পলায়ন করত।

মানুষের হাত তখনও ঘোড়া আর বাইসন শিকারের পক্ষে ছিল খুব ছোট। শিকার নিজেই তখন মানুষকে দিল এক নতুন শক্ত জিনিস — হাড়।

পাথরের বাটালি দিয়ে সে হাড় থেকে একটা হাল্কা ছুঁচলো অংশ কেটে বের করে নিল। সেটা গেঁথে নিল ছোট্ট একটা কাঠের ডগায়। এমনি করে একটা নতুন অস্ত্র হল তার — ছোঁড়ার উপযুক্ত হালকা ছোট বল্লম। ভারী বর্শা সে ধাবমান ঘোড়ার দিকে ছুঁড়ে মারতে পারত না; কিন্তু এই ছোট হালকা বল্লমটা দিয়ে তাক করতে পারত। হাল্কা হাড়ের ফলার ছোট্ট বল্লমটা যেতও দূরে। এমনি করে মানুষের হাত আরও লম্বা হল। উড়ন্ত অস্ত্র হাতে পেয়ে সে দৌড়বার মুখেই পালিয়ে যাবার আগে ঘোড়াকে আক্রমণ করতে পারত।

অবশ্য এটা ঠিক যে চলন্ত জিনিসে লক্ষ্য ভেদ করা সহজ কথা নয়, এতে হাতের জোর আর তীক্ষ্ন দৃষ্টি চাই।

ছেলেবেলা থেকেই শিকারীরা বল্লম ছোঁড়া শিখত, তবু প্রায় দেখা যেত যে শিকারের সময় শত শত হালকা বল্লম ছুঁড়েও মাত্র ডজনখানেক লক্ষ্য ভেদ করতে পেরেছে।

বহু যুগ, বহু হাজার বছর কেটে গেল। ঘোড়া আর বাইসনের পাল গেল কমে।
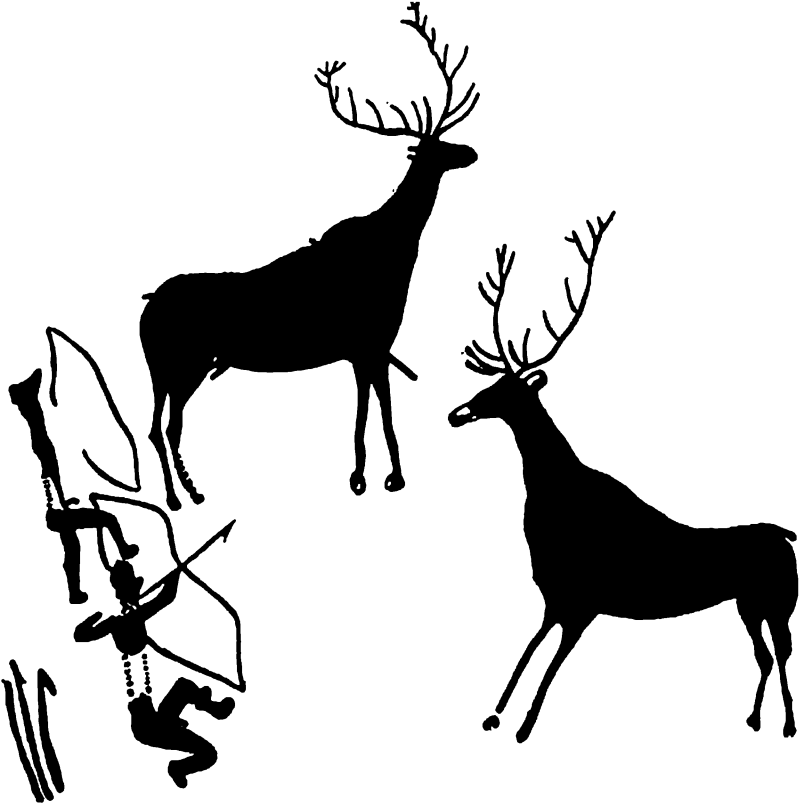
শিকারী এখন ধনুর্ধারী (গুহার দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবি)।

মানুষ ত আর তাদের কম মারে নি। ক্রমেই বেশি বেশি খালি হাতে শিকারীদের ঘরে ফিরতে হত। আরও দূরের জিনিস মারবার জন্য নতুন অস্ত্র আবিষ্কার দরকার হয়ে পড়ল। মানুষের হাত আরও লম্বা করার প্রয়োজন দেখা দিল।

মানুষ তৈরিও করল নতুন অস্ত্র — চারা গাছ কেটে বাঁকিয়ে ধনুক বানিয়ে, কাঁচা চামড়ার সরু ফালি দিয়ে সে ছিলা তৈরি করে নিল।

শিকারীর ধনুক হল।

ধনুকের ছিলা ধীরে ধীরে টানলে তার কঠিন পেশী থেকে শক্তি এসে তাতে সঞ্চিত হত। তারপর ছিলা ছেড়ে দিলেই সেই সঞ্চিত শক্তি তৎক্ষণাৎ তীরের

মধ্যে সঞ্চালিত হত। আর অমনি বাজপাখির মতো শূন্য ভেদ করে সেই তীর ছুটত শিকারের পেছনে।

হাতে ছোঁড়া ছোট বল্লমের চেয়ে অনেক দূর যেত তীর। তীর আর হালকা বল্লম যেন দুই ভাইবোন। তবে বোনটি হল ভাইয়ের চেয়ে হাজার বছরেরও ছোট।

মানুষের হাজার হাজার বছর লেগেছে তীর বানাতে। প্রথম প্রথম তারা ছোট বর্শা লাগাত ধনুকে। সেজন্য তাদের ধনুকও করতে হত মানুষ-সমান বড়।

এমনি করে মানুষ তার ছোট্ট দুর্বল হাতকে আরও লম্বা আর শক্তিধর করে তুলল। হরিণের শিঙ্‌ কিংবা ম্যামথের দাঁত দিয়ে কোন ধারাল অস্ত্র বানিয়ে মানুষ সেই জন্তুদের অস্ত্রশস্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করতে লাগল। আর এর ফলে মানুষ হল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জীব।

যে হাত ছোট বল্লম দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করত কিংবা ধনুকের ছিলা টানত সে হাত বড় সাধারণ হাত নয়। এ হল 'দৈত্যের' হাত। সেই কিশোর দৈত্য শিকারে বেরোলে সে আর জন্তুর পেছনে ধাওয়া করত না — সে ছুটত দলকে-দলের পেছনে।

তীরধনুকের আবিষ্কার হয় হিমবাহ সরে যাবার পর। কিন্তু আমাদের এই আখ্যানের নায়ক এখনও তুষার যুগ থেকে বেরিয়ে আসে নি।

একটা জীবন্ত জলপ্রপাত

সলুত্রে নামে ফ্রান্সে একটা খাড়া এবড়ো-খেবড়ো গিরিপৃষ্ঠ আছে। এই গিরিপৃষ্ঠের তলায় প্রত্নতত্ত্ববিদরা হাড়ের বিরাট স্তূপ উদ্ধার করেছেন। সেখানে ম্যামথের হাড়ের টুকরো, আদিম গবাদি পশু এবং গুহা-ভালুকের মাথার খুলি আছে।

তবে অধিকাংশ হাড়ই হল ঘোড়ার। স্থানে স্থানে হাড়গোড়ের একেকটা স্তূপ মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের হিসেবে সেখানে লাখখানেক ঘোড়ার ধ্বংসাবশেষ আছে।

ঘোড়ার এই গোরস্থান এলো কোত্থেকে?

পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদরা দেখতে পেলেন যে অনেক হাড়ই ভাঙা, সন্ধিচ্যুত, নয়ত ঝলসানো। স্পষ্ট বোঝা গেল যে এই স্তূপে আসবার আগে তারা কোন আদিম পাচকের হাতে পড়েছিল। তখন অনুসন্ধানের পর জানা গেল এগুলো ঘোড়ার কবর নয় — এ'টোকাঁটার বিরাট ঢিবি।
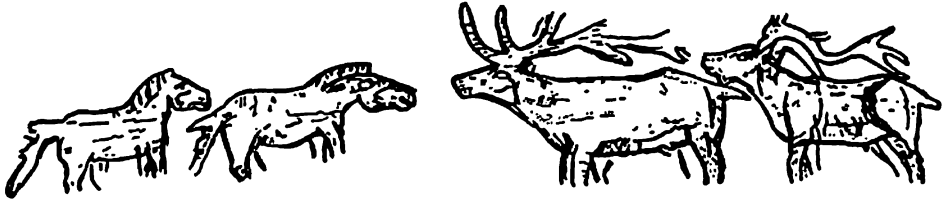
ঘোড়া আর হরিণ (হাড়ের গায়ে আঁকা)।

এমন বিরাট জঞ্জালের ঢিবি এক বছরে জমে উঠতে পারে না। তার মানে এই অঞ্চলে বহু বছর একাদিক্রমে মানুষের বাস ছিল। কিন্তু বিশেষ করে এই জায়গায় — খাড়া পাড়ের নীচে জঞ্জালের স্তূপ এল কেমন করে? আদিম ঘোড়া শিকারীরা কি নেহাৎই ঘটনাচক্রে সমভূমির বদলে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল?

সম্ভবত যা ঘটেছিল তা এই রকম: শিকারীরা সমভূমিতে এক পাল ঘোড়া দেখতে পেয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে গুঁড়ি মেরে মেরে তাদের ওপর চড়াও হয়েছিল। প্রত্যেক শিকারীর হাতে ছিল কয়েকটা করে ছোট বল্লম। যারা সামনে ছিল তারা সংকেতে জানিয়ে দিল ঘোড়ারা কোথায় — সংখ্যাতেই বা তারা কত, আর কোন্ দিকে যাচ্ছিল তারা। শিকারীদের একটা বৃত্ত সেই ঘোড়ার পালকে ঘিরে ঘন হয়ে আসতে লাগল ক্রমে ক্রমে। প্রথমে যে ঘোড়াগুলোকে সমভূমির ওপরকার ইতস্তত ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল, ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাদের বড় বড় মাথা, সরু সরু পা, বাঁকানো ঘাড়ের ওপরের কেশরের গুচ্ছ, পশমের মতো লম্বা লম্বা লোমে আবৃত দেহগুলি বেশ চেনা যেতে লাগল।

ঘোড়ার পাল সতর্ক হয়ে উঠল; শত্রুর আবির্ভাব আশঙ্কা করে পলায়নের জন্য তৈরি হল। কিন্তু ততক্ষণে বেজায় দেরি হয়ে গেছে। লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখাহীন পাখির ঝাঁকের মতো ছোট বল্লমের ঝাঁক ছুটে এলো তাদের দিকে।

ছোট বল্লমগুলো এসে তাদের পাঁজরে, পিঠে, ঘাড়ে বিঁধতে লাগল। কোথায় পালাবে তারা? তিনদিকেই তারা শত্রুদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠা এই প্রান্তরে একটিই মাত্র বেরোবার পথ আছে। এলোপাথাড়ি চিৎকার করতে করতে শিকারীদের হাত থেকে মুক্তির আশায় বহির্গমনের পথে ছুটল তারা। শিকারীরাও কিন্তু এটাই চেয়েছিল। তারা পালটিকে ঐ দিকেই খেদিয়ে নিয়ে চলছিল সেই গিরিপৃষ্ঠের কাছাকাছি। আতঙ্কে পাগল হয়ে দিশেহারার মতো ঘোড়াগুলো ছুটতে লাগল। হাওয়ায় লেজ উড়িয়ে, সারা গা ঘামে ভিজিয়ে তারা

জীবন্ত নদীর মতো ছুটতে লাগল। সেই স্রোত ছুটে চলেছে উঁচু জমির দিকে আর তারপরেই হঠাৎ — সেই খাড়া খাদ! সামনে যে ঘোড়াগুলো ছিল তারা ইতিমধ্যেই খাদের পাশে এসে পড়ে বিপদ টের পেয়েছিল। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তারা নাক দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করল কিন্তু থামা অসম্ভব তাদের পেছন থেকে অন্যেরা চাপ দিয়ে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলল।

তখন সেই জীবন্ত নদী উঁচু পাহাড় থেকে জলপ্রপাতের মতো গড়িয়ে নীচে পড়ে রক্তাক্ত মৃতদেহের স্তূপে পরিণত হল।

শিকার শেষ হল। পর্বত চূড়ার নীচে আগুন জ্বালানো হল। শিবিরে বৃদ্ধরা শিকার ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিল। সমস্ত দলটারই সম্পত্তি হল ওগুলো। তবে কিনা সবচেয়ে সাহসী আর বুদ্ধিমানদের দেওয়া হল ভালো টুকরোগুলো।

নতুন মানুষ

ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকালে মনে হবে সেটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দু-এক ঘণ্টা কেটে গেলে তখন আর সন্দেহ থাকে না যে সেটা নড়েছে।

মানুষের জীবনও ঠিক তেমনি। আমাদের চতুর্দিকে কিংবা নিজেদের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটছে তা আমরা সদা সর্বদা লক্ষ্য করি না। ইতিহাসের ঘণ্টার কাঁটা থেমে থাকে বলে মনে হয় আমাদের। কয়েক বছর পরেই মাত্র হঠাৎ আমাদের চেতনা হয় যে সে কাঁটা চলেছে, আমরাও এগিয়েছি আর তার সঙ্গে চারপাশের সব কিছুই গেছে বদলে।
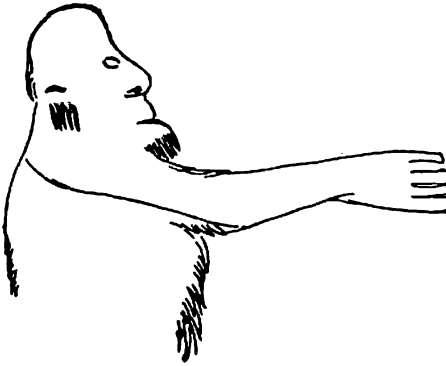
ক্রো-ম্যাগনন মানুষের নিজের হাতে আঁকা তার প্রতিকৃতি (ম্যামথের হাড়ের ওপর আঁকা)।

পুরোনো জিনিসের সঙ্গে নতুনকে মিলিয়ে দেখবার মতো আমাদের ডায়েরী, ফটোগ্রাফ, কাগজ, বই, কত কি আছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের মিলিয়ে দেখবার কিছুই ছিল না। তাদের মনে হত জীবন গতিহীন,

অপরিবর্তনীয়। ঘড়িতে যেমন ঘর-কাটা না থাকলে ঘণ্টার কাঁটার গতি বোঝবার কোনও উপায় থাকে না, তেমনি পুরানো জিনিসের সঙ্গে নতুনের তুলনা না করলেও তাদের পার্থক্য বোঝা অসম্ভব।

পাথরের হাতিয়ার বানাবার সময় প্রত্যেকটি কারিগর যে যার কাছে শিখেছে তার প্রত্যেকটি কাজ অবিকল নকলের চেষ্টা করে।

ঘরবাড়ি তৈরির সময় মেয়েরা তাদের ঠাকুমা-দিদিমার কাছে যেমন করে উনুন বানাতে শিখেছিল ঠিক তেমনি করে সাজাত পাথরের টুকরোগুলো। প্রচলিত রীতি অনুসারেই শিকার করা হত।

তথাপি নিজের অজানতেই লোকেরা তাদের যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি আর কাজ-কর্ম অদলবদল করে নিচ্ছিল।

প্রত্যেকটি নতুন হাতিয়ারই প্রথম প্রথম পুরানোর মতো দেখতে লাগল। প্রথম ছোট বল্লম আগের লম্বা বর্শার মতো ছিল দেখতে। প্রথম তীর ছিল আবার ছোট
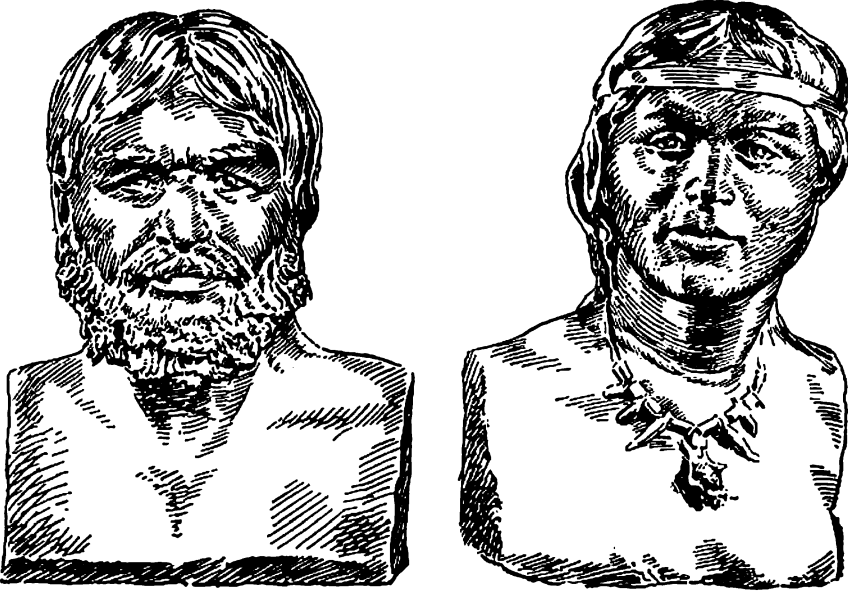
দেখতে একালের মানুষের ক্রো-ম্যাগনন মানুষের সঙ্গে কোন তফাত ছিল না। ক্রিমিয়ায় ক্রো-ম্যাগনন মানুষের মাথার যে খুলি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে ক্রো-ম্যাগনন মানুষের পুনঃস্থাপিত চেহারা।

বল্লমেরই মতো দেখতে। কিন্তু তীর আর লম্বা বর্শা দুটো আলাদা জিনিস হয়েছিল ইতিমধ্যেই। এবং তীরধনুক নিয়ে শিকার করা বা বর্শা হাতে শিকারে ছোটা মোটেই এক কথা ছিল না।

শুধু যে হাতিয়ারই বদলাল তা নয়। মানুষের নিজেরও পরিবর্তন ঘটল। খনন করতে গিয়ে যে-সব কঙ্কাল ওঠে তা থেকেই এটা বুঝতে পারা যায়। যে মানুষ প্রথম গুহায় বাস করত তার সঙ্গে তুষারযুগে যে মানুষ গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এলো তার তুলনা করলেই দেখবে এরা ছিল পৃথক জীব। নিয়ানডারথ্যাল মানুষ গুহায় বাস করার সময় বনমানুষের বংশ-পরিচয়ের দাবি নিয়েই সেখানে গিয়েছিল। তার পিঠ ছিল কুঁজো, চলন ছিল বেয়াড়া, মুখে কপাল কি থুতনির লেশমাত্র ছিল না বললেই হয়। কিন্তু গুহা ছেড়ে যখন সে বেরিয়ে এলো তখন সে ক্রো-ম্যাগনন মানুষ — সটান সোজা — আমাদের সঙ্গে তার সামান্যই প্রভেদ নজরে পড়ে।

ঘরের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়

মানুষ যেমন বদলাল তার ঘরদোরও বদলাল সেই সঙ্গে। ঘরদোরের ইতিহাস লিখতে হলে আমাদের আরম্ভ করতে হবে গুহা থেকে। এ বাড়ি মানুষ তৈরি করে নি। সে খুঁজে বার করেছিল। সেটা ছিল প্রকৃতির নিজের তৈরি। কিন্তু প্রকৃতি মোটেই ভালো গৃহ-নির্মাতা নয়। পাহাড়-পর্বতে নাড়া দিয়ে সে যখন তাতে গহ্বর সৃষ্টি করত তখন মোটেই ভাবত না কেউ কখনও সেই গুহায় বসবাস করবে কিনা। সুতরাং মানুষ যখন নিজেদের জন্য গুহার সন্ধানে বেরোত তখন তাদের ঠিক যেমন দরকার তেমন খুব কমই তারা খুঁজে পেত। ঘরের ছাদ হয়ত খুব নীচু; নয়ত দেয়াল হত পড়ো-পড়ো আর নয়ত গুহার মুখ হত এত ছোট যে হামাগুড়ি না দিয়ে তার ভেতরে ঢোকা সম্ভব হত না। গোটা দলটাই তখন সেই গুহাকে উপযুক্ত রূপ দিতে উঠে পড়ে লেগে যেত — পাথর দিয়ে মেঝে ঘসে পালিশ করত, কাঠের খুঁটি দিয়ে দেয়াল সমান করে নিত। ঢোকবার মুখের কাছেই চুল্লীর জন্য গর্ত খুঁড়ে টালি পাথর দিয়ে চারপাশ বাঁধিয়ে দিত। মেয়েরা যত্ন করে ছোট ছোট বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য 'বিছানা' পাতত। পালকের বিছানার বদলে তারা গর্ত খুঁড়ে নরম ছাই এনে সেটা ভরিয়ে ফেলত, দূরের এক কোণে ভাঁড়ার বানিয়ে তাতে ভালুকের মাংস ও অন্যান্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে রাখত।

এমনি ভাবে তারা প্রকৃতির তৈরি গুহা ঠিক করে নিজেদের শ্রম দিয়ে তাকে বাসযোগ্য করে তুলল।

যত দিন কাটতে লাগল ততই তারা ঘর সাজানোর জন্য বেশি করে খাটতে লাগল। যেই কোথাও কোন ঝুঁকে-পড়া চূড়াকে ছাতের মতো দেখাত অমনি তারা সেখানে দেয়াল তুলে দিত। কোনও দেয়াল পেলে তারা ছাত বানিয়ে নিত তার ওপরে।

দক্ষিণ ফ্রান্সের পর্বতাঞ্চলে এমন এক আদিম বসতবাড়ি রক্ষিত হয়ে আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এর অদ্ভুত এক নাম দিয়েছে — 'ভূতের বাড়ি'। এই বিশাল পাথরের এই খোঁড়লের মধ্যে একমাত্র ভূতের পক্ষেই চুল্লীর পাশে গা গরম করা সম্ভব বলে তাদের ধারণা। তারা নিজেদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে আর একটু ভালো করে সংবাদ রাখলে তাহলে জানতে পারত যে তাদের ঐ 'ভূতের বাড়ি' মোটেই ভূতের তৈরি নয় — মানুষেরই হাতে গড়া।

এখানে আদিম শিকারীরা একদা ঝুঁকে-পড়া এক চূড়ার কোণে দুটো ভাঙা পাথরের দেয়াল দেখতে পেল। তারা তখন আর দুটো দেয়াল গড়ে নিল। একটা তৈরি হল টালিপাথর জমিয়ে আর একটা হল ডালপালায় চামড়া জড়িয়ে। দেয়ালগুলোর কথা আমরা শুধু কল্পনা করতেই পারি কারণ কালের গ্রাস থেকে এতটুকু কিছু আর রক্ষা পায় নি।

এই চার দেয়ালের মধ্যে ছিল একটা শিলা-মাটির ঘর — খুঁড়ে খুঁড়ে তৈরি করা একটা মস্তবড় গর্ত। সেই গর্তের তলায় চকমকি পাথরের টুকরো, হাড় আর শিঙের যন্ত্রপাতি জমা করা আছে। সেই 'ভূতের বাড়ি' হল অর্ধেক গুহা আর অর্ধেক ঘর। সত্যিকার ঘরের চেয়ে খুব বেশি তফাত ছিল না এটা।
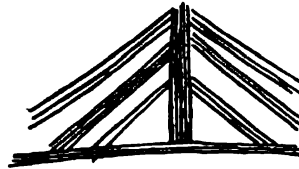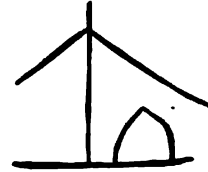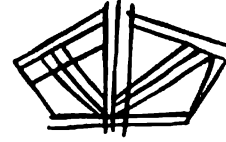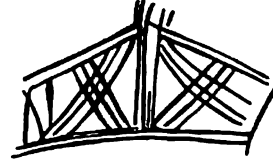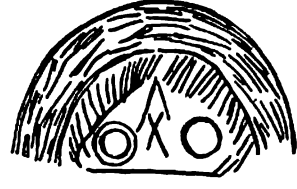
আদিম মানুষ তার বাসস্থানের এই রকম ছবি আঁকে।

দুটো দেয়াল গড়ে তোলবার পরে চারটে দেয়াল গড়ে তুলতে মানুষের খুব বেশি দিন লাগে নি।

এই ভাবে দেখা দিল প্রথম ঘরবাড়ি — গুহার ভেতরে নয়, ঝুঁকে-পড়া চূড়ার নীচে নয়, খোলা আকাশের নীচে — মানুষের নিজের হাতে গড়া।

আদিম শিকারীদের আবাস

১৯২৫ সালের শরৎকালে দন নদীর তীরে গাগারিনো গ্রামে আন্তোনভ নামে এক চাষী তার বাড়ীর উঠোন খুঁড়ে মাটি তুলছিল। নতুন একটা চালাঘরের গায়ে আস্তর লাগানোর জন্য কাদামাটির দরকার হয়ে পড়েছিল।

মাটি খুঁড়তে গিয়ে কোদাল প্রায়ই ঠকাস-ঠকাস শব্দে এসে ঠেকতে লাগল মাটিতে পোতা হাড়গোড়ের গায়ে।

ঠিক সেই সময় গাঁয়ের মাস্টারমশাই ভ্লাদিমিরভ পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আন্তোনভ তাঁকে অভিযোগ করে বলল:

'কোথা থেকে যে এত হাড়গোড় এখানে এলো কে জানে! খোঁড়াই মুশকিল দেখছি। কোদাল ভাঙার যো...'

মাস্টারমশাইয়ের জায়গায় আর কেউ হলে হয়ত ওখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলার পর নিজের পথ ধরত। কিন্তু মাস্টারমশাই লোকটির বিজ্ঞানে খুবই শখ ছিল। তিনি কাছে এগিয়ে এসে গর্তের ভেতর থেকে সবে খুঁড়ে বার করা একটা বিশাল লম্বা দাঁত বেশ মনোযোগ দিয়ে হাতে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। দাঁতটা ঠিক যেন পালিশ করা। স্পষ্টই বোঝা গেল অত বিশাল দাঁত দৈত্যাকার ম্যামথের ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

দন নদীর তীরে কিনা ম্যামথ! অবাক হওয়ারই কথা বটে। মাস্টারমশাই একগাদা হাড়গোড় ওখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই করে কাছের ছোট শহরের স্থানীয় মিউজিয়মে নিয়ে গেলেন।

ঐ রকম কোন ছোট মিউজিয়মে তোমরা যদি কখনও এসে থাক, তাহলে দেখতে পাবে অনেক সময়ই সেখানে বিচিত্র রকমের সব জিনিসপত্র রাখা আছে। একটা ঘরে হয়ত দেখতে পাবে মর্মর-পাথরের কিউপিড-মূর্তি এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের প্রতিকৃতি। আবার আরেকটা ঘরে হয়ত স্থানীয় খনিজদ্রব্য ও গাছগাছড়ার সংগ্রহের পাশাপাশি শোভাবর্ধন করছে কাগজের মন্ডর

তৈরি পিথেকানথ্রোপাসের একটি মূর্তি — তার লোমশ হাতে ধরা আছে একটা মুগুর।

মাস্টারমশাই গাগারিনো গ্রামে পাওয়া হাড়গোড় যেখানে নিয়ে গেলেন সেটা ছিল ওরকম একটা মিউজিয়ম। এক্ষেত্রে মিউজিয়মের কিউরেটরের কাজ বলতে যা ছিল তা হল ম্যামথের দাঁতটাকে ক্যাটালগভুক্ত করে সেটা স্রেফ পিথেকানথ্রোপাসের মূর্তি আর খনিজদ্রব্যের পাশে রেখে দেওয়া। কিন্তু কিউরেটর এখানেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লেনিনগ্রাদের নৃবিজ্ঞান ও পুরাজাতিবিদ্যার মিউজিয়মে চিঠি লিখে পাঠালেন। লেনিনগ্রাদের নেভা নদীর তীরে অবস্থিত এই প্রাচীন মিউজিয়ম ভবনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রুশ বিজ্ঞানী ও পর্যটকদের সংগৃহীত মহামূল্যবান নানা সামগ্রী সংরক্ষিত আছে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই লেনিনগ্রাদ থেকে গাগারিনো পল্লীতে এসে হাজির হলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ জামিয়াতিন। লেনিনগ্রাদের এই বিজ্ঞানী এবং গাঁয়ের মাস্টারমশাই দু'জনে মিলে মাটি খুঁড়ে অনুসন্ধান চালানোর কাজে লেগে গেলেন।

এমন ঘটনা আমাদের দেশে হামেশাই ঘটে। কোন গ্রামের মাস্টারমশাই কিংবা পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক কোন প্রাচীন জিনিসের সন্ধান পেয়ে সেই সন্ধানপ্রাপ্ত জিনিসের কথা হয়ত শহরের কোন মিউজিয়মে লিখে পাঠালেন — অমনি শহর থেকে গ্রামে বিজ্ঞানীদের পাঠিয়ে দেওয়া হল মাটি খুঁড়ে আরও অনুসন্ধান চালানোর জন্য।

এখন গাগারিনোতে তাঁরা কী পেলেন দেখা যাক।

খোঁড়াখুঁড়ি করে একেবারে গোড়াতেই তাঁরা আবিষ্কার করলেন পাথরের তৈরি চাঁছার ও কাটার যন্ত্র, হাড়ের মোটা ছুঁচ, তুরপুন দিয়ে ফুটো করা মেরু শেয়ালের দাঁত, চুল্লীর ছাইপাঁশ ও পোড়া কয়লার সঙ্গে ম্যামথ এবং অন্যান্য জন্তুজানোয়ারদের মিশে-থাকা হাড়গোড়।

শুধু উঠোনে খোঁড়া গর্তের মধ্যেই নয়, যে কাদামাটি আন্তোনভ গোলার আস্তর হিশেবে ব্যবহার করেছিল তার মধ্যেও পাথরের হাতিয়ার আর ম্যামথের দাঁতের ভাঙা টুকরো ছিল। বলাই বাহুল্য, হাড়গোড় ও পাথুরে হাতিয়ারের টুকরো মাটিতে এত বেশি পরিমাণে ছিল যে আস্তর দেবার সময় সেগুলোকে আর বেছে আলাদা করা সম্ভব হয় নি।

মাসের পর মাস খোঁড়ার কাজ চলল — ক্রমেই বেশি করে নতুন নতুন জিনিস পাওয়া যেতে লাগল। মাটি খুঁড়ে পাওয়া জিনিসগুলোর মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার, অলঙ্কার, ছোট মূর্তি, জন্তুজানোয়ারের হাড়গোড়। সেগুলো সযত্নে
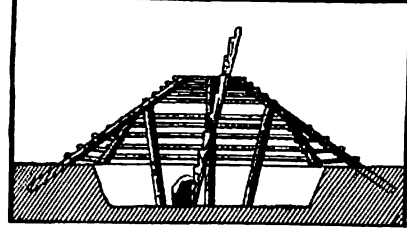
টমসন নদীর রেড ইণ্ডিয়ানদের শীতকালীন বাসগৃহ। এগুলোর গঠন আদিম মানুষের বাসগৃহের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাক্সে প্যাক করে লেনিনগ্রাদে পাঠানো হল। সেখানে নানা বিদ্যার বিশেষজ্ঞ লোকজন কাজে প্রবৃত্ত হলেন।

খনিজদ্রব্য বিশেষজ্ঞরা নিরূপণ করলেন কোন্ ধরনের পাথর থেকে হাতিয়ারগুলো তৈরি হয়েছে। আদিম মানুষেরা কী ধরনের জন্তুজানোয়ার শিকার করত তা জানার জন্য পুরাজীববিজ্ঞানীরা হাড়গুলো নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। দক্ষ পুনরুদ্ধারশিল্পীরা ম্যামথের হাড়ে তৈরি কালগ্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তিগুলোকে তাদের আদিরূপে ফিরিয়ে আনলেন।

ইতিমধ্যে একদল প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সমস্ত রকম নিয়মকানুন অনুযায়ী সন্তর্পণে মাটি খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাদের চোখের সামনে উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল আদিম শিকারীদের বসতির ছবি।

এই সুড়ঙ্গ-ঘরটা ছিল গোলাকার। এর দেয়ালগুলো পাথরের টালি, ম্যামথের দাঁত আর চোয়ালের হাড় দিয়ে ঠেকা দেওয়া। দেয়াল সম্ভবত বানানো হয়েছিল কাঠের কতকগুলো লগির ওপর চামড়ার ছাউনি দিয়ে। লগিগুলো ওপরে উঠে একসঙ্গে জড় হয়ে বাড়ির চাল গড়ে তুলত। দেয়াল মজবুত করার জন্যই তার গায়ে ভারী ভারী পাথর আর ম্যামথের হাড় ঠেকা দেওয়া হত।

বাইরে থেকে এ ধরনের আবাস একটা বড়সড় পর্ণকুটিরের মতো দেখাত। দেয়ালের কাছে ম্যামথের দাঁত কেটে গড়া ছোট ছোট নারী মূর্তি পাওয়া গেছে। এই রকম মূর্তিগুলোর মধ্যে একটা অতি স্থূলকায়া, অন্যটি কৃশ। শিল্পী সম্ভবত জীবন্তের অনুকরণেই এদের গড়েছেন। নারীদের জটিল কেশবিন্যাসও রীতিমতো যত্ন করে ছেনি দিয়ে কেটে কেটে তৈরি করা হয়েছে।

কুটিরটার মাঝখানে মেঝেতে একটা গোলাকার গর্ত ছিল। গর্তটা তোরঙ্গের কাজ করত। তার ভেতরে এমন সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে যেগুলো দেখলে বুঝতে বাকি থাকে না যে অধিবাসীরা সযত্নে রক্ষা করতে চাইত। ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্যে ছিল পাথরের ছুঁচ, মেরু শেয়ালের দাঁতের মালা, ম্যামথের লেজ।

পুঁতির আকারের হাড়ের টুকরোর তৈরি মালা।

ছুঁচ দিয়ে আদিম মানুষ সেলাই ফোঁড়াইয়ের কাজ করত, মালা গলায় পরত। কিন্তু ম্যামথের লেজ অমন যত্ন করে রাখার কী কারণ থাকতে পারে?

অন্যান্য জায়গায় যে-সব মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলো দেখলে বোঝা যায় যে আদিম শিকারীরা নিজেরা যাতে দেখতে পশুদের মতো হয় তার জন্য অনেক সময়ই কাঁধের ওপর পশুচর্ম জড়াত এবং পেছনে লেজ জুড়ত। এটা তারা কেন করত? সে কথা আমরা না হয় পরে বলব। আপাতত আমাদের কথা হচ্ছে আদিম মানুষের বসতি নিয়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আরও বহু জায়গাতেও গাগারিনো গ্রামে আবিষ্কৃত শিবিরের মতো শিবির দেখতে পাওয়া গেছে। ভরোনেজের কাছাকাছি একটি গ্রামে ত এত ঘন ঘন হাড়গোড় পাওয়া যেতে শুরু হল যে গ্রামটার নামই হয়ে গেল কোস্তেন্কি — অর্থাৎ অস্থিগ্রাম।

ঐসব হাড়গোড় দেখলে বুঝতে বাকি থাকে না যে কোন এক সময় ওখানে যারা বাস করত তারা ম্যামথ, গুহা-সিংহ, ভালুক, ঘোড়া শিকার করত। প. ইয়েফিমেন্কো ও স. জামিয়াতিন নামে দুজন সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদ কোস্তেন্কি শিবিরের ওপর খুঁটিনাটি অনুসন্ধান চালান। দেখা গেল, কোস্তেন্কিতে শিকারীরা একটা সুড়ঙ্গ-ঘরের মধ্যে না থেকে ঐ রকম কয়েকটা ঘরের মধ্যে বাস করত। তারা সকলে মিলে দলবদ্ধ হয়ে শিকারে বেরোত। তাদের শিবিরে পাথর ও হাড়ের তৈরি দস্তুরমতো সুসম্পন্ন হাতিয়ার পাওয়া গেছে। সেখানে হাতির দাঁতের তৈরি নারী মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। ঐ রকম একটা ছোট মূর্তির গায়ে আবার উল্কি

আঁকা, চামড়ার এপ্রন পরা। তার মানে অত আগে থাকতেই লোকে চামড়া বানানোর কৌশল জানত।

আদিম শিকারীদের বাসস্থান দেখতে আদৌ আমাদের আজকালকার ঘরবাড়ির মতো হত না। বাইরে থেকে কেবল চালটা দেখা যেত — সেটা দেখতে হত একটা গোল ঢিবির মতো। ঘরের ভেতরে ঢুকতে হত 'ধোঁয়ার রাস্তা' দিয়ে, কারণ চালে একটাই মাত্র ফুটো ছিল যা দিয়ে ধোঁয়া বাইরে বেরোত।

বেঞ্চের বদলে সুড়ঙ্গ-ঘরের দেয়ালের ধারে পাতা ছিল ম্যামথের চোয়ালের হাড়। আর মাতা বসুন্ধরাই করতেন বিছানার কাজ। একটা আয়তক্ষেত্র তারা পায়ে চেপে সমান করে নিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়ত একটা মাটির চাঙড়কে মাথার বালিশ করে।

হাড়ের বেঞ্চ আর মাটির বিছানার এই বাড়িতে টেবিল ছিল পাথরের। চ্যাপ্টা টালিপাথর বিছিয়ে চুল্লীর পাশেই সবচেয়ে আলোকিত জায়গাটিতে তারা কাজ করার টেবিল রাখত। এধরনের একটি টেবিলে এখনো যন্ত্রপাতি, টুকরো-টাকরা জিনিস ও অসমাপ্ত দ্রব্যাদি দেখা যায়। টেবিলের ওপর ছড়ানো আছে হাড়ের চাকতি। তার কতকগুলো বেশ পালিশ, মাঝখানে ফুটো — মালা তৈরির জন্য রাখা হয়েছে। বাকি চাকতিগুলির কাজ সবটা শেষ হয় নি। লম্বা একটা হাড়ে খাঁজ কাটার কাজ সমাধা হয়ে গিয়েছে কিন্তু চাকতিগুলি আলাদা আলাদা করে কাটা হয় নি। কিসে যেন তাদের কাজে বাধা পড়ে। তারা বাসা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। স্পষ্টতই সে বড় সাংঘাতিক বিপদ; তা না হলে তারা ঐ সব কারুকার্য করা বল্লমের ফলক, হাড়ের ছুঁচ, কাটার যন্ত্রপাতি — সব অমন করে ফেলে রেখে যেত না।

এসব জিনিস তৈরি করা বড় সহজ কথা নয়। এসবের প্রত্যেকটিতেই বহু ঘণ্টার কাজ লেগেছে। মানুষের ইতিহাসের প্রথম ওই হাড়ের ছুঁচটার কথাই ধর না। এটাকে দেখতে সামান্যই মনে হয় — কিন্তু এটা তৈরি করতে নিপুণতম শ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। একটি বসতিতে সাজসরঞ্জাম, কাঁচা মাল আর আংশিক তৈরি দ্রব্যাদি সমেত একটা গোটা ছুঁচ তৈরির কারখানাই পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি জিনিসই ঠিক তেমনি আছে। হাড়ের ছুঁচের চাহিদা হলে এখনই সেখানে কাজ শুরু করে দিতে পার। তবে ওসব কাজ বুঝে নেবার মতো কারিগর এখন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

এম্নি করে তারা ছুঁচ তৈরি করত: কাটবার যন্ত্র দিয়ে তারা খরগোশের একটা ছোট সরু হাড় কেটে নিত। খাঁজকাটা চ্যাপ্টা পাথর দিয়ে তখন এক-একটা মাথা

ছুঁচলো করত। তারপরে ছুঁচলো পাথর দিয়ে এর অন্য দিকটাতে ফুটো করত; সকলের শেষে একটা পাথরের টালিতে ঘষে ঘষে তারা ছুঁচটাকে পালিশ করে নিত।
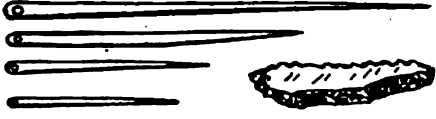
তাহলে দেখ কত যন্ত্রপাতি আর কেমন খাটুনি লাগত একটা মাত্র ছুঁচ তৈরি করতে!

হাড়ের তৈরি ছুঁচ এবং ছুঁচ ধার দেওয়ার ফলক।

ছুঁচ বানাবার মতো যোগ্যতা যে-কোন দলের শ্রমিকের থাকত না বলে হাড়ের ছুঁচ তাদের কাছে এক অমূল্য সম্পত্তি বলে মনে হত।

আদিবাসীদের কোন এক আস্তানায় একবার উঁকি মেরে দেখা যাক।

বরফে ঢাকা ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে কয়েকটি ঢিবি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যাচ্ছে। তারই একটার কাছে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের ফুটো দিয়ে কুটিরে ঢুকলাম। ধোঁয়ায় চোখ যতই জ্বালা করুক না কেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলে চলবে না।

ভেবে নিচ্ছি যে আমরা অদৃশ্য টুপি পরেছি যাতে কেউ আমাদের দেখতে না পায়। পরিখার ভেতরে যেমন অন্ধকার তেমনি ধোঁয়াটে আর হৈ-হল্লায় ভরা। অন্ততপক্ষে দশজন পূর্ণ বয়স্ক আর তার চেয়েও বেশি আছে বাচ্চা-কাচ্চার দল।

ধোঁয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে আমরা লোকজনের চেহারা ভালো করে দেখতে পাব। বনমানুষের কিছুই অবশিষ্ট নেই এসব লোকের মধ্যে। এরা বেশ লম্বা, সুগঠিত আর বলবান। এদের মুখ চওড়া আর চোখদুটো কাছাকাছি বসানো। কালো শরীর সাজিয়েছে এরা লাল রঙের রকমারি চিত্র এঁকে। মেঝেয় বসে মেয়েরা হাড়ের ছুঁচ দিয়ে চামড়ার পোশাক সেলাই করছে। অন্য কিছু খেলনা না পেয়ে ছোটরা ঘোড়ার পায়ের হাড় কিংবা হরিণের শিঙ্ নিয়েই হুটোপুটি করছে। আগুনের পাশে একজন কারিগর পাথরের টালির ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। সে ছোট ছোট কাঠের বর্শার ডগায় হাড়ের ফলা বসাচ্ছে। তার পাশে বসে আর একজন কারিগর একটা চ্যাপ্টা হাড়ের ওপর কি যেন খোদাই করছে।

চল, আরও কাছে গিয়ে দেখি, সে কী খোদাই করছে। কয়েকটা আলতো দাগে সে চ্যাপ্টা হাড়টার ওপরে মাঠে চরে বেড়ানো ঘোড়ার চেহারা আঁকল। অপূর্ব নৈপুণ্য আর অধ্যবসায়ে সে সুন্দর সুন্দর পা আঁকল। কেশরে ভরা টান-করা ঘাড়, আর বিরাট মাথাটা আঁকল। ঘোড়াটাকে জীবন্ত মনে হচ্ছে। এই যেন পা

বাড়াল বলে। তুমি হয়ত ভাববে যে শিল্পী নিশ্চয়ই একটা ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মাথার ভঙ্গি আর পায়ের চলন দেখছে।

ঘোড়ার ছবি আঁকা শেষ হয়েছে, কিন্তু শিল্পী এখানেই থামে না, সে তার কাজ চালিয়ে যায়। ঘোড়াটার ওপরে সে দু-তিনটে তির্যক রেখা টানল। একটা অদ্ভুত ছবি ফুটে উঠছে। কী করছে এই আদিম আচার্য? এযুগের শিল্পীদেরও যে ছবি দেখলে হিংসে হবে, এমন জিনিসটা কেন সে নষ্ট করছে অমন করে?

ছবিটি আরও জটিল হয়ে উঠছে। আমরা পরম আশ্চর্য হয়ে দেখি ঘোড়ার শরীরের উপর ফুটে উঠছে একটা কুঁড়েঘরের খসড়া। এর পাশে আরও দু-তিনটি কুঁড়ে বসিয়ে একটা রীতিমত বসতিই আঁকা হল ওতে।

এই অদ্ভুত ছবির অর্থ কি? এটা কি আকস্মিক, শিল্পীর খেয়াল?

না, আদিম মানুষের গুহায় আমরা এরকম ছবি ভুরিভুরি সংগ্রহ করতে পারি। কোনটাতে ম্যামথের ছবি, তার ওপর দুটো কুটির; কোনটাতে বাইসনের গায়ে তিনটি কুটির। কোথাও-বা দেখবে একটা গোটা দৃশ্য — ছবির মাঝখানে মৃত বাইসনের অর্ধভুক্ত দেহ, শুধু মাথা, মেরুদণ্ড আর পাগুলো বাকি। বাঁকানাক, লোমশ মাথাটা থুবড়ে পড়ে আছে সামনের দু' পায়ের ফাঁকে। ওর দু'পাশে সারি বেঁধে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে।

জীবজন্তু, মানুষ, ঘরবাড়ির এমন অনেক হেঁয়ালিপূর্ণ ছবি, হাড় কি পাথরের টালির উপর, নয়ত পাহাড়ের গায়ে আঁকা আছে। তবে এসবের অধিকাংশই আছে গুহার দেয়ালে দেয়ালে।
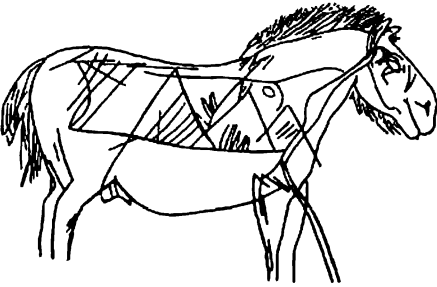
ঘোড়া আঁকার পর শিল্পী তার ওপর কয়েকটা পর্ণকুটির এঁকে দিল।
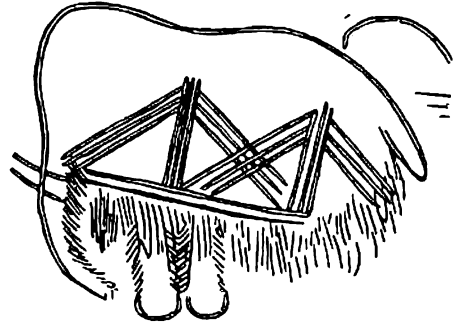
একটা ম্যামথের গায়ের ওপর দুটো পর্ণকুটির আঁকা হয়েছে।
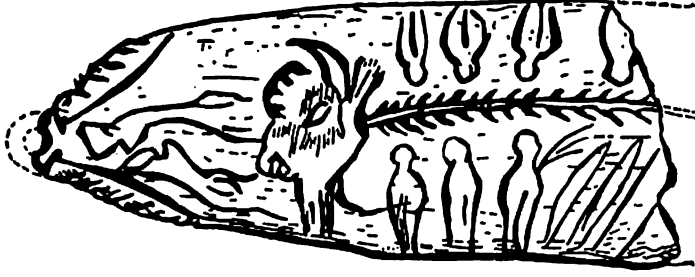
হাড়ের ওপর আঁকা এই ছবির অর্থ কী?

আমরা যখন গুহায় খোঁড়াখুঁড়ি চালাচ্ছিলাম তখন তার দেয়ালে এধরনের কোন আঁকা দেখতে পাই নি। তবে, মনে রেখো আমরা শুধু গুহার মুখটিতেই ঢুকেছিলাম। সে ত হল তাদের ঘুমোনো, খাওয়া-দাওয়া কি কাজের জায়গা মাত্র।

চল গুহার ভেতরে গিয়ে তার চারপাশ অন্ধিসন্ধি ভালো করে পরীক্ষা করি, পাহাড়ের কয়েক ডজন ফিট কি কয়েক শ' ফিট লম্বা ফাটলে খোঁজাখুঁজি করে দেখি ভালো করে।

মাটির নীচে ছবির গ্যালারী

গুহায় অনুসন্ধান করতে যাবার সময় সঙ্গে লণ্ঠন নিতে হবে কিন্তু। এগোবার সময় প্রত্যেকটি বাঁক আর মোড় মনে রাখতে হবে। মাটির নীচের গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

শিলাময় বারান্দা সরু থেকে ক্রমেই আরো সরু হচ্ছে। বাঁকানো ছাত দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। লণ্ঠন উঁচুতে তুলে আমরা দেয়ালগুলো ভালো করে পরীক্ষা করছি।

মাটির নীচের জলস্রোত গুহাকে চকচকে স্ফটিকের রূপ দান করেছে, কিন্তু মানুষের হাতের ছাপ নেই কোথাও।

আমরা এগিয়ে চলেছি। অকস্মাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল ,'এই যে দেখুন!'

লাল আর কালো রঙ্ দিয়ে বাইসন আঁকা আছে দেয়ালে। সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে নীচু হয়ে পড়েছে সে। বাঁকানো পিঠে এসে বিঁধেছে ছোট ছোট বল্লম।

সহস্র সহস্র বৎসর আগের শিল্পীদের কাজের সামনে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা।

একটু এগিয়েই আরও একটা আঁকা দেখতে পেলাম। কী এক অসুর যেন দেয়ালে নাচছে — জানোয়ারের মতো দেখতে মানুষ, নয়ত মানুষের মতো দেখতে জানোয়ার। অসুরের দাড়ি আছে, তার মাথায় লম্বা লম্বা বাঁকানো শিঙ, পিঠে কুঁজ, লেজ লোমশ। হাত আর পাগুলো মানুষের; হাতে তীরধনুক।

ছবিটি খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল ওটা বাইসনের চামড়া জড়ানো একটা মানুষের ছবি।

গুহার দেয়ালের গায়ে আঁকা বাইসন।
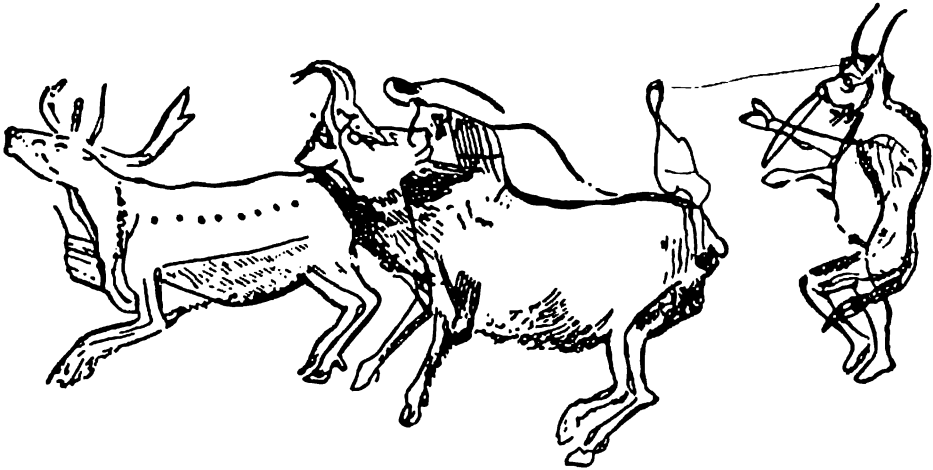
না মানুষ, না জন্তু — কে এই অদ্ভুত ধনুর্ধারী প্রাণীটি?

এই ছবি ছাড়িয়ে আরেকটা, তারপরে তৃতীয়, চতুর্থ...

এ আবার কেমন অদ্ভুত ছবির গ্যালারী?

এখনকার দিনে শিল্পীরা সুন্দর আলোকিত স্টুডিওতে বসে ছবি আঁকে। আমরাও মিউজিয়মে ছবি এমন ভাবে ঝুলিয়ে রাখি যেন তাতে ভালো করে আলো পড়তে পারে।

মানুষের চোখের আড়ালে অন্ধকার কুঠুরীতে ছবির প্রদর্শনী টাঙিয়ে রাখার প্রেরণা আদিম মানুষের কোত্থেকে এলো?

এটা পরিষ্কার যে দেখার জন্য এ ছবি তারা আঁকে নি।

তাহলে আদিম শিল্পী সেগুলো আঁকল কেন? আমাদের কাছে অর্থহীন জানোয়ারের মুখোশ-পরা এসব ছবির মানে কী?

একটি ধাঁধা আর তার উত্তর

'নাচে অংশ গ্রহণ করে কয়েকজন শিকারী। প্রত্যেকের মাথায় থাকে হয় বাইসনের চামড়া মাথা থেকে ছাড়ানো, নয়ত বাইসনের মতো দেখতে শিঙওয়ালা মুখোশ। প্রত্যেক আদিবাসীর হাতে ধরা থাকে ধনুক কিংবা বর্শা। নাচ বাইসন-শিকারের অনুকরণ করে। যখন কেউ পরিশ্রান্ত হয়, সে পড়ে যাবার ভান করে। আরেকজন তখন তাকে ভোঁতা তীর ছুঁড়ে মারে। তারা পা ধরে হিড়হিড় করে তাকে বৃত্তের বাইরে টেনে এনে ছোরা চালানোর ভঙ্গি করে তার শরীরের ওপর। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়; বাইসনের মুখোশ পরে আরেকজন তার জায়গা নেয় বৃত্তের ভেতরে। কখন কখন মুহূর্তের বিশ্রাম না দিয়ে দু-তিন সপ্তাহ ধরে এক নাগাড়ে এই নাচ চলে।'

আদিম শিকার-নৃত্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এটি। কিন্তু কোথায় তিনি দেখতে পেলেন সে নৃত্য?

দৈবাৎ একজন সমসাময়িক পর্যটকের দিনপঞ্জীতে আমরা হুবহু আদিম শিল্পীদের গুহার দেয়ালে আঁকা শিকারীদের নৃত্যের এই বর্ণনা পেয়েছি।

উত্তর আমেরিকার সমভূমিতে পর্যটক এ নাচ দেখেছিলেন। সেখানের স্থানীয় আদিবাসীরা (তাদের রেড ইণ্ডিয়ান বলে) প্রাচীন শিকারের রীতিনীতি আজও বজায় রেখে এসেছে।

এতক্ষণ যে ছবির অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না এবার তার উত্তরের সূত্র খুঁজে

পেয়েছি; কিন্তু সেই উত্তর থেকেই আবার আরেক প্রশ্ন জাগে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলা এ ভুতুড়ে নাচ আবার কেমন রে বাবা!

আমাদের কাছে নাচটা হল কোন আমোদ, নয়ত শিল্পকলা। কিন্তু আমেরিকার আদিবাসীরা যে নিছক আমোদ-প্রমোদ কি শিল্পকলার খাতিরে এমন করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে নাচবে তা কল্পনা করা কঠিন। আর নাচটাও যেন নাচের চেয়ে কোন ধর্মানুষ্ঠানেরই কাছাকাছি মনে হয়।

আমাদের মধ্যে একজন নৃত্যশিক্ষক নৃত্য পরিচালনা করেন। কিন্তু আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে একজন যাদুকর হলেন নৃত্যের পরিচালক। কল্পিত শিকারের অনুকরণে যাদুকর যেদিকে তাঁর শিঙ্গার ধোঁয়া ছড়াবেন সেদিকেই নাচতে নাচতে

নিউ পমেরানিয়ার ভেলাকি নাচ।

যাবে নর্তকরা। একবার এদিকে আর একবার সেদিকে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে যাদুকর নর্তকদের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে পরিচালিত করেন।

যাদুকর যদি নাচ পরিচালনা করেন তার মানেই হল সেটা সাধারণ নৃত্য নয় — কোন যাদু অনুষ্ঠান।

নর্তকরা ঐসব অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা বাইসনকে যাদু করে যাদু বিদ্যার রহস্যজনক শক্তির সাহায্যে তাকে তার ডেরা থেকে ডেকে আনতে চাইছে।

তাহলে এই হল দেয়ালের গায়ে আঁকা নর্তকের ছবির অর্থ। সে শুধু নর্তকই নয়, উপরন্তু যাদু বিদ্যার উৎসব পালনে রত কেউ। আর যে শিল্পী ঐ অন্ধকার গহ্বরে মশালের আলোয় সব আঁকল, সেও শুধু শিল্পীই নয় যাদুকরও বটে।

বন্য জন্তুদের মুখোশ পরিয়ে কিংবা আহত বাইসন রূপে শিকারীদের ছবি এঁকে সে তুকতাক করে শিকারযাত্রাকে মঙ্গলময় করছে।

আর তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নাচে অনেক সাহায্য হবে। আমাদের কাছে এসব আজগুবি আর অর্থহীন মনে হচ্ছে।

আমরা ঘরবাড়ি তৈরি করবার সময় রাজমিস্ত্রী কি ছুতোরের অনুকরণে নাচানাচি করি না। শিকারের আগে আমরা বন্দুক হাতে নিয়ে নাচি না। কিন্তু আমাদের কাছে যা পাগলামি বলে মনে হয় তাই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে গুরুগম্ভীর কাজ।

আমরা একটা ছবির ধাঁধার উত্তর পেয়েছি। আমরা বের করেছি কেন নাচের ছবি আঁকা হয়েছিল গুহার দেয়ালের গায়ে। কিন্তু আমরা ত আরও ছবি দেখেছি, সেগুলোও কম রহস্যময় নয়।

মনে করে দেখ, গুহায় আমরা এক খন্ড চ্যাপ্টা হাড়ের ওপর খুব ধারালো যন্ত্র দিয়ে আঁকা গোটা কাহিনীই দেখেছিলাম। নর্তকদের মাঝখানে একটি মরা বাইসনের দেহ ঘিরে ছিল শিকারীরা। মাথা আর সামনের দুটো পা ছাড়া মরা বাইসনের আর সব খেয়ে ফেলা হয়েছে।

এ ছবির কী মানে?

এবার আর এর অর্থ খুঁজতে আমরা আমেরিকায় যাব না। এবার যাব রাশিয়ার ধু ধু করা উত্তরে।

সাইবেরিয়ায় এখনও কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে শিকারীরা কোন ভালুক মারলে 'ভালুক উৎসব' পালন করে। তারা ভালুকটাকে বাড়ি নিয়ে জাঁকজমক সহকারে সেটাকে বাড়ির সবচেয়ে সম্মানের জায়গায় এনে রাখে। দুই থাবার মাঝে তার মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে মাথার সম্মুখে ময়দার কিংবা বার্চ গাছের ছাল দিয়ে
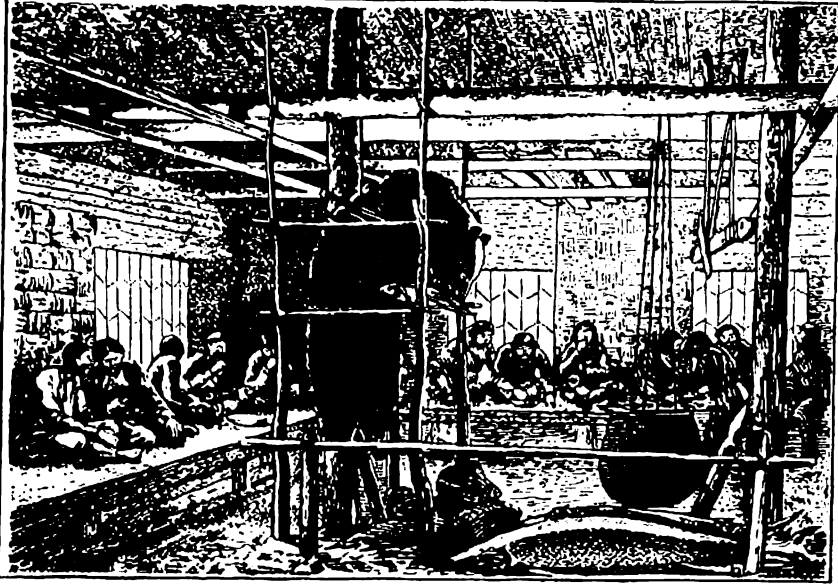
সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরপ্রাচ্যের গিলিয়াক জাতিগোষ্ঠীর ‘ভালুক উৎসব’। ভালুকের সামনে নৈবেদ্য হিশেবে রাখা হয় কিছু মাছ।

বানানো কয়েকটা হরিণের মূর্তি রেখে দেয়। এসব হল ভালুকের পূজার নৈবেদ্য। ভালুকের মুখ গোল করে কাটা ছোট ছোট বার্চের ছাল দিয়ে সাজিয়ে চোখের ওপর রুপোর মুদ্রা রেখে দেয়। তারপর শিকারীরা তার কাছে এগিয়ে এসে তার মুখে চুমো খায়।

কয়েক দিন, সমস্ত রাত্রি ব্যাপী উৎসবের এ হল সবে আরম্ভ। প্রত্যেক রাতে তারা ভালুকের অবশিষ্টাংশের চারপাশে জমায়েত হয়ে তাকে নত হয়ে প্রণাম করে ভালুকের অনুকরণে থপ থপ করে নাচতে থাকে।

নাচ গান শেষ হয়ে গেলে তারা মহোৎসবে বসে — ভালুকের মাংস খেয়ে ফেলে তখন। তার মাথা আর সামনের দুটো পা ছোঁয় না তারা।

এতক্ষণ বুঝতে পারলাম চ্যাপ্টা হাড়ের ওপর আঁকা ছবির মানে। এ হল ‘বাইসন উৎসব’। বাইসনকে ঘিরে যে-সব লোক আছে তারা তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে

ঐ মাংস দানের জন্য আর প্রার্থনা করছে সে যেন ভবিষ্যতেও তাদের ওপর ঐরকমই দয়া প্রদর্শন করে।

আমরা যদি আবার আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ফিরে যাই, তাহলে তাদের মধ্যেও ঐ একই রকম শিকারের উৎসব দেখতে পাব।

হুইচোলদের ভেতরে শিকারীরা নিহত হরিণের দেহ এমন ভাবে রাখে যেন তার পেছনের পাদুটো পূর্বদিকে মুখ করে থাকে। তার মুখের সামনে একটা বাটিতে সবরকম খাবার সাজিয়ে দেয়। শিকারীরা তখন একে একে তার কাছে গিয়ে মাথা থেকে লেজ অবধি সারা গায়ে হাত বুলিয়ে এভাবে তাকে মারতে দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসে।

এসব করার সময় তারা নিহত জন্তুটাকে বলত, 'শান্তিতে বিশ্রাম কর, দাদা!' যাদুকর হরিণের উদ্দেশে বলেন:

'তুমি তোমার শিং দিয়েছ আমাদের, সেজন্য আমরা দিচ্ছি ধন্যবাদ।'

‘আজব সে দেশ:
বনের দানো ঘুরছে ধারে কছে...’

ছেলেবেলায় আমরা রূপকথার ঘুমন্ত রাজকুমারী, ডাইনী বুড়ি, রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্রের কত গল্পই না পড়েছি! তাতে জীবজন্তু মানুষে রূপান্তরিত হত, আবার মানুষও ইচ্ছে করলেই যে-কোন জীবের রূপ ধারণ করতে পারত।

এসব কাহিনী বিশ্বাস করলে বলতে হয় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বাস করছে আজব জীব — ভালো মন্দ, দৃশ্য অদৃশ্য নানান ধরনের জীব। পাছে দুষ্টু যাদুকর কি শয়তান ডাইনীরা শাপ দেয় এই ভয়ে সবাইকে সদা সন্ত্রস্ত থাকতে হত।

নিজের চোখকেও কারুর বিশ্বাস করার উপায় ছিল না: কুৎসিত কোলা ব্যাঙই হয়ত বা মুহূর্তের মধ্যে পরম রূপবতী রাজকন্য হয়ে দেখা দিতে পারে; কিংবা ভয়ংকর এক সাপ হয়ত দেখা দিতে পারে রূপবান এক রাজকুমারের বেশে। সব কিছু ঘটছে নিজের নিজের খুশিমতো, মরা উঠেছে বেঁচে, কাটা মুণ্ডু গড়্গড়্ করে কথা বলছে, যারা ডুবে গেছে জলের অতলে তারা জেলেদের লোভ দেখিয়ে জলে নামাচ্ছে।

পুশ্‌কিনের কাব্যে এই কথা আছে:

> আজব সে দেশ: বনের দানো ঘুরছে ধারে কাছে,
> মীনকুমারী গাছের ডালে দেখবে বসে আছে...*

রূপকথা পড়বার সময় আমরা প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলি সেগুলো। কিন্তু যেই না বইটা বন্ধ করলাম অমনি সবাই ফিরে এলাম এই বাস্তব জগতে — যেখানে না আছে কোন যাদুকর না ডাইনী, যেখানে সব কিছু চলছে তার প্রাকৃতিক নিয়মে। রূপকথা যত মজারই হোক না কেন আমরা কেউ তেমন রাজ্যে বাস করতে চাইব

---

* রুশদেশের মহাকবি আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের ‘রুস্‌লান ও ল্যুদমিলা’ কাব্য থেকে।

ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ভালো শিকার পাঠানোর জন্য তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে (সপ্তদশ শতাব্দীর খোদাইকাজ)।

না যেখানে যুক্তিতর্ক অচল, যেখানে তুকতাক, মন্তর-তন্তরের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই।

আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে কিন্তু জগৎটা এমনিই মনে হত। তারা বাস্তব আর কল্পলোকের কোন পার্থক্য করতে পারত না। তারা ভাবত এ জগতে বিশ্বনিয়ন্তা কোন অদৃশ্য শক্তির খেয়াল খুশিমতো ঘটছে সব কিছু।

আমরা কোন ইট পাথরে ঠোক্কর খেলে নিজেদের অসাবধানতারই দোষ দিই। আদিম মানুষরা কিন্তু নিজেদের দোষ দিত না, তারা দোষ দিত কোন কুগ্রহের, যে তার পথে ঐ পাথর রেখে দিয়েছিল।

কেউ ছোরার আঘাতে মরে গেলে আমরা বলি: ছোরা খেয়ে মরেছে। কিন্তু সে

যুগের মানুষ অন্য কথা বলে: যে ছোরার ঘা সে খেয়েছে তার মধ্যে যাদু ছিল বলেই সে মরেছে।

অবশ্য এখনও অনেক লোক আছে যারা মনে করে অমুকের 'নজর' লেগে অসুখ করেছে, কিংবা শনিবারে কোন কাজে হাত দিতে নেই, কিংবা পথ চলার সময় কোন খরগোসকে যদি রাস্তা পার হতে দেখা যায়, তাহলে কপালে দুর্ভোগ আছে বলতে হবে।

আমরা এসব লোকের কথায় হাসি। আজকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে তা ক্ষমার অযোগ্য, কারণ যেখানে জ্ঞান নেই সেখানেই অজ্ঞের শক্তির ওপর বিশ্বাসের জন্ম।

কিন্তু আমরা যেন পূর্বপুরুষদের ভূতপ্রেতে বিশ্বাসের জন্য দোষ না দিই। তারা সত্যি সত্যি চারপাশের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করত — তবে তাদের জ্ঞানই ছিল এত কম যে সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারত না।

সভ্যতার গন্ডীর বাইরে এখনও তাদের মতো কিছু কিছু গোষ্ঠী' আছে। ঐ সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রস্তরযুগের মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আজও বজায় থাকবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

'যাদুকাঠি'। শিকারী এস্কিমোদের রক্ষাকবচ।

এখানে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একজন ফরাসী পর্যটকের বর্ণিত একটি কাহিনী দিলাম: 'আফ্রিকার লোয়াঙ্গো অঞ্চলের সমুদ্রের তীরের লোকজন কোন নতুন ধরনের পাল-খাটানো নৌকা দেখলে কিংবা একটু ভিন্ন ধরনের ধোঁয়া-ওড়ানো জাহাজ দেখলেই ছুটে ভীড় জমাত। বর্ষাতি, নতুন ধরনের টুপি, দোল খাবার চেয়ার, নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি দেখলেই আদিবাসীদের ভীষণ সন্দেহ জাগত।'

অর্থাৎ প্রত্যেকটি অসাধারণ জিনিসই আদিবাসীদের তুকতাকের যন্ত্র বলে মনে হত।

অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানতে পেরেছে যে পৃথিবীর সব জিনিসই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু সম্পর্কটা যে আসলে কী তা না জানার ফলে তারা আগের মতোই এক ধরনের জিনিসের ওপর আরেক ধরনের জিনিসের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে বিশ্বাস করতে লাগল।

তারা ভাবে, কুগ্রহের হাত থেকে বাঁচতে হলে মানুষের তাবিজ-কবচ, কুমীরের দাঁতের মালা, হাতীর লেজের চুলে গাঁথা বালা পরতে হয়। যে পরে তার কাছ থেকে যত অমঙ্গল দূর করে দেয় ঐ সব তাবিজ-কবচ।

আদিম অধিবাসীরা লোয়াঙ্গোর এই অধিবাসীদের চেয়ে বেশি কিছু জানত না। আর স্পষ্টতই তারা তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করত। খননের ফলে পাওয়া তাবিজ-কবচ আর ঐ যাদু-চিত্র থেকে একথা প্রমাণিত হয়।

পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা

জগতের আইন-কানুন না জেনে সেখানে বসবাস করা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অদৃশ্য শক্তির সামনে নিজেকে দুর্বল ও অসহায় মনে হয়। যে-কোন জিনিসই তার মতে কবচ, যে-কোন লোকই তার কাছে যাদুকর হয়ে উঠতে পারে। মৃতলোকদের প্রতিশোধলিপ্সু আত্মা জীবিতদের ঘাড় মটকাবার জন্য সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন। শিকারে নিহত যে-কোন জন্তুই বুঝি মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বেঁচে উঠতে পারে। তাই বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা এই সব ভূতপ্রেতদের কাছে ভিক্ষে চায় — আবেদন জানায় স্তবস্তুতি করে সন্তুষ্ট করার আশায় — এদের কাছে প্রার্থনা জানায় — এদের অর্ঘ দেয়।

অজ্ঞানতা থেকেই ভয়ের জন্ম।

মানুষ অজ্ঞান ছিল বলেই পৃথিবীর প্রভুর মতো আচরণ করার বদলে ভীত, দুর্ভাগা উপযাচকের মতো আচরণ সে করত।

সত্যি কথা বলতে কি তার পক্ষে নিজেকে প্রকৃতির প্রভু বলে ভাববার সময়ই আসে নি। জগতের অন্য সব প্রাণীর তুলনায় সে বলশালী হয়েছিল, সে ম্যামথ-

বিজয়ী, কিন্তু প্রকৃতিকে পরিচালিত করার সাধ্য তার ছিল না, প্রকৃতির অপরিমেয় ক্ষমতার তুলনায় সে তখনও ছিল নিতান্তই দুর্বল এক জীব।

শিকারে একবার অসফল হলে ত সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তাদের উপবাসে থাকতে হত। একটা তুষার ঝঞ্ঝাই তাদের শিকারের শিবিরকে বরফ চাপা দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

মানুষ কিসে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি পেল আর ধীরে ধীরে একটু একটু করে বিজয় লাভে সমর্থ হল?

তার এই শক্তির মূলে ছিল একটি ঘটনা — তা এই যে সে একা ছিল না।

একটি দলে মিলিত হয়ে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করত। তারা একটি দল হিসেবে কাজ করত এবং মিলেমিশে কাজ করতে করতেই তারা অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান অর্জন করত, সঞ্চয় করত।

সত্যি বটে, তারা জানত না যে তারা নিজেরা এত সব করছে কিংবা জানলেও সে জানা ছিল তাদের নিজেদের ধ্যানধারণা অনুযায়ী।

মানুষের সমাজ বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। তবে তারা অনুভব করত যে তারা সবাই একজোট এবং সমস্ত লোকজন সহ গোটা গোষ্ঠীটা হল বহু হাত-পা বিশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড মানুষের মতো।

কিসের বন্ধন তাদের বেঁধে রাখত একত্রে? সে বন্ধন ছিল জ্ঞাতিত্বের বন্ধন। তারা তখন বাস করত গোষ্ঠী হিসেবে। বাচ্চা-কাচ্চারা থাকত তাদের মায়ের সঙ্গে আর পর্যায়ক্রমে তাদের বাচ্চারা নিজেদের ভাইবোন, খুড়ো পিসী, মা দিদিমাদের নিয়ে একসঙ্গে বাস করত।

এই হল কুলের সৃষ্টি কথা।

আদিম শিকারী মানবের সমাজ ছিল সেই একই পূর্বপুরুষানুক্রমিক ধারায় গড়ে ওঠা কুল। মানুষ পুরুষানুক্রমে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কভুক্ত ছিল। পূর্বপুরুষরাই তাদের শেখাত শিকার করতে, যন্ত্রপাতি বানাতে। তাদের পূর্বপুরুষরাই তাদের দিত বাসস্থান ও আগুন।

কাজ আর শিকার করা অর্থই হল পূর্বপুরুষের আজ্ঞা পালন করা। পূর্বপুরুষের আজ্ঞা পালন করলে সকলেই অমঙ্গল ও বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে। পূর্বপুরুষরা তাদের বংশধরদের নিয়ে বাস করত। অদৃশ্য হলেও তারা শিকার ও গার্হস্থ্য জীবনে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। তারা সমস্ত কিছু জানে আর সব কিছুই দেখতে পায়। তারা দুর্জনকে শাস্তি আর সুজনকে পুরস্কার দেয়।

আদিম মানুষের কাছে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সমবেত কর্ম-প্রচেষ্টার অর্থ হল এক ও অভিন্ন পূর্বপুরুষের আজ্ঞাপালন।

আর আদিম মানুষের কাজের ধারণাও আমাদের মতো এক ছিল না। আমাদের মতে শিকারের ফলেই বাইসনশিকারীর খাবার জোটে। আদিম শিকারী ভাবত বাইসনটিই তাকে খেতে দিচ্ছে। আজও আমরা যখন গোরুকে স্তন্যদায়িনী এবং ধরণীকে জননী বলি অতীতের সেই অভ্যাসেরই কতকটা পুনরাবৃত্তি করি। আমরা গোরুর বিনা অনুমতিতে তার দুধ কেড়ে নিই, অথচ বলি গোরু আমাদের দুধ 'দিচ্ছে'।

আদিম শিকারীদের কাছে বাইসন, ম্যামথ, কি ভালুক প্রভৃতি বন্য জীবজন্তু ছিল আহারদাতা। তাদের মতে শিকারী পশু-শিকার করত না, বরঞ্চ পশুই উল্টে শিকারীকে তার মাংস আর চামড়া দান করত। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাস তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জন্তুকে মারতে পারে না। যদি কোন বাইসন নিহত হয় সে শুধু তাদের কাছে নিজেকে বলি দিয়েছিল বলেই, স্বেচ্ছায় মরতে চেয়েছিল বলেই।

বাইসন হল গোষ্ঠীটির রক্ষাকর্তা ও উপকারক। আবার গোষ্ঠীর সকলের পূর্বপুরুষ — তিনিও গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং পৃথিবী সম্বন্ধে তখনো অস্পষ্ট ধারণাবিশিষ্ট মানুষের মনে রক্ষাকর্তা পূর্বপুরুষ এবং আহারদাতা জীব — এই দুটি ধারণা মিশে একাকার হয়ে গেল।

শিকারীরা বলে 'আমরা বাইসনের সন্তান'। আর তারা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে তাদের পূর্বপুরুষ হল বাইসন। আদিম শিল্পী বাইসন এঁকে তার উপর যখন তিনটে কুঁড়েঘর বসিয়ে দেয় তখন তার মানে হল 'বাইসনের সন্তানদের বসতি'।

মানুষ তার শ্রম সম্পর্কে বন্য জীবজন্তুদের সঙ্গে বাঁধা ছিল। এবং জন্ম ও আত্মীয়তা ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কই মানুষ কল্পনা করতে পারত না। কোন বন্যজন্তু মারলেই সে তাকে 'বড় ভাই' বলে সম্বোধন করে তার ক্ষমা প্রার্থনা করত।
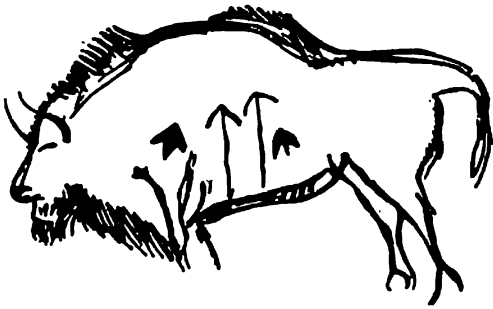
হারপুনে গাঁথা বাইসন — গুহার ভেতর একটি মন্ত্রপূত ছবি।
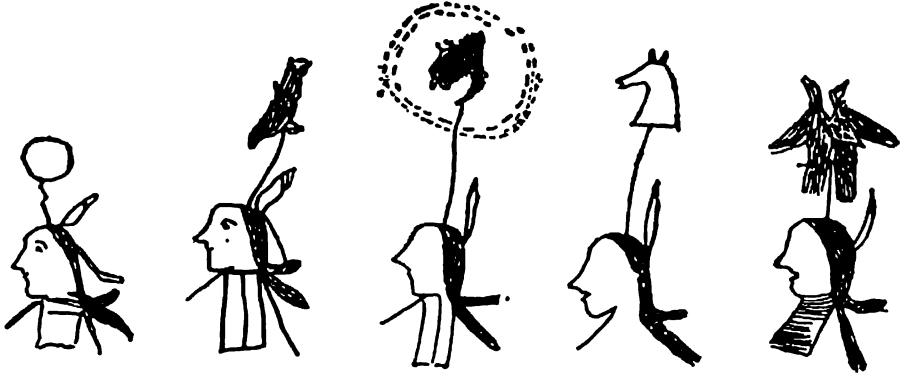
এই রেড ইন্ডিয়ানদের প্রত্যেকের মাথার ওপর যার যার গোষ্ঠীর টোটেম আঁকা আছে।

সে তার ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের মধ্যে, নাচের সময় দেখতে ঐ জন্তুটির মতো — নিজের ভাইয়ের মতো হবার চেষ্টা করত। সে জন্তুটির চামড়া গায়ে দিয়ে তার চলনের ভঙ্গি অনুকরণ করত।

মানুষ তখনও নিজেকে 'আমি' বলতে শেখে নি। সে নিজেকে কুলেরই একটি অংশ — একটি অঙ্গ হিসেবে মনে করত। প্রত্যেক কুলেরই একটি নাম, টোটেম ছিল। সব সময়েই কুলের উপকারক, রক্ষাকর্তা জীবের নামানুসারেই সে নাম রাখা হত। কোনটার নাম হয়ত 'বাইসন', কোনটার 'ভালুক', কোনটার বা 'হরিণ'। কোন কুলের রীতিনীতিকে টোটেমের আদেশ বলে মনে করা হত; এই টোটেমের আদেশই ছিল তাদের কাছে অলঙ্ঘনীয় আইন।

পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা

চল আবার আমরা আদিম মানুষের গুহায় ফিরে যাই। সেখানে আগুনের ধারে আদিম মানুষের পাশে বসে তার আচার-ব্যবহার ধ্যান-ধারণা নিয়ে আলাপ করি। সে নিজেই বলুক আমাদের আন্দাজ ঠিক কিনা; দেয়ালের গায়ে, হাড় আর শিঙের তৈরি তাবিজ-কবচের উপরে যে ছবি সে রেখে গিয়েছে তা আমরা ঠিক ঠিক বুঝেছি কিনা।

কিন্তু গুহার কর্তাকে কথা বলাব কেমন করে?

বহু আগে হাওয়া এসে তার উনুনের ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে চারিদিকে। যারা আগুনের ধারে বসে কাজ করত, চকমকি পাথরের আর শিঙার যন্ত্রপাতি বানাত, চামড়ার পোশাক সেলাই করত, বহু আগে তাদের হাড়গোড় পচে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ হলদে হয়ে যাওয়া শুকনো মাথার খুলি কুড়িয়ে পাই মাটির মধ্যে।

এই করোটিকে কথা বলানোর জন্য কী করব আমরা?

গুহা খনন করার সময় আমরা টুকরো টুকরো ভাঙাচোরা হাতিয়ার পেয়েছিলাম, তা থেকেই ধরে নিয়েছিলাম এগুলো কেমন ছিল আর তা দিয়ে কী কাজ হত মানুষের।

কিন্তু এবার তাদের ভাষার অবশিষ্ট টুকরো টুকরো অংশ পাব কোথায়?

আজকাল যে প্রচলিত ভাষায় কথা বলা হয় তার মধ্যেই খুঁজতে হবে সেকালের ভাষার জের।

এসব খননের জন্য খন্তার দরকার নেই; আমাদের মাটি খুঁড়তে হবে না — হাতড়াতে হবে অভিধান। প্রত্যেক শব্দকোষে, প্রত্যেক ভাষার মধ্যে সঞ্চিত আছে অতীতের মূল্যবান অবশেষ। এর অন্যথা হতে পারে না। কারণ ভাষার মাধ্যমেই লক্ষ পুরুষের ধারা নেমে এসেছে আমাদের মধ্যে।

কোন ভাষার অনুশীলন, তা নিয়ে গবেষণা করা খুব সহজ মনে হয়; মনে হয় টেবিলে বসে অভিধান ঘাঁটলেই বুঝি সব চুকে গেল।

কিন্তু ওভাবে তা হয় না।

প্রাচীন শব্দের খোঁজে গবেষকদের পৃথিবীময় ঘুরতে হয়, পাহাড়ে উঠতে হয়, পাড়ি জমাতে হয় মহাসাগরে। কখন পাহাড়ের দেয়ালে ঘেরা ছোট্ট একটি উপজাতির মধ্যে হয়ত খুঁজে পেল অন্য ভাষার হারিয়ে যাওয়া সব প্রাচীন শব্দ।

প্রত্যেকটি ভাষাই হল মানব জাতির পথের পাশের এক একটি নিশানার মতো। অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা আর আমেরিকার শিকারী গোষ্ঠীগুলোর ভাষা হল এমন সব নিশানা যা আমরা বহুকাল হল পেরিয়ে এসেছি। সেজন্য গবেষকরা সাগর পেরিয়ে পলিনেশীয়ার অন্য কোথাও চলে যায় সেই সব ভুলে যাওয়া প্রাচীন অর্থ ও ভাষার সন্ধানে।

শব্দের খোঁজে গবেষকরা দক্ষিণের মরুভূমি আর উত্তরের তুন্দ্রা, দু'দিকেই ছোটেন।

সুদূর উত্তরের উপজাতিগুলির মধ্যে এমন অনেক ভাষা আছে যা চলে আসছে

সেই মান্ধাতার আমল থেকে যখন লোকজন 'আমার অস্ত্র', 'আমার বাড়ি' বলতে কী বোঝায় তা জানত না।

ঠিক যেমন করে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ঘরবাড়ির আর যন্ত্রপাতির অবশেষ খুঁজতে মাটি খোঁড়েন এমনি করে এই সব ভাষার মধ্যেই ডুব দিয়ে আমাদের অতীতে ভাষার অবশেষ খুঁজতে হবে।

অবশ্য সকলেই ভাষার প্রত্নতত্ত্ববিদ হতে পারে না। দীর্ঘকাল প্রস্তুতি ছাড়া, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া তুমি এগোতেই পারবে না কোথাও। কারণ মিউজিয়মে রাখা জিনিসের মতো প্রাচীন শব্দাদি কোন ভাষাতেই সঞ্চিত থাকে না। কালক্রমে শব্দগুলির বহুবার পরিবর্তন ঘটেছে। তারা এক ভাষা থেকে গেছে অন্য ভাষায়, একটি থেকে জন্ম লাভ করেছে অন্যটি, উপসর্গ প্রত্যয়ের পরিবর্তন ঘটে নিরন্তর। কখন প্রাচীন শব্দের মূল রূপটুকুই পোড়া গাছের শিকড়ের মতো অবশিষ্ট থাকে। এই মূলশব্দ থেকেই তখন বুঝে নিতে হবে শব্দটির উৎপত্তি হল কোত্থেকে।

হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধানে শুধু শব্দের আকৃতিরই পরিবর্তন ঘটে নি তাদের অর্থও বদলেছে। হরদম প্রাচীন শব্দের নতুন অর্থবিন্যাস হয়।

আজও একই অবস্থা আছে। কোন নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হলে আমরা সর্বদা তার নতুন নাম দিই না। আমরা আমাদের শব্দ ভাণ্ডার থেকে কোন প্রাচীন শব্দ নিয়ে লেবেলের মতো সেটার গায়ে সেঁটে দিই।

উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজী 'টাইপরাইটার' শব্দটির কথা ধর। টাইপরাইটারকে আমরা রাইটার বলি, যদিও টাইপরাইটার লেখে না — ছাপায়। বাষ্পীয় হাতুড়ি দেখতে মোটেই হাতুড়ির মতো নয়। হাওয়া খাওয়ার যে পাখা তা আদৌ পাখির পাখা নয়। কোন কোন ভাষায় 'লক্ষ্যভেদী' বলতে 'ধনুর্ধর' ব্যবহৃত হয় অথচ আধুনিক লক্ষ্যভেদীরা তীরের বদলে গুলি ছোঁড়েন। ধনুক থেকে না ছুঁড়ে রাইফেল থেকে ছোঁড়েন সে সব গুলি।

'ম্যানাস্ক্রিপ্ট্' (পাণ্ডুলিপি) কথাটির অর্থ 'হাতে লেখা' হলেও আজকাল প্রায়ই তা যন্ত্রে লেখা হয়ে থাকে। আবিষ্কারের প্রথম যুগে যন্ত্রটিকে লেখার কলই বলা হত যদিও তাতে লেখার কাজ না হয়ে হত ছাপার কাজ।

আমরা এই ভাবে বহু শব্দকে নতুন অর্থে ব্যবহার করি। এ সমস্তই ঘটেছে সম্প্রতি — আমাদের ভাষার ইতিবৃত্তের একেবারে আধুনিক অধ্যায়ে। সেজন্য ঐসব শব্দের পুরানো অর্থ বের করা আমাদের পক্ষে সহজ। যতই গভীরে যাবে ততই কঠিন হবে ব্যাপারটি। কোন শব্দের হারিয়ে যাওয়া অর্থ বের করতে হলে মস্তবড় ভাষাতত্ত্ববিদ হওয়া দরকার।

এমন অনেক ভাষা আছে যাতে 'সিংহ' বলতে বোঝায় 'বড় কুকুর' ও শেয়াল মানে 'ছোট কুকুর'। তার কারণ কুকুর শব্দটির উদ্ভব সিংহ ও শেয়ালের আগে হয়েছিল।

প্রাচীন ভাষার ভগ্নাবশেষ

ভাষার অতলে অনুসন্ধান করে গবেষকরা প্রাচীন যুগের কথ্য ভাষার অবশেষ আবিষ্কার করেছেন। সোভিয়েত আকাদমিশিয়ান মেশ্চানিনোভ তাঁর একটা বইয়ে লিখেছেন যে উকাগিরদের ভাষায় একটি শব্দ আছে যার আক্ষরিক অর্থ হবে — 'মানুষ — হরিণ — বধ'। এত বড় শব্দ উচ্চারণ করাই কঠিন, তা বোঝা ত আরও কঠিন।

কেউ বলতে পারে না কে কাকে মেরেছে: মানুষ হরিণকে না হরিণ মানুষকে, না মানুষ এবং হরিণ কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে মেরেছে, নাকি কোন তৃতীয় ব্যক্তি মানুষ ও হরিণ দু'জনকেই মেরেছে?

উকাগিররা কিন্তু এ কথার অর্থ বোঝে। 'একটি লোক হরিণ মেরেছে' — একথা বলতে গেলেই তারা ওটা ব্যবহার করে।

এমন অদ্ভুত শব্দ তারা বানাল কেমন করে?

মানুষ যখন নিজেকে 'আমি' বলতে শেখে নি তখন এটা ঘটেছে; সে তখনও সচেতন ছিল না যে নিজেই কাজ করছে, শিকারে যাচ্ছে, খুঁজে খুঁজে হরিণ মারছে। সে ভাবত নিজে সে হরিণ মারে নি, মেরেছে তার কুলের সকলে — এমনকি কুলের সকলে বললেও ঠিক হবে না — হয়ত কোন রহস্যময় অদৃশ্য কিছু যা বিশ্বকে পরিচালনা করে। মানুষ তখনও প্রকৃতির সামনে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় মনে করত। প্রকৃতি তার নির্দেশ মানত না।

আজ হয়ত কোন অজ্ঞেয় শক্তির সাহায্যে সহজেই 'মানুষ — হরিণ — বধ' সাধিত হচ্ছে; কাল হয়ত শিকার হবে অলক্ষুণে, তাদের ঘরে ফিরতে হবে শূন্য হাতে। 'মানুষ — হরিণ — বধ' কথাটিতে কোন প্রত্যক্ষ কারক নেই। আর আদিম মানুষ বুঝবে কী করে কে প্রত্যক্ষ কর্তা — সে না হরিণ? সে ভাবত কোন অদৃশ্য উপকারক হরিণটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে মানুষের কাছে — তার এবং হরিণের উভয়েরই পূর্বপুরুষ।

আমাদের এই খননকার্যের সময় আমরা যখন কথ্য ভাষার প্রাচীনতম স্তর
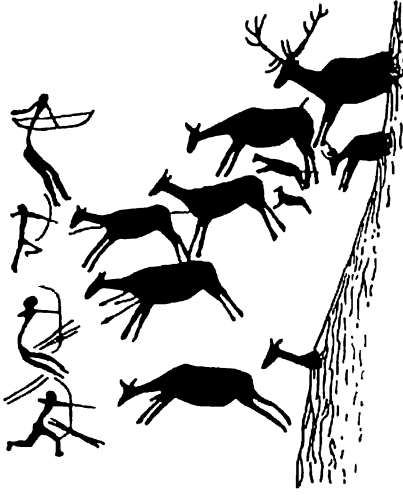
'মানুষ — হরিণ — বধ' (আদিম মানুষের আঁকা ছবি)।

থেকে আরও আধুনিক স্তরে আসি তখন দেখতে পাই যে যুগে মানুষ নিজেকে রহস্যময় শক্তির হাতের কলকাঠি বলে মনে করত সেই যুগের ভাষার অবশেষ রয়েছে।

চুকচিদের ভাষার একটি বাক্য হল: 'মানুষ দ্বারা মাংস দেয় কুকুর।'

আমাদের পক্ষে এ বাক্যের অর্থ অবোধ্য, বহুকাল আগে ভাষার সেই স্তর থেকে আমরা এটা উদ্ধার করেছি যখন মানুষ আজকের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে চিন্তা করত।

'মানুষ কুকুরকে মাংস দিচ্ছে' না বলে তারা বলত: 'মানুষ দ্বারা মাংস দেয় কুকুর।'

কে দিচ্ছে মানুষ দ্বারা মাংস?

সে হল এক অদৃশ্য শক্তি যে মানুষকে কলকাঠির মতো ব্যবহার করে তাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে।

আমেরিকার ডাকোটা অঞ্চলের আদিবাসীরা 'আমি বুনছি'র বদলে বলে 'আমাকে দিয়ে বোনা', যেন মানুষ হল বোনার কাঁটা — সে কাঁটা দিয়ে বুনছে না, তাকে দিয়ে বোনানো হচ্ছে।

ইউরোপীয়দের ভাষাতেও প্রাচীন ভাষার ভগ্নাবশেষ সংরক্ষিত আছে। ফরাসীরা বলে: 'ইল ফে ফ্রুয়া' — মানে 'ঠাণ্ডা পড়েছে'। অথচ এর আক্ষরিক অর্থ হল — 'সে ঠাণ্ডা করছে'। আবার সেই 'সে' — যিনি হলেন বিশ্বনিয়ন্তা।

সেই অজানা রহস্যময় 'ইহা'-র অস্তিত্ব রয়েছে এসব কথার মধ্যেই: ইট ইজ রেনিং — বৃষ্টি পড়ে; ইট ইজ ক্লিয়ারিং — ফর্সা হচ্ছে; ইট ইজ ফ্রীজিং — জমে যাচ্ছে।

আমরা এসব রহস্যময় শক্তিতে বিশ্বাস করি না, তবু পুরাকালে যারা এতে বিশ্বাস করত তাদের ভাষার অবশেষ হিসেবে আমরা এগুলো আমাদের ভাষায় বাঁচিয়ে রেখেছি।

আমরাও যেমন বলি: 'ঘড়িটা খুঁজে পাওয়া গেছে।' যেন আমরা কেউ খুঁজে

পাই নি — ঘড়িটা যেন রহস্যজনক ভাবে পাওয়া গেছে।

রহস্যময় পাখি 'বজ্রবিদ্যুৎ' — তার ঠোঁট থেকে বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটছে (ডাকোটা রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর আঁকা ছবি)।

এমনি করে ভাষার একটির পর একটি স্তর খুঁড়ে আমরা শুধু আদিম মানুষের শব্দই নয় — তাদের চিন্তারও পরিচয় পাই। আদিম মানুষ রহস্যজনক অবোধ্য জগতে বাস করত, সেখানে সে যেকোন কাজ বা শিকার করত তা নয়, সেখানে তাকে ভর করে অন্য কেউ কাজ করত, তাকে ভর করে অন্য কেউ হরিণ শিকার করত। সে ছিল এমন এক জগৎ যেখানে সব কিছু ঘটত এক অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছায়।

কিন্তু সময় বয়ে চলে। মানুষের শক্তি যতই বাড়তে থাকে ততই সে জগৎটাকে বুঝতে পারে, সেখানে তার ভূমিকাও সে বুঝতে পারে। ভাষায় দেখা দিল 'আমি' শব্দ, এলো মানুষ — যে মানুষ কাজ করে, সংগ্রাম করে, নিজের হুকুমের বশ করে সমস্ত কিছুকে আর প্রকৃতিকে।

আমরা এখন আর বলি না: 'হরিণ মারা হল মানুষ দিয়ে' — আমরা বলি: 'মানুষ হরিণ মেরেছে।' তথাপি আমাদের ভাষায় ইতস্তত অতীতের ছায়া চোখে

পরমাত্মার সম্মানে যাদু সঙ্কেতে লেখা গীত (কোন এক রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর আঁকা ছবি)।

পড়ে। আমরা এখনও বলি — এটা অলক্ষুণে, ভবিতব্য কিংবা সে বাধ্য।

কে নিরূপণ করে ভাগ্য, কে করল এটাকে ভবিতব্য — আর বাধ্যই বা করল কে তাকে? — নিয়তি? ভাগ্যলিপি?

এই নিয়তি, ভাগ্যলিপি সেই রকমই এক 'অদৃশ্য' জিনিস যা আদিম মানুষকে এত আতঙ্কিত করত। নিয়তি কথাটি ত এখনও আমাদের ভাষায় প্রচলিত।

আজ ঢের বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কৃষক চাষবাস করে। সে জানে যে ফসল হবে কি হবে না তা নির্ভর করে তারই উপর। তার এমন সব যন্ত্র আছে যা দিয়ে ঊষর ভূমিকে উর্বর করা যায়। এমন বিজ্ঞান আছে যা তাকে গাছপালা জন্মাতে সাহায্য করে।

ঢের বেশি সাহস নিয়ে আজ নাবিক সমুদ্রে বেরোয়। সে গভীর জলের তলায় বালুকণা দেখতে পায়। আগে থাকতেই বুঝতে পারে কখন ঝড় উঠবে।

'ভাগ্যের খেলা', এসব কথাও কদাচিৎ শোনা যায় মাত্র।

অজ্ঞানতা ভয়ের জনক। জ্ঞানই মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, তাকে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, প্রকৃতির প্রভুতে পরিণত করে।

তুষার প্রান্তর সরে পড়ছে

প্রতি বছর বরফ যখন গলতে আরম্ভ করে, আমরা দেখি বনে-জঙ্গলে, মাঠে-ময়দানে, গ্রাম্য রাস্তার পাশে, বাঁধানো রাস্তার পাশের নর্দমায় সর্বত্র দুরন্ত, কলোচ্ছলা স্রোতের ধারা, ছোট ছোট নদী আর জলপ্রপাত। বসন্তে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যেমন ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি করে এই জলধারাও যেন এ'টেল কাদার মতো শক্ত বরফের তলা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। পাথর টপকে, রাস্তাঘাটের বুক চিরে, আনন্দমুখর কলরবে বাতাস ভরিয়ে তারা চলে ছুটে।

আর তখন আলো ঝলমল ঢালু জায়গা, আর খোলা মাঠ ছেড়ে বরফ পালিয়ে আসে খাতে, খানাডোবায়, ছায়ায় ঘেরা বেড়ার পাশে। কখন কখন সেখানে সে মে মাস আসা পর্যন্ত কোনও রকমে টিকে থাকে।

যেদিকেই তাকাও সমস্ত প্রকৃতিই গেছে বদলে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সূর্যের আলোয় নেড়া পাহাড়তলিতে ঘাস গজিয়েছে, গাছের নেড়া ডালে গজিয়েছে পাতা।

প্রতি বছর বসন্তকালে শীতের জমানো বরফের আবরণ গলতে আরম্ভ করলেই এমনি হয়।

তাহলে সেযুগের বরফের যে বিরাট আবরণ পৃথিবীর বৃত্তের মাথায় সাদা টুপিতে ঢেকে দিয়েছিল তা গলতে আরম্ভ করলে কী হল?

তখন আর ছোটখাট নদীনালা নয়, বিরাট প্রশস্ত গভীর নদী বয়ে এলো বরফের নীচ থেকে। এসব নদীর অনেকগুলিই এখনও সমুদ্রে গিয়ে মিশছে — যাত্রাপথে তারা জুটিয়ে নিচ্ছে যত সব ছোট নদী, উপনদী আর নালার জলসম্ভার।

এ হল প্রকৃতির মহাজাগরণ — মহাবসন্তের আবির্ভাব — উত্তরের নেড়া উপত্যকাগুলি তখন সুসজ্জিত হয়ে উঠল অতিকায় অরণ্যে।

কিন্তু বসন্ত হঠাৎ আসে না। মে মাসেও এমন দিন আসে যখন রোদে-পোড়া সারা দিনের শেষে হয়ত হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার রেশ দেখা দেয় কোত্থেকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে হয়ত দেখলে তোমার চারপাশের সব কিছু আবার সাদা হয়ে গেছে, আবার ছাদে জমেছে বরফ — যেন কেউ কোথাও বসন্তের মুখই দেখে নি

কোন দিন। এই বিরাট বসন্তও শীতকে একবারেই জয় করতে পারে নি। তুষার প্রান্তর সরে এসেছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে, যেন নড়বার এতটুকু ইচ্ছে নেই তার, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই জায়গায় থেকে যায়।

কখন কখন এমনও হয়েছে তুষার প্রান্তর একটু সরে এসেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে — যেন শক্তি সঞ্চয় করে আবার আক্রমণে নামল। তার সঙ্গে সঙ্গে এলো তুন্দ্রা কিংবা শীতে আধজমাট প্রান্তর আর তার বিশ্বস্ত সঙ্গী বল্গা হরিণ। মস ও লাইচেন (দু'রকমের শেওলা) উপত্যকাগুলি থেকে ঘাস তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা আসন গেড়ে বসল। বাইসন আর ঘোড়ার চারণভূমি সরে এলো আরও দক্ষিণে।

হিম আর উত্তাপের ভেতর লড়াই বহুদিন চলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তাপেরই হল জয়। গলিত তুষার প্রান্তরের নীচ থেকে গর্জন করতে করতে নদীর দল বেরিয়ে পড়ল। তুষার প্রান্তরের শেষ সীমা সরে গেল একেবারে উত্তরে আর তার সঙ্গে সরল তুন্দ্রার দক্ষিণতম সীমান্ত। যেখানে মস ও লাইচেন গজিয়েছিল, শুধু মাত্র ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল বেঁটেখাটো চিরহরিতের জটলা, সেখানে দেখা দিল দীর্ঘকায় পাইনের বিশাল বনানী।

ক্রমেই আরও গরম হতে লাগল।

ক্রমেই অ্যাসপেন আর বার্চের রোদ-লাগা চূড়া পাইনের ঘনান্ধকার থেকে মাথা তুলতে লাগল।

তাদেরই পেছনেই বিরাট বাহিনীর মতো চওড়া পাতার ওক আর লিণ্ডেন এগিয়ে চলল উত্তরের দিকে।

'পাইন যুগ' চলে গিয়ে 'ওক যুগ' এলো। একটি অরণ্য ভূমির জায়গায় এলো আরেকটি অরণ্য ভূমি। আর প্রত্যেকটি অরণ্য ভূমিরই নিজস্ব বাসিন্দা আছে।

পত্রময় অরণ্য, ঝোপঝাড়, ছত্রাক আর জামের মতো ফলের সঙ্গে সঙ্গে যে-সব জীবজন্তু অরণ্যের ঐ সব খাদ্য ভালবাসে তারাও চলে এলো উত্তরে। বন্য বরাহ এলো, এলো এল্‌ক, বন্য ষাঁড় আর শৃঙ্গীহরিণ। পাটকিলে ভালুক মধুর লোভে সব গাছ তোলপাড় করছিল। ঝরা পাতার ওপর চুপিসাড়ে নেকড়ের দল ছুটছিল শশকের পেছনে। বনের স্রোতস্বিনীর মধ্যে খেঁদা নাকা চ্যাপ্টা পা-ওলা বীভাররা বাঁধ তৈরি করছিল। বিরাট পক্ষীকুলের ডাকে বন সরগরম হয়ে উঠল। বুনো হাঁস আর রাজহাঁসের প্যাঁক প্যাঁক ডাক শোনা যেতে লাগল আরণ্য হ্রদের বুকে।

তুষার বন্দীশালায়

প্রকৃতিতে যখন এত সব পরিবর্তন ঘটছিল মানুষ তার অংশীদার না হয়ে নীরব দর্শক মাত্র হয়ে থাকতে পারে নি। থিয়েটারের দৃশ্যের মতো তার চারপাশের সব কিছু যাচ্ছিল বদলে। তফাত ছিল মাত্র এই যে এখানে হাজার হাজার বছর ধরে এক একটি অঙ্ক চলত আর কোটি কোটি বর্গমাইল ছিল এক একটি মঞ্চের পরিধি।

মানুষ পৃথিবীর দৃশ্যনাট্যের দর্শক মাত্র ছিল না; সে এর অভিনেতাও বটে। প্রতিটি পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও টিকে থাকবার জন্য জীবন যাপন প্রণালী বদলাতে হচ্ছিল।

দক্ষিণাঞ্চলে সরে আসবার সময় তুন্দ্রার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর মতো বল্গা হরিণও চলে এসেছিল। এই অদৃশ্য শৃঙ্খলের এক প্রান্তে ছিল বল্গা হরিণ আর অন্য প্রান্তে মস ও লাইচেন।

মস এবং লাইচেন খেতে খেতে বল্গা হরিণ সেই হিমশীতল, বৃক্ষহীন জমাট সমভূমিতে চরে বেড়াত। তার পেছনে মানুষও চলেছিল এগিয়ে। যে-সব সমভূমি জমে যায় নি সেখানে মানুষ ঘোড়া আর বাইসন শিকার করত। তুন্দ্রা অঞ্চলে তাকে বল্গা হরিণ শিকার করতে হত।

আর তা ছাড়া তুন্দ্রা অঞ্চলে শিকারের ছিলই বা কী?

ম্যামথরা সব লোপ পেয়েছিল। মানুষ তাদের হাজারে হাজারে উৎখাত করেছে; তাদের বসতির চারপাশে জমিয়ে তুলেছিল ম্যামথের হাড়ের পাহাড়। ঘোড়ার বংশও অনেক ধ্বংস করেছে। যারা টিকে ছিল তারা চলে গেল দক্ষিণের দূরাঞ্চলে যেখানে শুকনো শুকনো বুড়ো লাইচেনের বদলে সমভূমিতে প্রচুর ঘাস পাওয়া যেত।

তুন্দ্রা অঞ্চলে মানুষের আহারদাতা বলতে শেষ পর্যন্ত রইল মাত্র হরিণ। মানুষ হরিণের মাংস খেত, তার চামড়ায় পোশাক তৈরি করত, আর বল্লম এবং হারপুন বানাত তার শিঙ্ দিয়ে। সুতরাং মানুষকে হরিণের জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হল।

যেখানেই হরিণ যেত মানুষও ধাওয়া করত সেখানে। মেয়েরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে শিকারী বসতিতে কুটির নির্মাণ করত, কুটিরের ওপরটা চামড়ায় ঢেকে দিত। তারা জানত যে বেশি দিন এক জায়গায় থাকবে না। ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ মশার তাড়নায় হরিণ যখন অন্য চারণভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত তখন মানুষের পক্ষে নিজেদের

তুন্দ্রায় মানুষের একমাত্র অন্নদাতা হয়ে দাঁড়াল হরিণ।

বসতি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কুঁড়ে ভেঙে সেগুলো পিঠে চাপিয়ে মেয়েরা পরিশ্রমে অবসন্ন হয়ে হোঁচট খেতে খেতে তুন্দ্রা পেরিয়ে চলল। পুরুষরা ঝাড়া হাত-পায়ে বল্লম আর হারপুন নিয়ে চলল তাদের পাশে পাশে। ঘরদোর নিয়ে পুরুষকে মাথা ঘামাতে হত না।

অবশেষে বল্গা হরিণ সমেত তুন্দ্রা সরে যেতে লাগল। জলাভূমির স্থানে গহন অপ্রবেশ্য বন ছড়িয়ে পড়তে লাগল উত্তরাঞ্চলে। লোকজনের কী হল তখন?

কতকগুলো শিকারীকুল অজান্তেই বল্গা হরিণের পালের পিছু পিছু উত্তরে সুমেরু অঞ্চলে পাড়ি জমাল। এটাই ছিল তাদের পক্ষে সোজা, কারণ মানুষ উত্তরের আবহাওয়াতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। শীতকাল ছিল কয়েক হাজার বছর ধরে। এই কয়েক হাজার বছরে মানুষ বন্য জন্তুদের কাছ থেকে নিজের জন্য গরম চামড়া ছিনিয়ে নিতে শিখেছিল। বাইরে যতই বেশি ঠাণ্ডা পড়ছে, হাওয়ার ঝাপটা থেকে সুরক্ষিত গর্তের মধ্যে ততই আগুন জ্বলছে গন্‌গন্‌ করে।

যেখানে আগে সে ছিল সেখানে থাকার চেয়ে সুমেরুর দিকে পা বাড়ানো তার পক্ষে সহজ ছিল বটে। কিন্তু সহজ কাজই যেসব সময় সবচেয়ে ভালো হয় তা নয়। মানব জাতির যে অংশ বল্গা হরিণদের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে গেল তাদের অনেক ক্ষতি হল। কারণ অন্তত তুষারযুগ তাদের জীবনে গেল বেড়ে। গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোরা এখনও তুষার প্রান্তরে বসবাস করে আর চিরন্তন সংগ্রামে লিপ্ত আছে কঠোর ও কৃপণ প্রকৃতির সঙ্গে।

যে গোষ্ঠীগুলো আগের জায়গাতেই রয়ে গেল তাদের অদৃষ্ট হল সম্পূর্ণ

ভিন্ন। প্রথম প্রথম চারপাশে মাথাতোলা অরণ্য ভূমিতে তাদের থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। অপরপক্ষে তাদের পূর্বপুরুষরা হাজার বছর যে বরফের খাঁচায় আবদ্ধ ছিল এরা তা থেকে পেল মুক্তি।

জঙ্গলের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম

আগের বরফ-জমাট সমভূমির জায়গায় যে জঙ্গল গড়ে উঠেছিল তা এযুগের জঙ্গল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে-জঙ্গল ছিল গহন অরণ্য — একান্ত অপ্রবেশ্য। হাজার হাজার মাইল জুড়ে নদনদী আর হ্রদের তীর কিংবা সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত ছিল তার বিস্তৃতি।

এই অনভ্যস্ত নতুন জগতে বাস করা মানুষের পক্ষে সহজ কথা ছিল না। জঙ্গল তার দম বন্ধ করে দিত, যেন লোমশ থাবা দিয়ে চেপে ধরত তাকে, এতটুকু জায়গা দিত না মাথা গুঁজবার — সামান্য ফাঁকা জায়গাও ছিল না কোথাও। সব সময়েই তাকে জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করতে হত — কেটে কেটে জায়গা পরিষ্কার করে নিতে হত।

বরফ-জমাট সমভূমিতে কিংবা তৃণপ্রান্তরে বসতি স্থাপনের উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করা ছিল সহজ। চতুর্দিকে ছিল প্রচুর জায়গা। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে তাকে জায়গা করে নিতে হত। সেখানে সবটুকু জমি জুড়েই ছিল বৃক্ষলতা আর ঝোপঝাড়। জঙ্গল যেন শত্রুপক্ষের দুর্গ, এমনি করে তা দখল করতে হত।

আর অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ অসম্ভব। গাছ কাটবার জন্য মানুষের কুড়োল দরকার হল। সুতরাং সে ভারী তিনকোণা পাথরের হাতুড়ি একটা লম্বা কুড়োলের হাতলের সঙ্গে আটকে নিল।

জঙ্গলের গভীর ঝোপঝাড়ে আগে যেখানে কেবল কাঠঠোকরার ঠক্‌ঠকানি শোনা যেত এখন সেখানে প্রতিধ্বনিত হল কুড়োলের প্রথম আওয়াজ। পশুপাখিরা উঠল চমকে।

ধারাল পাথর গাছের কাঠে গভীরভাবে কেটে বসত। ক্ষতস্থান থেকে ঘন রস বেরোত। সড়সড় শব্দে আর্তনাদ করে কাঠুরের পায়ের কাছে ভেঙে পড়ত গাছগুলো।

দিনের পর দিন গভীর অধ্যবসায় আর ধৈর্যের সঙ্গে মানুষ গাছ কেটে নিজেদের জন্য ঐ জঙ্গলের জগতে মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিত। জায়গাটা একবার পরিষ্কার

করে নিলেই তারা গর্ড়িটুঁড়ি আর নীচের ঝোপঝাড়গুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলত। এমনি করে মানুষ জঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে জয় করল। কিন্তু সে পরাজিত শত্রুকে নিঃশ্বাস ফেলার অবসর দিল না। ডালপালা ছেঁটে ফেলে কাটা গাছের ডগা ছুঁচলো করে মানুষ সেটাকে পাথরের ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে মাটিতে পুঁতল। তার পাশেই পুঁতল দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থটি। বেড়া তৈরি করে সেটাকে শাখাপ্রশাখা দিয়ে ঘিরে ফেলল। সেখানে গাছপালার মধ্যে অনেকটা জঙ্গলেরই মতন দেখতে প্রথম কচি শাখার তৈরি ঘর দেখা দিল। ঠিক জঙ্গলের

পাথরের কুড়োলের জন্য কাঠের হাতল; পাথরের কুড়োলে হাতল লাগানোর জন্য গর্ত।

মতোই শাখায় জড়ানো গাছের কান্ড ছিল সেখানে। তবে সেই কান্ডগুলো যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত না — একটা বিশিষ্ট ধারায় সেগুলো সাজানো থাকত — ঠিক যে ধারায় মানুষ তাদের রাখত।

অরণ্য জগতে মানুষের পক্ষে ঠাঁই করে নেওয়া ছিল মুশ্‌কিল। খাদ্য সংগ্রহ করা ছিল আরও কঠিন।

উন্মুক্ত তৃণভূমিতে সে যে-সব পশু শিকার করত তারা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করত। দূর থেকে তাদের দেখা ছিল সহজ। যে-কোন ছোট্ট টিবির চূড়ায় উঠলেই সামনে দেখা যেত দিগন্তবিস্তারী জমির দৃশ্য।

জঙ্গলে ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। জঙ্গল-বাড়িটা ছিল বাসিন্দায় ভর্তি — তবে তাদের দেখা মিলত না। জঙ্গলের প্রত্যেক তলা তাদের কলস্বর, খস্‌খস্‌, কিচিরমিচির আওয়াজে ভরে থাকত। কিন্তু তাদের অনুসরণ করা, কি খুঁজে বার করা ছিল কঠিন।

হয়ত পায়ের কাছেই খস্‌খস্‌ করে উঠল, কী যেন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে

গেল। গাছের ডালপালার পাতার সঙ্গে ঝাপটা লাগল যেন কিসের... বিচিত্র বর্ণের গাছপালার কান্ডের মধ্যে এই সব খসখসানি, গন্ধ, আর বিচিত্র বর্ণকে আলাদা করে চিনবে কী ভাবে আদিম শিকারীরা?

জঙ্গলের প্রত্যেকটি জীব — প্রত্যেকটি পাখিরই আত্মরক্ষামূলক গায়ের রঙ আছে। পাখির পালকগুলো গাছের ছালের মতো। জঙ্গলের আলো-আঁধারিতে পশুর গায়ের লোমের পাটকিলে আবরণ মিশে যেত ঝরা পাতার পাটকিলে রঙে।

জীবজন্তুর অনুসরণ করা ছিল কঠিন; তার খোঁজ পেলেও সে ঘন ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে অদৃশ্য হয়ে পড়বার আগে অব্যর্থ অস্ত্রে একেবারেই তাকে কাবু করা চাই। সুতরাং ছোট ছোট বল্লম ছেড়ে দিয়ে শিকারীকে দ্রুতগামী লক্ষ্যভেদী তীর নিতে হল হাতে।

হাতে ধনুক আর পিঠে ঝোলানো তূণ ভর্তি তীর নিয়ে শিকারী গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে বন্য বরাহের পেছন পেছন ছুটত, জলায় বুনো হাঁস বা বেলেহাঁসকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ত।

মানুষের চারপেয়ে বন্ধু

প্রত্যেক শিকারীর মস্তবড় এক বন্ধু আছে। এই বন্ধুটির চারটে পা, নরম বড় বড় কান, একটা কালো অনুসন্ধিৎসু নাক।

প্রভু শিকারে গেলে বন্ধুটি তার শিকার ধরতে সাহায্য করে। প্রভুর আহারের সময় সে তার পাশে বসে মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় যেন বলছে: 'আমার ভাগ গেল কোথায়?'

এই বিশ্বাসী চতুষ্পদ বন্ধুটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে শিকারীর সেবা করে চলেছে — দু-এক বছর ধরে নয় — হাজার হাজার বছর ধরে। কারণ বহু আগে বন্দুকের গুলির বদলে মানুষ যখন পালক লাগানো তীর দিয়ে শিকার মারত সেই সময়েই মানুষ কুকুরকে পোষ মানিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়েনিসেই নদীর ধারে আফোন্তভা পাহাড়ের ওপর সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাচীন শিকারী বসতিতে এক ধরনের কুকুরের হাড়ের সন্ধান পেয়েছেন। হাড় থেকে বোঝা যায় সে কুকুর দেখতে অনেকটা নেকড়ের মতো ছিল, কেবল তফাত এই যে তার মুখ নেকড়ের মুখের তুলনায় বেশ খাটো।

সম্ভবত সে যুগেও কুকুর মানুষের বাড়িঘর পাহারা দিত, তাকে শিকারে

সাহায্য করত। জঙ্গলের মধ্যে যেখানে এককালে মানুষের বসতি ছিল তার রান্নাঘরের ছাই কিংবা জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে কুকুরের দাঁতের দাগ বসানো বন্য জীব-জন্তুর হাড় রক্ষিত আছে। স্পষ্টতই সে যুগেও কুকুর শিকারীর পাশে বসে হাড় খেত।

কুকুর যদি মানুষের সেবাই না করত, তাহলে কি আর মানুষ কুকুরকে সঙ্গে রাখত, তাকে খাবার দিয়ে পুষত? কুকুর পুষবার সঙ্গে সঙ্গে শিকারী একজন সহায়ক পেল। সে তাকে শিখিয়ে দিল কী করে বন্য শিকার খুঁজতে হয়।

মানুষের এই নির্বাচনে কোন ভুল হয় নি। নিজে কোন বন্য বরাহের সূত্র কিংবা হরিণের পদশব্দ টের পাবার আগেই তার কুকুরটি সজাগ হয়ে মাটি থেকে গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করত।

পাতার ঐ গন্ধটা কী? কী গেল ওখান দিয়ে? দু-তিনবার শূন্যে নাক টেনেই সূত্র বেরিয়ে পড়ল। আশেপাশের কোন কিছু না দেখেশুনেই তার সবচেয়ে দামী ইন্দ্রিয় — ঘ্রাণশক্তির পরিচালনায় সে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জঙ্গল ধরে ছোটে। মানুষের একমাত্র কাজ হল তখন তার অনুসরণ করা।

কুকুরকে পোষ মানিয়ে মানুষের শক্তি গেল আরও বেড়ে। তার নিজের নাকের চেয়ে কুকুরের নাক গন্ধের বিচার করতে পারত ভালো করে; সেই কুকুরের নাক সে কাজে লাগাল।
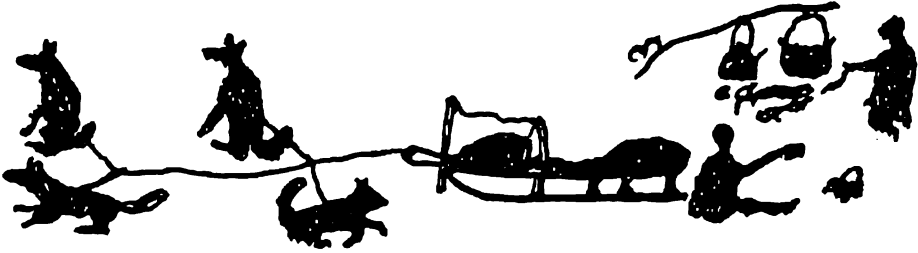
কুকুরের সাজসজ্জা (করিয়াক শিল্পীর আঁকা ছবি)।

শুধু কুকুরের নাকই যে কাজে লাগাল তা নয় — কুকুরের পাও লাগাল কাজে। ঘোড়া পোষ মানানোর বহু আগেই কুকুর মানুষের গাড়ি টানত।

সাইবেরিয়ার এক আদিম শিকারী বসতিতে গাড়িতে কুকুর জোতার সরঞ্জামের

সঙ্গে কুকুরের হাড়গোড় পাওয়া গেছে। তার মানে কুকুর মানুষকে শিকারেই শুধু সাহায্য করত না — শিকারীকে টেনেও নিয়ে যেত।

এমনি করে মানুষের জীবনেতিহাসে আমরা সর্বপ্রথম তার বন্ধু কুকুরের দেখা পাই। পাহাড়পর্বতে যে-সব কুকুর পথিকের প্রাণ বাঁচিয়েছে, যে-সব কুকুর রণাঙ্গণ থেকে আহত সৈন্যকে বয়ে নিয়ে এসেছে, যে-সব কুকুর শুধু বাড়ি পাহারা দিয়েই ক্ষান্ত না হয়ে দেশের সীমান্ত রক্ষা করত, তাদের নিয়ে কত গল্পই না লেখা হয়েছে! কুকুর মানুষকে ঘরে, শিকারে, যুদ্ধে এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে সর্বত্র বিশ্বস্তভাবে সেবা করে।

বিজ্ঞানের স্বার্থে, মানবজাতির কল্যাণের জন্য কোন বিজ্ঞানী যখন কুকুরকে অপারেশন-টেবিলে ওঠান তখন সেই কুকুর বিশ্বাসপ্রবণ দৃষ্টিতে এমনভাবে তাঁর দিকে তাকায় যে দেখলে মনে হয় প্রভুর জন্য জীবন দিতে সে প্রস্তুত।

লেনিনগ্রাদের কাছাকাছি পাভলোভোতে একটা ল্যাবরেটরি আছে যেখানে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করেন। সেই ল্যাবরেটরি-ভবনের সামনে একটা কুকুরের বিরাট মূর্তি আছে। স্মৃতিমূর্তিটি গড়া হয়েছে আমাদের বিশ্বস্ত চতুষ্পদ বন্ধুর সম্মানে।

নদীর সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম

সব মানুষই যে ঘন জঙ্গলে গেল তা নয়। কেউ কেউ বন জঙ্গল ছেড়ে নদী আর হ্রদের তীরে চলে গেল।

সেখানে জল আর জঙ্গলের মাঝের সরু এক ফালি জমিতে মানুষ কাঠের গুঁড়ি কেটে কুঁড়ে বানাল।

নদীর পাড়ে জঙ্গলের তুলনায় ফাঁকা জায়গা বেশি বটে, কিন্তু সেখানে বসবাস করা তেমন সহজ ছিল না। নদী হল চঞ্চল প্রতিবেশী। বসন্তে নদী উপরে উঠে পাড় ভাসিয়ে নিত। তখন বরফের চাঁই আর জলে জমা কাঠের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গড়া কুঁড়েগুলোকেও দিত ভাসিয়ে। অধিবাসীরা বন্যার হাত থেকে বাঁচবার আশায় গাছের ডালে আশ্রয় নিত। সেখানে অপেক্ষা করত দেখবার জন্য কখন নদীর ওই রুদ্ররূপ একটু শান্ত ভাব ধারণ করে। তারপর নদী তার খাতে ফিরে গেলে তারা তীরে এসে আবার নতুন করে ভাঙা ঘর মেরামত করতে বসত।

প্রথম প্রথম প্রত্যেকটা বন্যাই আচমকা এসে তাদের বিপর্যস্ত করে দিত। কিন্তু

নদীকে ভালো করে লক্ষ করে তার উত্থানপতন দেখতে দেখতে অবশেষে তাকে বুদ্ধিতে হারিয়ে দিতে তারা পারল।

তারা কতকগুলো গাছ কেটে এক সঙ্গে বেঁধে নদীর পাড়ে ফেলল। প্রথম গুঁড়ির স্তরের উপরে আড়াআড়ি ভাবে ফেলল আরেকটা সারি। ধীরে ধীরে একটা চওড়া কাঠের পাটাতন তৈরি হল এমন করে। সেখানে, সেই পাটাতনের উপরে তারা কুঁড়ে তুলল। এবার আর বন্যার আতঙ্ক রইল না তাদের। পাড় ছাপিয়ে বন্যার জল ফোঁস ফোঁস করতে করতে এলেও তাদের ঘরদোরের ভিতে জলের ঝাপটা লাগাতে পারত না।

এ এক বিরাট জয় হল মানুষের। নীচু তীরকে উঁচু করাটা নেহাৎ তামাসা নয়। কাঠের গুঁড়ির এই পাটাতন থেকেই নদীকে বশ করবার যত বাঁধ আর পরিখার জন্ম হয়েছে।

নদীর সঙ্গে এই সংগ্রামে মানুষকে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মৎস্যজীবী (চীনদেশের আঁকা ছবি)।

কেন সে সোজাসুজি নদীর ওপরে বাসা বাঁধতে গেল? কিসের প্রলোভন ছিল তার?

যে জেলেরা সারাদিন ধরে নদীর বুকে ধৈর্য ধরে ফাতনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তাদেরই একথা জিজ্ঞেস কর।

নদী তাদের আকৃষ্ট করেছিল, কেননা মাছ ছিল নদীতে।

হরিণ শিঙের হারপুন।

কী করে পশু-শিকারী মানুষ আবার মাছ-ধরা মানুষও হল? মাছ ধরার জন্য তার ত সম্পূর্ণ আলাদা যন্ত্রপাতি চাই। তার কৌশল, পদ্ধতি সবই আলাদা। ঘটনার ধারায় কোথাও কোন শৃঙ্খল ভেঙে গেছে দেখলেই তখনি খুঁজতে হবে সেই হারানো সূত্রটুকু।

পশু-শিকারী রাতারাতি জেলেতে পরিণত হতে পারে না। তার মানে মাছ ধরার আগে তাকে মাছ শিকার করতে হত। সত্যি তাই করতে হয়েছিল মানুষকে। মাছ ধরার প্রথম হাতিয়ার যে কোঁচ ছিল বর্শা থেকে তার তফাত অতি সামান্য। জেলে এক কোমর জল ভেঙে ঘুরত; পাথরের মাঝখানে কোন মাছ লুকিয়ে থাকতে দেখলে তাকে কোঁচ দিয়ে গেঁথে ফেলত। তারপরে সে অন্যভাবেও মাছ ধরতে লাগল। সে এর আগেই জাল দিয়ে পাখি ধরতে শিখেছিল। সেই জাল এবার সে জলে ফেলার চেষ্টা করল।

হারপুন আর কোঁচের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা জালের পাথরের গুলি আর হাড়ের বঁড়শি পেয়েছেন মাটির নীচে।
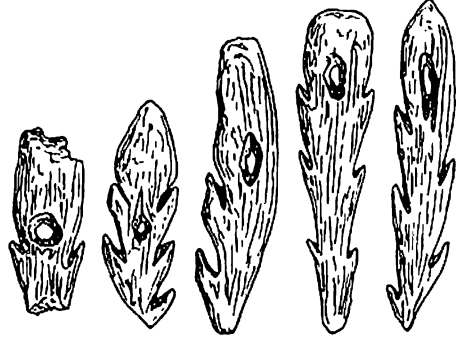
পশু-শিকারী ও মৎস্য-শিকারীদের বাড়ি

আমু-দারিয়া নদী যেখানে আরল সাগরে গিয়ে পড়েছে তার অনতিদূরে কিজিল-কুম মরুভূমির বালির মধ্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানী স. তলস্তোভ ও তাঁর সহকর্মীরা আদিম পশু-শিকারী ও মৎস্য-শিকারী মানুষদের একটি শিবিরের সন্ধান পান।

একটা বালির ঢিবির চূড়ায় বেলেমাটি আর কাদামাটির স্তরের নীচে বিজ্ঞানীরা

সুসম্পন্ন পাথুরে হাতিয়ার, মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরো আর রান্নাঘরের এঁটোকাঁটার জঞ্জাল-স্তূপ আবিষ্কার করেন। এঁটোকাঁটার এই জঞ্জালের মধ্যে বন্য বরাহ আর নানা জাতের হরিণের বহু হাড়গোড় ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এখানে ছিল পাইক আর বোয়াল মাছের কাঁটা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই শিবিরে যে-সমস্ত লোকজন বাস করত মাছ ছিল তাদের প্রধান খাদ্য।

এখানে পোড়া বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। ধ্বংসাবশেষ বলতে যা পাওয়া গেছে তা হল ছাই আর পোড়া কয়লায় ভর্তি কতকগুলো গর্ত, অঙ্গারে পরিণত কিছু নলখাগড়া এবং একটা বৃত্তের কেন্দ্রে ব্যাসার্ধের আকারে মিলিত পোড়া কয়লার কতকগুলো কালো কালো দাগ। এখানে, বাসস্থানের মাঝখানে ছিল পরিষ্কার সাদা ছাইয়ের পুরু স্তর, আর ছাইয়ের নীচে কোন এক সময় গনগনে আগুনে পুড়ে-যাওয়া উজ্জ্বল লাল রঙের বালি। মাঝখানের এই চুল্লীর চারপাশে ছিল আরও কিছু চুল্লী, সেই সঙ্গে নোংরা কালো রঙের ছাই ও রান্নাঘরের যত রাজ্যের ভুক্তাবশেষ।

এর বেশি আর কিছু বিজ্ঞানীরা ঐ শিবিরে পান নি। তাঁদের সামনে এখন কাজ হল জীবনের এই সমস্ত চিহ্নের ভিত্তিতে সেকালের সেই মানুষগুলোর জীবনযাত্রার একটা ছবি গড়ে তোলা, বহুকাল আগে পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির আদি রূপ ও গঠন পুনরুদ্ধার করা।

প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে কারও পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রত্নতত্ত্ববিদরা কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে পোড়া কয়লা ও ছাই সমেত গর্তগুলো যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে এক কালে ঘরের চালার খুঁটি ছিল। অঙ্গারে পরিণত নলখাগড়ার টুকরোগুলো দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে চালা ছিল নলখাগড়ায় ছাওয়া। কাঠকয়লার ঐ রেখাগুলো যে এক জায়গায় এসে মিলেছে সেটাও দৈবাৎ নয় — মাথার ওপর চালের মাঝখানে এক জায়গায় মিলিত আড়াগুলো অগ্নিকাণ্ডের সময় এই ভাবেই একসঙ্গে এসে পড়েছিল মাটিতে।

মাঝখানের ঐ যে চুল্লীটা সেটাতে রান্নাবান্না করা হত না। রান্নাবান্না যদি করাই হত তাহলে সেখানকার ছাই অমন পরিষ্কার আর সাদা হত না। ছাই যে এত পরিমাণে জমেছিল তার কারণ চুল্লীটাতে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী দিনরাত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। একমাত্র অগ্নিকাণ্ডেই নিভতে পারে এই আগুন।

বাড়ির খুঁটিগুলোর মাঝে মাঝে এখানে ওখানে আর যে-সমস্ত চুল্লী দেখা যাচ্ছে সেগুলোতে বাড়ির মেয়েরা খাবারদাবার রান্না করত — সেই কারণেই সেখানে ছাই নোংরা আর চারপাশে হাড়গোড় ও কাঁটা ছড়ানো।

চুল্লী অনেক — তার মানে, কর্ত্রীও ছিল অনেক। বাড়ির এই মহিলারা, তাদের স্বামী ও ছেলেপুলে মিলে জ্ঞাতিসম্পর্কে আবদ্ধ একটি সমানভুক্ত পরিবার হয়ে বসবাস করত।

এই কৌলিক সমাজ খুব একটা ছোট হত না — শ' খানেক লোক, কিংবা তারও বেশি। এই কারণে বাড়িও তৈরি করতে হত এত বিরাট। কিন্তু এই বাড়িটা দেখতে অনেকটা সেই ছুঁচালো চালাওয়ালা গোলাকার কুটিরের মতো, যার থেকে এর উদ্ভব।

প্রবেশপথ থেকে দুসারি থামের মাঝখান দিয়ে আগুন রাখার চুল্লীর দিকে চলে গেছে একটা লম্বা যাতায়াতের পথ। যাতায়াতের পথের ডান দিকে ছিল রান্নার চুল্লী আর বাঁ দিকে — একটা খালি চত্বর।

বাড়ির ভেতরে এই খালি চত্বরটা দিয়ে লোকে কী করত?

এর উত্তর খুঁজতে গেলে চলে যেতে হয় সুদূর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে — সেখানে আদিবাসীদের দলবদ্ধ বসবাসের যে কুটির দেখতে পাওয়া গেছে তাতে এরকম চত্বরের ওপর যাদু-নৃত্য ও নানা আচার-অনুষ্ঠান চলত।

যাতায়াতের পথের বাঁ দিকে দেয়ালের ধারে মৎস্য-শিকারীদের বাড়িটার ভেতরে বিজ্ঞানীরা খুব ছোট ছোট চুল্লীর চিহ্নও দেখতে পেয়েছেন। এখানে সম্ভবত পরিবারের অবিবাহিত লোকজন বাস করত।

এই ভাবে অল্পস্বল্প ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা আদিম মৎস্য-শিকারীদের বাড়ির একটা ছবি মনে মনে কল্পনা করে নিতে পারলেন। কিন্তু এই মৎস্য-শিকারীরা কী ভাবে মাছ ধরত, তাদের শালতি ছিল কিনা প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে সে সবের কিছুই জানা যায় না। আদিম মৎস্য-শিকারীদের শালতি খুঁজে পাওয়া যায় রাশিয়ায় — লাদোগা হ্রদের কাছে।

আমাদের জাহাজের ঠাকুরদা

আজ থেকে বছর ষাটেক আগে লাদোগা হ্রদের কাছেই কয়েকজন শ্রমিক একটা খাল কাটছিল। পচাপাতা জলকাদা আর বালি খুঁড়তে খুঁড়তে তারা একটা মানুষের করোটি আর কিছু পাথরের হাতিয়ার পেল।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা এটা জানতে পারলেন। যে জলায় লোকে ভেবেছিল পচাপাতার জঞ্জাল ছাড়া আর বুঝি কিছু নেই সেখান থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা একে একে বার করতে লাগলেন যত রাজ্যের জিনিস — ঠিক যেন কোন মিউজিয়মের তাক থেকে

টেনে বার করা হচ্ছে — পাথরের কুড়োল, পাথরের ছুরি, মাছ ধরার বঁড়শি, একটা তীরের ফলা, করাতের মতো খাঁজকাটা হারপুন আর হাড় কেটে তৈরি করা সীলমাছের মতো দেখতে একটা কবচ। এই সমস্ত পাথর আর হাড়ের যন্ত্রপাতির পর প্রত্নতত্ত্ববিদরা সাড়ম্বরে পচাপাতা আর জলকাদার ভেতর থেকে টেনে তুললেন আস্ত একটা শালতি। সে শালতিটা এমন চমৎকার অবস্থায় ছিল যে এখনও সম্ভবত জলে ভাসিয়ে তাতে চড়া যায়।

শালতিটা আজকের দিনের আমাদের নৌকোর মতো আদৌ দেখতে নয়। আমাদের সমস্ত নৌকোর, স্টীমার ও ডিজেলচালিত জাহাজের এই ঠাকুরদাটি একটা আস্ত মোটা ওক গাছ খোঁদল করে বানানো হয়েছিল। শালতিটা ভালো করে লক্ষ করলে তুমি যেন নিজের চোখের সামনে দেখতে পাবে কী করে পাথরের কুড়ুল দিয়ে ওক গাছের মাঝখানটা খুঁড়ে খুঁড়ে ওটা বানানো হয়েছে। কুড়ুল যখন কাঠের আঁশ বরাবর কাটছিল তখনও কাজ যেমন-তেমন করে চলছিল। কিন্তু পাছ-গলুই ও আগ-গলুইয়ের জায়গায় কাঠ চিরতে হচ্ছিল আঁশের আড়াআড়ি — আর সেখানেই অবস্থা কঠিন — কাজ ত নয়, রীতিমতো শাস্তি। কাঠটা এদিক ওদিক সমস্ত দিক থেকে কোপানো — যেন পাথরের দাঁত দিয়ে কেউ ওটাকে চিবিয়েছে হিংস্রভাবে। যেখানে যেখানে শাখা আর জট ছিল সে সব জায়গায় আর কুড়োল চালানো সম্ভব হয় নি। গাছের সঙ্গে কুড়োলের এই সংগ্রামে তখন কুড়োলকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে আগুন।

শালতির পেছন দিকটা সম্পূর্ণ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। কয়লার আবরণে জড়িয়ে আছে সেটা।

যে কুড়োল দিয়ে শালতি তৈরি হয়েছিল সেটাও পাওয়া গেল সেই পচাজলার মধ্যে শালতির পাশেই। কুড়োলের ডগাটা মসৃণ ও ধারাল, কাছেই একটা শান দেবার পাথরও ছিল। অর্থাৎ ততদিন তারা আগে-ভাগে শুধু কোপ দিতেই শেখে নি, ধার দিতে আর পালিশ করতেও শিখেছিল।

আদিম মানুষের শালতি — আমাদের জাহাজের পূর্বপুরুষ।

কাঠের হাতলওয়ালা পাথুরে কুড়োল।

ভোঁতা কুড়োল দিয়ে কি আর শক্ত ওক গাছ বাগে আনা সম্ভব হত? ওক কাঠ কেটে শালতি বানানো ছিল দীর্ঘ কালের কঠিন কাজ।

অবশেষে কাজ ফুরালে শালতি জলে ভাসানো হল, লোকজন হারপুন, বঁড়শি, কোঁচ, নানা রকমের বোনা জাল — সব কিছু নিয়ে মাছ ধরার অভিযানে বেরিয়ে পড়ল।

সে ছিল বিরাট হ্রদ আর তাতে প্রচুর মাছ ছিল। তবে তারা তীর থেকে বেশি দূরে যেতে ভরসা পেত না। জল তাদের কাছে অপরীক্ষিত, নতুন ব্যাপার। কী করে তাঁর হালচাল ও মতলব বুঝতে পারবে? এই মুহূর্তে হয়ত সেটা শান্ত ধীরস্থির আছে, আর পর মুহূর্তেই হয়ত তা ফুলে ফেঁপে ফোঁসফোঁসিয়ে বিরাট ঢেউ-এ ভেঙে পড়বে।

ঝড়েও যাকে ওপড়াতে পারে না, সেই বিরাট ওক কাঠ ঢেউ-এর ধাক্কায় ধাক্কায় হাল্কা তক্তার মতো চক্কর খেতে লাগল। ভয়ে ত্রাসে লোকে পাড় ঘেঁসে নৌকো চালায়। শক্ত মাটিতে হাঁটতে তারা অভ্যস্ত। দোলে না, ফুঁসে ওঠে না, বিরাট ঢেউ-এ পরিণত হয় না। শিশু যেমন মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে মানুষও তেমনি করে তার জন্মদাত্রী মাতা ধরিত্রীকে আঁকড়ে রইল।

আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অনিশ্চিত জলের মধ্যে সে বহুদূর যেত না। মাছগুলোরই তীরে আসার অপেক্ষায় থাকত মানুষ।

সতর্কভাবে ক্রমে ক্রমে মানুষ জলকে জয় করতে আরম্ভ করল।

এমন এক সময় ছিল যখন জমির সীমাকেই পৃথিবীর সীমানা মনে করত মানুষ। প্রত্যেকটি পাড়ই যেন ছিল দেয়াল দিয়ে আলাদা করা। তার গায়ে যেন এঁটে দেওয়া হয়েছিল 'প্রবেশ নিষেধ'।

অবশেষে মানুষ সেই অদৃশ্য দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এলো। এই নতুন জলের জগতের ধারে কাছেই সে তখন ঘেঁষে থাকত। তবে যে-কোন কাজে আরম্ভটাই সবচেয়ে কঠিন। একটা যুগ আসছিল যখন মানুষ নিজেকে নদী-তীরের বাঁধন থেকে মুক্ত করে নিতে পারবে। পাতলা শালতিতে করে নয়, সে জাহাজে করে উন্মুক্ত সাগরের বুকে পাল তুলে পাড়ি জমাবে, নিজের সীমানা ছাড়িয়ে তারই মতো নতুন লোকের আবাসে যাবে নতুন আবিষ্কার করতে।

প্রথম কারিগর

তোমরা যারা তরুণ কারিগর, যারা সবেমাত্র কুড়োল, র‍্যাঁদা, হাতুড়ি আর স্ক্রু-ড্রাইভার হাতে নিয়েছ, যারা হলে ভাবী রসায়নবিদ, ধাতুবিদ, লেদ, এরোপ্লেন, ঘরবাড়ি ও জাহাজের ভবিষ্যৎ নির্মাতা, তোমরা যারা নিজের কাজ আর যন্ত্রপাতিকে ভালবাস, তাদের জন্যই এ বই লেখা।

তোমরা জান উপাদানের বিরুদ্ধে হাতিয়ারের সংগ্রাম কী কঠিন। এও জান অসুবিধা জয় করার আনন্দই বা কি!

এক টুকরো কাঠ হাতে নেবার আগেই কী করতে যাচ্ছ তার একটা ছবি তোমাদের মনে থাকে। খুব সোজা মনে হয় এটা। এখানে করাত দিয়ে কাটা, ওখানে একটু গর্ত করা, তারপর কাটছাঁট করা। কিন্তু উপাদানটা বাধ্য নয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার মধ্যে ঢোকানো ছুরির ফলাকে বাধা দেয়।

তুমি একটার পর একটা যন্ত্র নিয়ে চেষ্টা কর। ছুরি অপারগ হলে তুমি কুড়োল নাও। কুড়োলও যখন সে কাজ হাসিল করতে না পারে, তখন করাতের ধারের ডজনের পর ডজন ছোট ছোট ধারাল ছুরি কামড় বসায় সেই কাঠে।

দেখতে দেখতে যে-সব অবান্তর বাড়তি জিনিস তোমার মনের ছবির জিনিসটাকে আড়াল করে রেখেছিল, সব সরে গিয়ে দেখা দিল টুকরো, চাঁচুনি আর করাতের গুঁড়ো।

তোমার জয়লাভ হল, তবে জয় একা তোমার নয়। এ হল সমস্ত কারিগরের জয় — যারা এত যুগযুগান্ত ধরে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করছিল আর নিখুঁত করে গড়ছিল, নতুন নতুন উপাদান খুঁজে নতুন নতুন কাজের ধারা বার করছিল।

এ বইটিতে যারা ছুরি, কুড়োল আর হাতুড়ি তৈরি করেছিল সেই সব আদি কারিগরের সাক্ষাৎ পেয়েছ তোমরা। তোমরা তাদের নিজের নিজের কাজ করতে
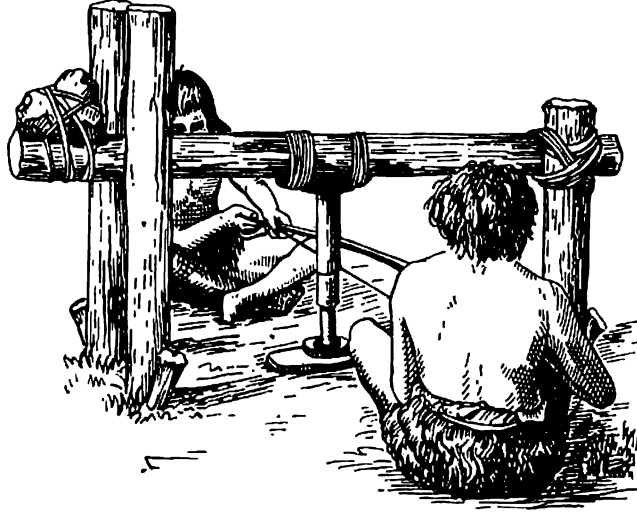
পাথর ফুটো করার একটি আদিম যন্ত্র।

দেখেছ। তোমাদের মতো সে কাজ ছিল যেমন কঠিন তেমনি মজারও বটে।

সেই আদি ছুতোর, পরিখাখনক আর রাজমিস্ত্রিরা বন্য জন্তুর চামড়া পরে থাকত। তাদের হাতিয়ার ছিল স্থূল আর জাবড়া ধরনের। আমাদের পক্ষে মূর্তি তৈরি করা যেমন কঠিন, তার চেয়েও কঠিন ছিল তাদের পক্ষে মাটির হাঁড়িকুড়ি বানানো। তবে এই সব ছুতোর, পরিখাখনক আর কুমোরদের থেকেই এসেছে পৃথিবীর যত স্থপতি, রসায়নবিদ ও ধাতুবিদ — যারা নিজেদের কাজ দিয়ে আজকের জগতের রূপ বদলে দিচ্ছে।

সেই আদিম কুমোরদের কথা ধর। তারাই প্রথমে মাটি থেকে এমন একটা জিনিস গড়ল স্বাভাবিক অবস্থায় আগে কখনও যার অস্তিত্ব ছিল না। এর আগে আদিম কারিগর যখন পাথর থেকে কুড়োল কিংবা হাড় থেকে হারপুন তৈরি করে তখন সে কোন উপাদান সৃষ্টি করত না, সে কেবল উপাদানের আকার পরিবর্তন করত। কিন্তু এখন সে যা করল তা আগে কখনও ঘটে নি। মানুষ মাটি দিয়ে পাত্র তৈরি করে আগুনে পোড়াল। আগুনে পুড়ে মাটির ধর্মই পুরোপুরি পালটে গেল — তাকে এখন আর চেনা যায় না।

আগে মাটি জলে ভিজে গিয়ে গলে কাদার তাল হয়ে যেত। আগুনে পোড়ার পর এখন আর মাটি জলকে ভয় পায় না। মাটির পাত্রে এখন স্বচ্ছন্দে জল ঢালা যায় — এতে তার আকার পালটায় না, এতে মাটি নরম হয় না।

আগুনের সাহায্যে মানুষ মাটিকে নতুন উপাদানে পরিবর্তন করল। এ হল ডবল জয় — প্রথম জয় মাটি আর দ্বিতীয় জয় হল আগুনের ওপর। সত্য বটে মানুষ আগেও আগুন ব্যবহার করেছে — আগুন তাকে উত্তাপ দিত, বন্য জন্তুকে ভয় দেখিয়ে তাড়াত, জঙ্গল পরিষ্কারে তাদের সাহায্য করত আর শালতি বানানোর সময় মানুষের কাজে লাগত। এতদিনে কী' করে আগুন বানাতে হয় তাও মানুষ শিখেছিল, দুটো কাঠের টুকরো ঘষলেই সে উদয় হত নিতান্ত বাধ্যের মতো।

কিন্তু এবার মানুষ আগুনকে দিল এক জটিল কাজ, — এক পদার্থকে অন্য পদার্থে পরিণত করার কাজ। আগুনের ধর্ম জানতে পেরে মানুষ তাকে মাটি পোড়ানো, রান্নাবান্না করা, রুটি সেঁকা, তামা গলানোর কাজে লাগাল।

আগুন আমাদের খনিজ পিণ্ড থেকে লোহা, বালু থেকে কাঁচ এবং কাঠ থেকে কাগজ পেতে সাহায্য করে। কারখানার চুল্লীতে যে আগুন জ্বলে তার দেখাশোনার জন্য রীতিমত বাহিনী রয়েছে রসায়নবিদ ও ধাতুবিদদের। আর ঐ সব চুল্লীই হল সেই পুরানো খোলা উনুনের বংশধর যেখানে আদি কুমোরেরা তাদের প্রথম আনাড়ির মতো পাতলা তলাওয়ালা বাসনপত্র বানাত।

শস্যের দানা একজন সাক্ষী

একটি শিকারী বসতিতে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে কয়েকটি মৃৎপাত্র পেয়েছিলেন।
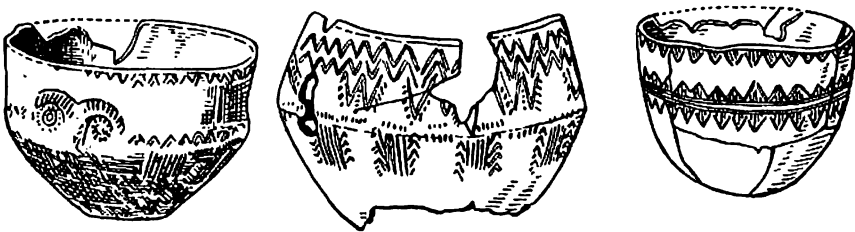
খোলামকুচিগুলোর ওপর নানা রকমের নকশা আঁকা ছিল।

মৃৎপাত্রগুলির গায়ে সহজ নক্‌শা আঁকা ছিল — পরস্পর ছেদ করা কয়েকটি রেখায় খোপ-খোপ কাটা। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন এই নক্‌শা থেকেই সূত্র পাওয়া যায় কী ভাবে তারা হাঁড়িকুড়ি বানিয়ে আগুনে পোড়াত।

কুমোর কলসীর গায়ে প্রচলিত ধারার নক্‌শা আঁকত।

তারা হাতে বোনা ঝুড়ির ভেতরে মাটি লেপে সেটা আগুনে পোড়াত। ঝুড়িটা পুড়ে যেত — পড়ে থাকত মাটির পাত্রটুকু। এতে ডালার কঞ্চির দাগগুলো মৃৎপাত্রের বাইরের দিকে নক্‌শার আকারে বোনার দাগ রেখে যেত।

পরে যখন কুমোররা সাহস করে ঝুড়ির সাহায্য ছাড়াই মাটির পাত্র বানাতে লাগল তখন তার গায়ে ইচ্ছে করে বোনা ঝুড়ির ঐ অভ্যস্ত নক্‌শা কেটে দিত। তাদের ধারণা ছিল পাত্রের গায়ে অমন দাগ না থাকলে ঠাকুমা-দিদিমাদের মতো ভালো রান্না হবে না এতে।

সে যুগের কারিগররা ভাবত প্রত্যেক জিনিসেরই কতকগুলো রহস্যজনক শক্তি ও ধর্ম আছে। কে জানে, মৃৎপাত্রটিরও সমস্ত ক্ষমতা হয়ত নির্ভর করছে তার গায়ে আঁকা নক্‌শার ওপর। নক্‌শা বদলালেই পস্তাতে হবে তোমায়। ওই পাত্রের দরুন তোমার দুর্ভাগ্য, অভাব, অনটন আর উপোস ভোগ করতে হবে।

কুনজর এড়ানোর জন্য কখন কখন কুমোররা কুকুর আঁকত মৃৎপাত্রের গায়ে। কুকুরই ছিল রক্ষক — সেই রক্ষা করুক ঐ পাত্র আর তার জিনিসপত্রকে।

এসব খোপ-খোপ নক্‌শা কাটা মৃৎপাত্র বহু জায়গায় পাওয়া গেছে। তবে ফ্রান্সের অন্তর্গত কাঁপিয়ে শহরের কাছে পাওয়া পাত্রগুলো বিশেষ বিখ্যাত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তার গায়ের নক্‌শা পরীক্ষা করতে গিয়ে কতকগুলো ওটের দানার দাগ দেখতে পেলেন তার গায়ে।

এই আবিষ্কারে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কারণ এটা শুধু একটা ওটের দাগই নয় — এ হল সাক্ষী — এ হল মানুষের জীবনের বহু পরিবর্তনের একটা খুদে সাক্ষী।

যেখানে শস্যের দানা — সেখানেই চাষবাস। আর সত্যি সত্যিই যে বসতিতে তাঁরা ওটের দাগ কাটা মৃৎপাত্র পেয়েছিলেন সেই একই বসতিতে তাঁরা শস্য পেষাই জাঁতা আর চাষবাসের জন্য মাটিখোঁড়া খুরপিও পেয়েছিলেন।
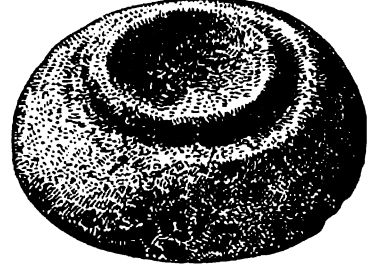
একটি নিগ্রো মেয়ে শিলনোড়ায় শস্যদানা কুটছে।

এই পাথরের শিলনোড়ায় আদিম নারীরা শস্যদানা কুটত।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, শিকারী ও জেলে মানুষ কৃষক হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। এখানে বলা দরকার যে গোষ্ঠীর সকল সভ্যই শিকার ও মাছধরার কাজ করত না। পুরুষরা শিকারে বেরিয়ে গেলে মেয়ে আর বাচ্চাকাচ্চারা কেউ টুকরি, কেউ কলসী নিয়ে বসতির চারপাশে খুঁজতে বেরোত। যা কিছু খাওয়ার যোগ্য জিনিস পেত তাই নিয়ে আসত কুড়িয়ে। সমুদ্রের উপকূলে তারা ঝিনুক পেত। জঙ্গলে তারা কুড়োত ছত্রাক, জাম আর বাদাম। তারা এ্যাকর্ণও (ওক গাছের ফল) ফেলত না; বরঞ্চ এ্যাকর্ণ গুঁড়ো করে ময়দা বানিয়ে তা সেঁকে রুটি বানাত। সেজন্য অনেক ভাষায় শস্যের নাম 'এ্যাকর্ণ' — ইংরেজীতে কর্ন্।

মৌচাক দেখতে পেলেই তারা বিশেষ করে উল্লসিত হত। কোন এক চূড়ায় একজন মধু সংগ্রহকারিণীর ছবি আঁকা আছে। সে গাছে চড়ে এক হাতে মৌচাক থেকে মধু ঢালছে, অন্য হাতে ধরে আছে হাঁড়িটা। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি রেগে তার চারপাশে ভন্ ভন্ করে উড়ছে। তার কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের মনেই সে মৌচাকের মধুভরা চাকগুলো টিপে মধু বার করে চলেছে।

মেয়ে আর বাচ্চাকাচ্চারা প্রত্যেকটি অভিযান থেকে ফিরে আসত ভাঁড়ে ভাঁড়ে মধু, জাম, জংলা আপেল আর নাশপাতি নিয়ে।

ভোজের কী চমৎকার আয়োজন! তবে গৃহস্থরা খাবারের সঞ্চয় শেষ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত না। তারা বাচ্চাকাচ্চাদের তাড়িয়ে যা পারত কলসী, টব আর পাত্রে জমা করে রাখত। শিকার অনিশ্চিত ব্যাপার বলে যে-কোন দিন ঐ সঞ্চয় কাজে লাগতে পারত।

এমনি করে আবহাওয়া আবার মনোরম হলে মানুষ আবার যোগাড়ে হয়ে উঠল। হয়ত মনে করবে আরও এক ধাপ পিছিয়ে যাওয়া হল এতে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা হল সম্মুখ দিকে এক বিরাট অগ্রগতি। যোগাড়ের কাজ থেকে মানুষ বীজ বোনার কাজে লাগল আর এমনি করে যোগাড়ের সীমা পেরিয়ে মানুষ এসে পড়ল কৃষিকর্মের জগতে।

ফল ও জামের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা জংলা ওট, জংলা গমের দানা এই সব শস্যের দানাও আনত কুড়িয়ে। এই সমস্ত বীজ মৃৎপাত্র এবং ঝুড়িতে সরিয়ে রাখার সময় এসবের কতকটা ছিটকে মাটিতে পড়ে যেত। কতকগুলো থেকে গাছ গজাত।

প্রথম প্রথম বোনা হত ঘটনাচক্রে — অর্থাৎ কতকগুলো বীজ হারিয়ে যেত মাত্র। তারপর তারা জেনেশুনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বীজ বুনতে শুরু করল।

বহু জাতির মধ্যেই বীজের সমাধি আর পুনরুত্থান নিয়ে পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

সেই প্রাচীন যুগে মেয়েরা যখন মাটি খুঁড়ে তারপরে তাতে বীজ পুঁতে দিত, তখন বিশ্বাস করত কোন অতীন্দ্রিয় দেবতাকে তারা সমাধিস্থ করেছে যিনি আবার তাদের মধ্যে ফিরে আসবেন সোনালী স্তবকে মুড়ে। আর হেমন্তে শস্যের আঁটি কুড়োবার সময় তারা পাতাল থেকে সেই দেবতার প্রত্যাবর্তনের উৎসব করত। শস্যের শেষ আঁটি আরা মাটিতে দাঁড় করিয়ে তার চারিদিকে নাচগান করত। এ শুধু এমনি নৃত্য নয়; এ ছিল যাদু উৎসব। মেয়েরা শস্যের জয়গান করত, ধরিত্রীকে মানত করত যেন তাদের প্রতি সদা প্রসন্ন থাকেন।

নতুনের মধ্যে পুরানো

এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়ও রাশিয়ার অনেক জায়গায় প্রতি বছর শরৎকালে মেয়েরা ফসল কাটার উৎসব উদ্‌যাপন করত। তারা শস্যের শেষ আঁটিটিকে নিয়ে তার মাথায় রুমাল ও গায়ে কাপড়-চোপড় পরাত। তারপর হাত ধরাধরি করে তার চারপাশে নাচত আর গলা ছেড়ে গান গাইত:

আমাদের গোলায় লো আমাদের গোলায়
নবান্ন পরব হল আজ।
জয় ভগবান।
এক খামারের ফসল হল তোলা
আরেকটাতে দিলাম সবে চাষ
জয় ভগবান।

আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যায় গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে উল্লসিত হয়ে যে-সব চুটকি গান গায় তা থেকে এই করুণ স্তোত্রের আওয়াজ ছিল ভিন্ন।

এই নবান্ন উৎসবটি সত্যি সত্যি অতি প্রাচীন উৎসব। সেই আদি কৃষকদের আমল থেকে বংশপরম্পরায় নেমে এসেছে এটি।

ছোটদের খেলায় আর গানে গানে এমন বহু উৎসব চলে এসেছে। ছোটরা হাত ধরাধরি করে গায়:

ওট, মটর, শীম আর বার্লি গজাও
ওট, মটর, শীম আর বার্লি গজাও —

এই গানের খেলাও এক কালে এক আচারানুষ্ঠান ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আসতে আসতে এর প্রাচীন যাদুমন্ত্রের অর্থ হারিয়ে অবশেষ আছে শুধু উৎসবের ঐ সুরটুকু।

আর খ্রীষ্টমাস বৃক্ষ উৎসব! খ্রীষ্টমাস বৃক্ষ এককালে এক পবিত্র বৃক্ষ ছিল। ফার গাছ ঘিরে লোকেরা এককালে নাচত শীতের শেষে বসন্তের আবাহন জানাতে, ঘুমন্ত বনানী আর প্রান্তরে নব জীবনের সঞ্চার করতে।

আমাদের বাচ্চাকাচ্চারা যে খ্রীষ্টমাস গাছ এত সাজায়-গোজায়, তারা এটাকে মোটেই পবিত্র বলে মনে করে না। তাদের কাছে এটা হল পরবেরই একটা অঙ্গ মাত্র।

বহু প্রাচীন উৎসব, মন্ত্রতন্ত্র আর ঝাড়-ফুঁক এসে বাসা বেঁধেছে বাচ্চাকাচ্চাদের মধ্যে।

যা বৃষ্টি, যা বৃষ্টি চলে যা,
আসিস আবার আরেক দিন।

ছোটরা এ গান করবার সময়ে এতটুকুও ভাবে না যে তারা মেঘ খেদিয়ে দেবে কিংবা বৃষ্টি ডেকে আনবে। তারা বেশ ভালোভাবেই জানে যে মন্ত্র দিয়ে মেঘ ডেকে আনা যায় না। গাইতে মজা লাগে বলেই তারা গান করে। এমনকি বড়রাও অনেক সময় এ ধরনের খেলায় ও গানে মেতে ওঠে, যদিও অতীতে এগুলির অর্থ ছিল সম্পূর্ণ অন্য।

এই ভাবে মজাদার খেলাধুলার মধ্যে প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাস আমাদের কালে পর্যন্ত টিকে আছে। কেবল খেলাধুলার মধ্যেই বা বলি কেন। গির্জায় যখন ইস্টারের সার্ভিস চলে তখন তার স্তোত্রের ভাষার মধ্যে আদিম যাদুগীতের রেশ খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। আদিম কৃষকদের গানের মতো এই স্তোত্রেও মৃত্যু ও পুনরাবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। গির্জার বাইরে যা খেলাধুলা ও নাচগানের আকারে টিকে আছে তাই এখনও গির্জায় ধর্মোৎসবরূপে পালিত হচ্ছে।

সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বহু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আজও চলে আসছে। এখনও অনেক লোক বিশ্বাস করে যে ঘোড়ার নাল পাওয়া সৌভাগ্যজনক, আর বাঁ দিকে একাদশীর চাঁদ দেখতে পাওয়ার অর্থ দুর্ভাগ্যের সূচনা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উগ্লিচের কোন এক যৌথখামারের এক মহিলাকর্মী আমাদের বলেন যে বিপ্লবের আগে তাদের গ্রামের কৃষক-মেয়েরা মুরগীর ঘরের ওপর 'মুরগী দেবতাকে' ঝুলিয়ে রাখত।

'মুরগী দেবতা' হল একখণ্ড পাথর — তার মাঝখানে একটা ফুটো। পাথরটা ঝোলানোর উদ্দেশ্য হল যাতে মুরগী আরও ভালো ডিম পাড়ে। তাহলে দেখতে পাচ্ছ কুসংস্কার কখন কখন কত দীর্ঘায়ু হতে পারে। পাথরের দেবতা প্রস্তরযুগের এক ভগ্নাবশেষ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পর্যন্ত তা টিকে ছিল।

ভোজবাজীর ভাণ্ডার

মেয়েরা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে চাষ করত, কিন্তু পুরুষরাও তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকত না। তারা সারাদিন শিকারে কাটিয়ে সন্ধ্যায় শিকার বয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরত।

ছোটরা বাবা-দাদাদের বাড়ি ফিরতে দেখে দৌড়ে জুটত তাদের কাছে। মতলব, তাদের কপালে শিকার কেমন জুটেছে তা সকলের আগে জানা। তারা

কৌতূহলভরে তাকিয়ে থাকত বন্য বরাহের রক্তাক্ত মুণ্ডের দিকে — তার বাঁকা লম্বা দাঁতদুটো মুখের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে; কিংবা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত হরিণের শাখাপ্রশাখাযুক্ত শিঙ। কিন্তু তাদের সবচেয়ে আনন্দ হত যখন শিকারীরা সঙ্গে করে, নয়ত খেদিয়ে নিয়ে আসত কোন জীবন্ত প্রাণীকে — বাচ্চা বাচ্চা ভীত সচকিত মেষ শাবক কিংবা কোন অসহায় শিঙ্-না-ওঠা বাছুর।

শিকারীরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই চতুষ্পদ বন্দীদের মারত না। তারা তাদের খোঁয়াড়ে আটকে রেখে খাইয়ে দাইয়ে বড় করে তুলত। বাড়ির কাছে ভেড়ার চিৎকার কি বাছুরের হাম্বা রব কানে এলে শিকারীরা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে করত। তাদের মনে হত, তাহলে শিকার না মিললেও তাদের মাংসের ঘাটতি হবে না। তাদের রসদ এখন নিশ্চিন্তে খোঁয়াড়ে আটক আছে, আর তার চেয়েও যেটা ভালো — সে রসদ দিনকে দিন আয়তনে বড় হয়েই উঠছে।

প্রথম প্রথম মানুষ গবাদি পশু রাখত শুধু তাদের মাংস আর চামড়ার জন্য। তারা সেই মুহূর্তেই পশুপালনের উপযোগিতা বুঝতে পারে নি। শিকারীরা গবাদি পশুকেও শিকার মনে করত আর তাদের ত অভ্যেসই ছিল শিকারের জীব হত্যা করা। তাদের মনে এ ধারণা জন্মানো সহজ ছিল না যে গোরু ভেড়াকে না মেরে বাঁচিয়ে রাখলেই বেশি ভালো হতে পারে।

একটা গোরু মারলে একবারই তাকে খাওয়া চলে। অথচ তার দুধ খাওয়া যায় বহু বছর ধরে। হ্যাঁ, উপরন্তু শেষে বেশি মাংসও লাভ হয় তার কাছ থেকে — কারণ তাকে না মেরে ফেললে প্রত্যেক বছরই একটা করে বাছুর হবে তার।

ভেড়ার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা খাটে। মেরে তার ছাল খুলে নেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু একটা চামড়া দিয়ে আর তেমন কী কাজ হয়? তার চেয়ে ভেড়ার গায়ে ছালটা রাখতে দিয়ে শুধু পশম কেটে নিয়ে ঢের বেশি লাভ। যতবার কাটবে ততবারই নতুন পশম গজাবে। তখন সেই একটা ভেড়া থেকেই তুমি একের বদলে ডজন ডজন ছাল পাবে।

চতুষ্পদ বন্দীদের মারার পরিবর্তে তাদের জিইয়ে রেখে তার বিনিময়ে কর আদায় করায় তাদের লাভ হল অনেক বেশি।

গোরু, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি জন্তুজানোয়ারকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করার পর মানুষ নিজেদের ইচ্ছামতো তাদের লালন-পালন করতে লাগল। ঠাণ্ডার সময় তাদের যাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকে, যাতে তাদের পেট ভরা থাকে সেদিকে মানুষ দৃষ্টি রাখত। কিন্তু তার বদলে গোরুর কাজ হল আগের চেয়েও বেশি করে দুধ দেওয়া, যেহেতু এখন কেবল বাছুরকে খাওয়ালেই চলবে না, প্রভুদেরও
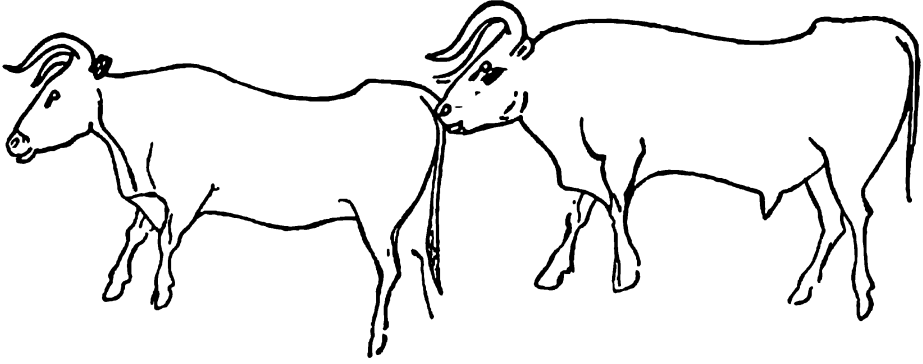
চারপেয়ে বন্দী (গুহার দেয়ালে আঁচড় কেটে আঁকা ছবি)।

খাওয়ানো চাই। ঘোড়া দেখতে দেখতে ভারী বোঝা টানতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। ভেড়ার পশম এখন তার নিজের এবং মানুষেরও কুলিয়ে যায়।

লোকে বেছে বেছে সবচেয়ে ভালো ভালো দুধাল গাই, সবচেয়ে লম্বা পশমওয়ালা ভেড়া আর তেজী ঘোড়া নিয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি করতে লাগল। এই ভাবে একটু একটু করে ভালো জাতের নতুন নতুন গৃহপালিত জীবজন্তু দেখা দিতে লাগল।

এই উপলব্ধি কিন্তু মানুষের হঠাৎ এক দিনে ঘটে নি। বহু যুগ কেটে যায় শিকারীকে পশুপালনকারীতে পরিণত হতে।

শেষ পর্যন্ত তাহলে কী ঘটল?

মানুষ এক ভোজবাজীর ভাণ্ডারের সন্ধান পেল। কুড়িয়ে পাওয়া শস্যের দানা তারা ধরণীর বুকে লুকিয়ে রাখত, আর ধরণী একেকটা দানার পরিবর্তে তাদের ফিরিয়ে দিত অনেক দানা। এদিকে শিকার করা জন্তুজানোয়ার জিইয়ে রাখার ফলে তাদের সংখ্যা ও দেহের আয়তনও বেড়ে যেতে লাগল বহু গুণ।

মানুষ বেশি স্বাধীন হল, প্রকৃতির ওপর তার নির্ভরশীলতা কমে গেল। আগে সে কখনই জানত না যে কোন জীবজন্তুর সন্ধান পেয়ে তাকে শিকার করতে পারবে কিনা কিংবা টুকরি ভরে খাবার শস্য যোগাড় করে আনতে পারবে কিনা। প্রকৃতিদেবীর রহস্যময়ী শক্তি তাকে খাবার দিতে পারে আবার নাও দিতে পারে। এখন মানুষ প্রকৃতিকে সাহায্য করতে শিখেছে: শস্য উৎপাদন করতে শিখেছে, গোরু ভেড়া লালন-পালন করতে শিখেছে। শস্যের সন্ধানে মেয়েদের এখন

আর বাড়ি থেকে বেশি দূরে যেতে হয় না। শিকারী পুরুষদেরও বন্য জন্তুর সন্ধানে বনে জঙ্গলে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

তাদের ঘরবাড়ির চারপাশের ছোট ছোট ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হয়, আর পাশের মাঠেই চরে বেড়ায় গোরু ভেড়া।

মানুষ একটা ভোজবাজীর ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছে — একথা না বলে বরং বলতে হয় সে ভাঁড়ার তৈরি করেছে নিজের শ্রমে।

এবার তার শস্যক্ষেত্র আর চারণ ভূমির জন্য জমি দরকার হল। জঙ্গলের বুক থেকে কেড়ে নিতে হবে সে জমি। তার পর সেই জমি খুঁড়তে হবে, মাটি আলগা করতে হবে। কত কাজ যে জুটল তার!

মানুষ হেলায় ফেলায় তার স্বাধীনতা, প্রকৃতির দাসত্ব থেকে তার মুক্তি অর্জন করে নি। কঠোর পরিশ্রম করে, সহস্র সহস্র বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তাকে তা
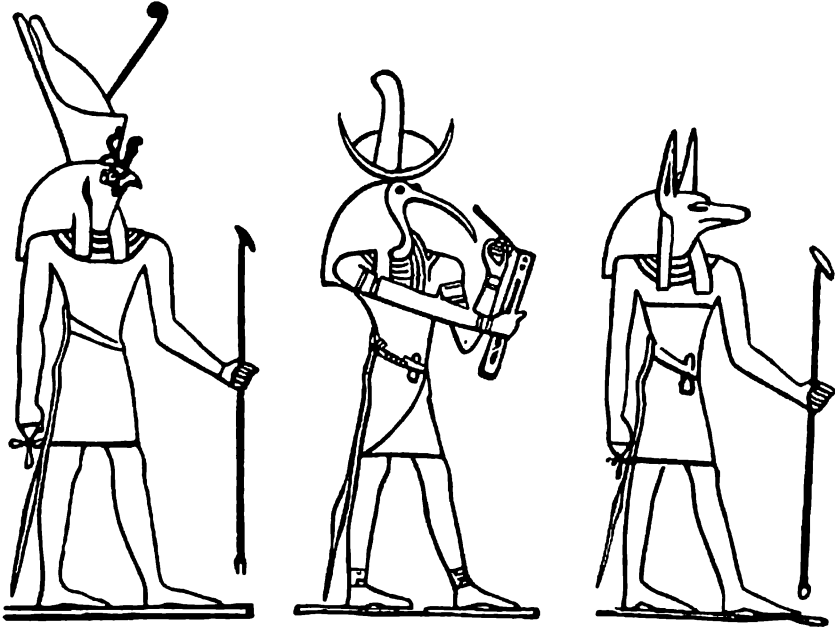
প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী মিশরীয়রা পশু বা পাখির মাথাওয়ালা মানবমূর্তিরূপে দেবতাদের কল্পনা করত।

লাভ করতে হয়েছে। নতুন কাজের যেমন আনন্দ ছিল তেমনি ঝামেলাও কম ছিল না। রৌদ্রের খরতাপে শস্য পুড়ে যেতে পারে। মাঠ-ময়দানের ঘাস জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে পারে। বোনা বীজ সব বৃষ্টির জলে ভেসে যেতে পারে।

আদিম শিকারী বাইসন কি হরিণের কাছে প্রার্থনা করত তার মাংস দানের জন্য। আদিম কৃষক বসুন্ধরা, আকাশ, সূর্য, জলের কাছে প্রার্থনা জানাত শস্যের জন্য। মানুষ নতুন দেবদেবী সৃষ্টি করল। এই সব নতুন দেবদেবী তখনও আগেরই মতন ছিল। পুরানো ধারায় তারা তাদের কল্পনা করত জীবজন্তুর মতো, নয়ত পশুর মাথাবিশিষ্ট মানুষের মতো। তবে এই সব দেবদেবীর নতুন নামকরণ হল, কাজও হল নতুন। একের নাম হল দৌ, অন্যের সূর্য, আরেকটার পৃথিবী। এদেরই কাজ হল আলো, আঁধার, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দেওয়া।

আমাদের মানুষ-দৈত্যটি বড় হয়েছে, তার শক্তি বেড়েছে; কিন্তু এখনও সে তার নিজের শক্তির সীমা সম্বন্ধে সচেতন নয়। ঠিক আগেরই মতো তার বিশ্বাস যে স্বর্গ থেকেই তার দৈনন্দিন খাবার জুটছে, নিজের শ্রমের ফলে নয়।

ঘণ্টার কাঁটা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে

ইতিহাসের ঘণ্টার কাঁটা তিনহাজার বছর এগিয়ে দেওয়া যাক। সে হবে আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ শতাব্দী আগের কথা।

পঞ্চাশ শতাব্দী! কোন এক বিশেষ ব্যক্তি, এমনকি জাতির পক্ষেও এ হল অনেক দিনের কথা। কিন্তু আমরা কোন এক বিশেষ মানুষের কথা বলছি না। বলছি মানবজাতির কথা।

মানবজাতির বয়স অন্তত দশ লক্ষ বছর হবে। তার পক্ষে পঞ্চাশ শতাব্দী বিশেষ বড় কথা নয়।

তাহলে ঘণ্টার কাঁটা এগিয়ে দেওয়া হল। পৃথিবী তার অক্ষের ওপর কয়েক হাজার বার সূর্যের চারিদিকে ঘুরে এসেছে। ইতিমধ্যে তার কী ঘটল? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে এর মাথার চাঁদিতে যেন বড় বেশি টাক পড়েছে। পুরাকালে ঘন কালো অরণ্যের মধ্যে একমাত্র বরফেরই সাদা টুপি পরানো থাকত। আর এখন? বনজঙ্গল পাতলা হয়ে এসেছে। ফাঁকা মাঠের প্রশস্ত জিহ্বা তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। ইতস্তত জঙ্গলগুলোকে বিভক্ত করে রেখেছে আলো-ঝলমল মাঠ ময়দান। নদী আর হ্রদের তীর জলরেখা থেকে আরও সরে সরে এসেছে, সেখানে জলায় জন্মেছে নলখাগড়া আর ঝোপঝাড়।

আর নদীর বাঁকের পাশে পাহাড়ের গায়ে ওটা কী? মনে হচ্ছে যেন একটা হলদে রুমাল কে বিছিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের ঢালে।

এ হল মানুষের হাতের ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া একখণ্ড জমি। শস্যের শীষের মাঝখানে নজরে পড়ছে অবনত মেয়েদের পিঠ। কাস্তে দিয়ে কচ্ কচ্ করে শস্যের ছড়া কাটছে তারা।

হাতুড়ির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে বহুকাল আগে। কিন্তু কাস্তে আমরা দেখলাম এই প্রথম। আজকের কাস্তের সঙ্গে এর আকাশ পাতাল পার্থক্য। এটি কাঠ আর পাথরে তৈরি, কাঠের হাতলে পাথরের দাঁত বসানো।

এই হল কৃষিক্ষেত্র — পৃথিবীর অন্যতম প্রথম কৃষিক্ষেত্র। মানুষের ছোঁয়াচ লাগে নি বন্য প্রকৃতির মধ্যে এমন কয়েকটিই হলদে রুমাল আছে মাত্র। আগাছার ঝাড় চারদিক থেকে শস্যের ছড়াকে চেপে ধরছে। মানুষ এখনও কী করে আগাছা উৎখাত করবে তা শেখে নি। কিন্তু শস্যের ছড়াগুলো অতি উত্তম এবং শীঘ্রই এমন দিন আসছে যখন সোনালী মহাসাগর ভরিয়ে দেবে সারা পৃথিবী।

দূরে বহুদূরে নদীর তীরে সবুজ প্রান্তরে ছোট ছোট চেহারা নজরে পড়ে: সাদা, হলদে, রঙবেরঙের। ছোট ছোট চেহারাগুলো নড়াচড়া করছে, এই চলে যাচ্ছে দূরে, এই এসে জড়াজড়ি করছে সকলে। কতকগুলো বড় আর কয়েকটা ছোট। এটা গোরু ছাগল আর ভেড়ার পাল। মানুষের কাজের ফলে যে-সব জীব বদলিয়ে গেছে সংখ্যায় তারা তখনও খুব বেশি নয়। তবে যে-সব বুনো আত্মীয়দের স্বয়ং নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা করতে হয় এরা তাদের তুলনায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। দু-তিন হাজার বছরের মধ্যেই কিন্তু সারা সমভূমিতে যত মোষ ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি গৃহপালিত গোরু আর ষাঁড় দেখা যাবে পৃথিবীতে।

ক্ষেত আর পশুর পাল... তার মানেই পাশেই কোথাও বসতি থাকতে বাধ্য। আছেও ত তাই — নদীর গর্ভ থেকে ওঠা খাড়া পাড়ের ওপর। দেখলে তক্ষুনি বুঝতে পারবে আদি শিকারী বসতি থেকে এসব বসতি সম্পূর্ণ আলাদা। শাখা-প্রশাখায় জড়ানো খুঁটি দিয়ে তৈরি কুঁড়ের জায়গায় এখানে আমরা পাচ্ছি দোচালা সত্যিকার কাঠের বাড়ি। দেয়াল কাদা দিয়ে ঢাকা। দরজার ওপরে ঘরের ছাদ থেকে একটা বর্গা বেরিয়ে এসেছে বাইরে — তাতে কাঠ কেটে তৈরি শিঙ্‌ওয়ালা ষাঁড়ের মাথা। ঐ ষাঁড়টি হল গৃহলক্ষ্মী দেবতা। বসতিটা ঘিরে চারপাশে আছে উঁচু করে বেড়া আর মাটির বাঁধ।

ধোঁয়া, গোবর, আর টাটকা দুধের গন্ধ বেরোচ্ছে। ঘরবাড়ির চতুর্দিকে ছেলেরা খেলা করছে, শুয়োরের পাল ছোট ছোট একগাদা ছানা নিয়ে কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে। একটি বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে আগুন দেখা যাচ্ছে। একজন বুড়ি উনুনে রুটি সেঁকছে। সে রুটিটা ছাইয়ে ফেলে একটা মাটির বাসন দিয়ে সেটা চাপা দিয়ে রাখছে। পাশের একটা তাকে নক্‌শাকাটা কাঠের বাটি আর মগ।

গ্রাম ছেড়ে নদীর কাছে যাওয়া যাক। জলের ধারেই অর্ধেক জলে ভরা একটা শালতি দুলছে। নদীটা দিয়ে যে হ্রদ থেকে এর উৎপত্তি তার দিকে এগিয়ে গেলে আমরা আরেকটা গ্রাম দেখব — তবে সেটা অন্য রকমের। এ গ্রামটি হ্রদের পাড়ে নয়; দ্বীপের মতো সোজা জলের মধ্যে।
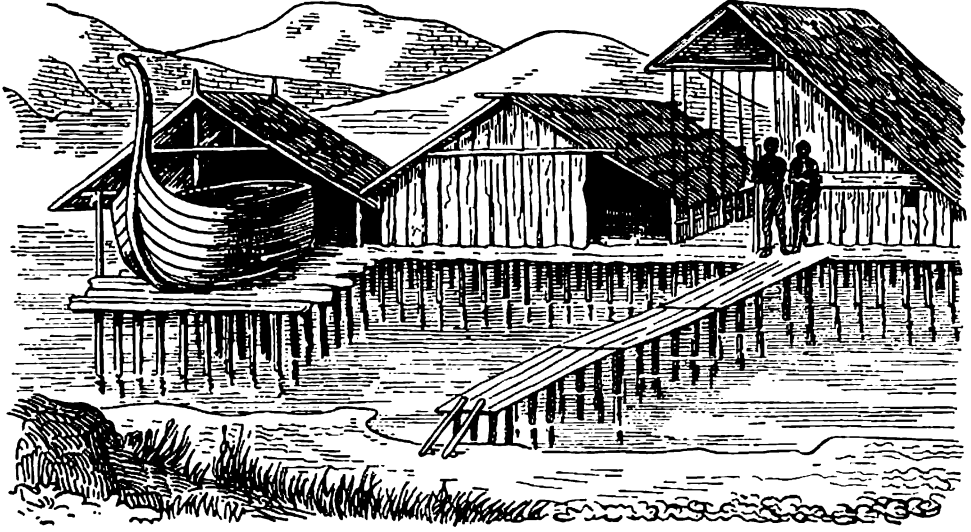
নিউ গিনিতে এখনও জলের মাঝখানে খুঁটির ওপর খাড়া ঘরবাড়ি সমেত পল্লী দেখতে পাওয়া যায়।

হ্রদের তলায় খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে, খুঁটির ওপর বর্গা বিছিয়ে তার ওপর তক্তা পেতে দেওয়া হয়েছে। তীর থেকে গ্রাম অবধি একটা সাঁকো পাতা। বাড়ির দেয়ালে মাছ ধরার জাল শুকোতে দেওয়া আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় হ্রদটিতে প্রচুর মাছ আছে, তবে গ্রামবাসীরা একমাত্র মাছ খেয়েই প্রাণ ধারণ করে না। বাড়িগুলোর মাঝখানে ডালপালা দিয়ে বুনে গোলা তৈরি হয়েছে, সেখানে তারা শস্য সঞ্চয় করে। গোলার পাশের গোয়াল থেকে গোরুর হাম্বা রব কানে আসে।

পুরাকালের এই যে গ্রামের ছবি আমরা আঁকলাম তা বহুকাল হল লোপ পেয়েছে। যেখানে আগে ঘরদোর ছিল তা জলের কবলে পতিত হয়েছে। হ্রদের অতলে কী করে আমরা এসব বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বার করব? মনে হয় অসম্ভব। তবে কখন কখন হ্রদের জল নেমে গিয়ে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চয় — সে যা সঞ্চয় করে রেখেছে।

হ্রদের কাহিনী

১৮৫৩ সালে সুইজারল্যাণ্ডে দারুণ অনাবৃষ্টি হয়েছিল। উপত্যকার নদনদীতে চড়া পড়ে যায়। সমস্ত হ্রদের জল শুকিয়ে গিয়ে তলার মাটি কাদা উঠে পড়েছিল। জুরিখ হ্রদের তীরের ওবেরমাইলেন শহরের লোকেরা এই অনাবৃষ্টির সুযোগে হ্রদ থেকে কিছুটা শুকনো জমি দখল করতে চেয়েছিল।

এজন্য তাদের শুকিয়ে যাওয়া জমিটুকুকে বাঁধ দিয়ে আলাদা করা দরকার। কাজ শুরু হল। তারা হ্রদের শুকিয়ে যাওয়া তলা থেকে কাদা সরাতে লাগল। আগে যেখানে প্রতি রবিবারে শৌখিন পোশাক পরা শহরের লোকেরা লাল নীল নৌকায় চড়ে দলে দলে বেড়াত এখন সেখানে দলে দলে লোকজন কাদা তুলবার সময় ঘোড়াকে কাজে লাগাবার জন্য হাঁকডাক করতে লাগল। একদা জনৈক খনকের কোদাল গিয়ে লাগল মাটির নীচে আধপচা খুঁটির ওপর। প্রথমটির পরে দেখা

কোন এক সময় জুরিখ হ্রদে যে রকম বসতি ছিল বিজ্ঞানীরা তার একটা ছবি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

গেল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খুঁটিও রয়েছে। বেশ বোঝা গেল এই একই জায়গাতেই আগেও একবার কাজকর্ম হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক কোদাল ভর্তি হয়ে উঠতে লাগল পাথরের কুড়োল, মাছ ধরার বঁড়শি, ভাঙাচোরা বাসনপত্র। প্রত্নতত্ত্ববিদরা কাজে লেগে গেলেন। তাঁরা প্রত্যেকটি খুঁটি, হ্রদের তলে পাওয়া প্রত্যেকটি জিনিস পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপরে আমাদের জন্য একটি বইয়ের পাতায় এঁকে নিলেন খুঁটির ওপরে তৈরি জুরিখ হ্রদের ওপরের পুরাকালের গ্রামটিকে।

এখন যেখানে মস্কো, তার কাছাকাছি জায়গায়, রাশিয়ার ক্লিয়াজ্‌মা নদীর তীরে এবং মুরোমের কাছে ভেলেত্‌মা নদীর তীরে কাঠের খুঁটির ওপর তক্তা পেতে তৈরি এই রকম কতকগুলো বসতি কোন এক সময় ছিল। সেখানে বহু মাছের কাঁটা, হারপুন ও মাছ ধরার বঁড়শীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আরেকটি সুইস হ্রদ নইশাতেল-এ অনুসন্ধানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা হ্রদের তলদেশে কয়েকটি গর্ত কেটে দেখলেন সেটা কয়েকটা স্তরে বিভক্ত। স্তরে স্তরে বিভক্ত কেকের মশলা থেকে যেমন পুর সহজেই পৃথক করা যায়, তেমনি এখানেও একটি স্তর থেকে অন্য স্তরের পার্থক্য সহজেই বোঝা যেত। একেবারে তলে ছিল বালুর স্তর। তারপর পলিমাটির স্তর, তাতে ছিল বসতির ধ্বংসাবশেষ, তার মধ্যে ছিল এক কালের বাসিন্দাদের বাসনপত্র আর যন্ত্রপাতি। তারপরে আবার বালুর স্তর, কয়েকবার আছে এমনি। শুধু একটি জায়গায় বালুর দুটি স্তরের মধ্যে কাঠকয়লার একটা গভীর স্তর ছিল।

এসব স্তর কেমন করে হল?

বালু হয়ত জলে ভেসে আসতে পারে। কিন্তু কয়লা এলো কোত্থেকে?

স্পষ্টই বোঝা গেল সেখানে আগুনও ছিল।

স্তরগুলি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা হ্রদের আনুপূর্বিক সমস্ত কাহিনী জানতে পারলেন। একদা বহু বহু যুগ আগে মানুষ এই হ্রদে এসে তীরে তীরে বসতি গড়েছিল। পরে হ্রদের জল বেড়ে তীর ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ডুবে যাওয়া গ্রাম পরিত্যাগ করে লোকজন সবাই চলে গেল। ঘরবাড়ি পচে টুকরো টুকরো হয়ে জলে পড়ে গেল। এক কালে যার ওপর সোয়ালো পাখি কিচির-মিচির করত, ছোট ছোট মাছেরা ঝাঁক বেঁধে সেই ছাদের ওপর দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। ধারাল দাঁতওয়ালা পাইক মাছ অলসভাবে ডানা ঝাপটা দিতে দিতে খোলা দরজার মধ্যে সাঁতার কাটছে। উনুনের কাছের তাকের ওপর এসে কাঁকড়ার দল দাঁড়া নাড়ছে। ধ্বংসাবশেষ পলিমাটির তলায় চলে গেল, তার ওপর এসে পড়ল বালির স্তর।

কিন্তু হ্রদও স্থির হয়ে ছিল না। ধীরে ধীরে জল তীর থেকে দূরে সরে এলো। হ্রদের তলা তখন শুকনো হয়ে গেল। যে বালুখণ্ডের ওপর আগের গ্রামটি দাঁড়িয়ে ছিল তাও আবার শুকনো জমি হয়ে গেল। কিন্তু গ্রামটির কোন চিহ্ন রইল না। তার ধ্বংসাবশেষ এক গভীর বালুস্তরে চাপা পড়ে গেল।

আবার সেই হ্রদের তীরে লোকজন এলো। কুড়োলের ঠকাঠক আওয়াজ উঠল। হলদে বালুর ওপর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাঠের কোঁকড়া কোঁকড়া চিলতে। আবার হ্রদের তীরে নতুন শক্ত শক্ত বাড়ি মাথা তুলল একের পর এক।

এই ভাবে মানুষ আর হ্রদের সংগ্রাম চলতে লাগল অদৃষ্টের ভাঙা গড়ার সঙ্গে সঙ্গে — মানুষ গড়ে তুলছে আর হ্রদ ভাঙছে।
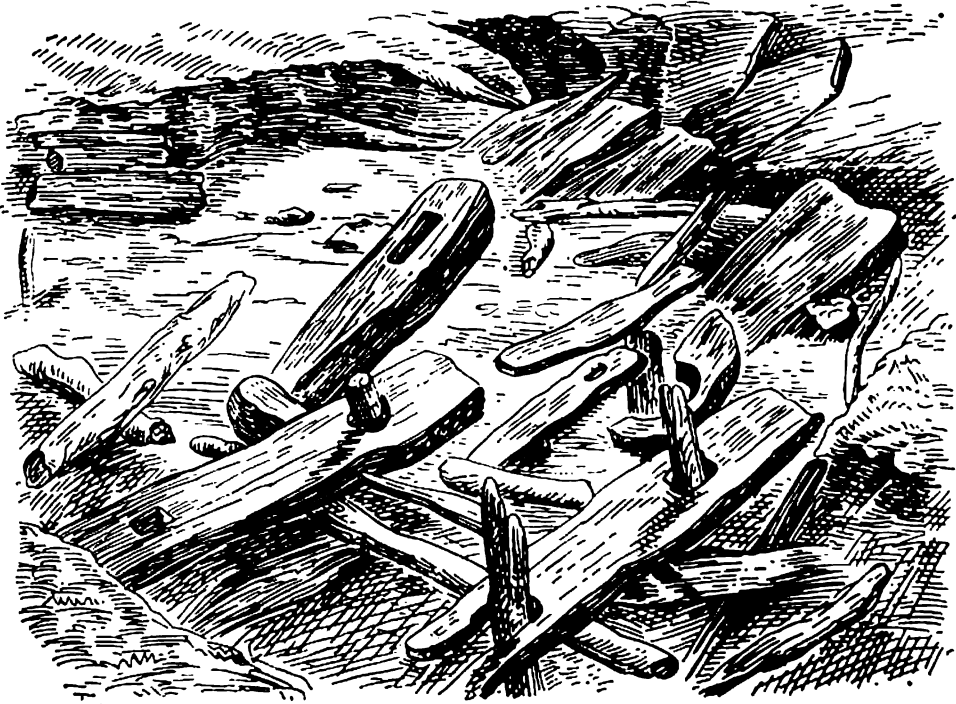
স্কটল্যাণ্ডের যে জায়গায় প্রাচীন আমলে খুঁটির ওপর পল্লী ছিল সেখান'থেকে যা যা পাওয়া গেছে।

অবশেষে সংগ্রাম করতে করতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারা তীরে বাড়ি বানানো বন্ধ করে দিয়ে জলের মধ্যেই হ্রদের বুকে উঁচু খুঁটি পুঁতে তার ওপর ঘরদোর বানাতে লাগল। মেঝের ফুটো দিয়ে তারা নীচের গভীর জল দেখতে পেত — কিন্তু সে জল দেখে আর তারা ভীত হত না। যত ইচ্ছা ফুলে উঠুক না কেন — তাদের মেঝে ছুঁতে পারবে না সে।

কিন্তু এ ছাড়াও মানুষের আর একটি শত্রু ছিল — আগুন।

পুরাকালে তারা যখন গুহায় বাস করত আগুনে তাদের কোন ভয় ছিল না। গুহার পাথরের দেওয়াল আগুনে পোড়ে না। কিন্তু প্রথম কাঠের বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল প্রথম ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড। যে রক্তিম দানবের লেলিহান শিখা এত হাজার হাজার বছর নিরীহের মতো মানুষের পদানত হয়ে ছিল — তাই এবার অকস্মাৎ করাল রূপ নিয়ে জ্বলে উঠল।

নইশাতেল হ্রদের তলায় পাওয়া কয়লার স্তর হল এমনি এক পুরাকালের অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন।

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল হ্রদে। ছেলেপুলে কোলে নিয়ে লোকজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসহায় প্রাণীরা খোঁয়াড়ে আবদ্ধ অবস্থায় আর্তনাদ করতে লাগল, কিন্তু তাদের কথা ভাববার অবসর মানুষের আর ছিল না। কাঠের গ্রামটি বিরাট বহ্নুৎসবের মতো জ্বলতে লাগল চতুর্দিকে ফুলকি ছড়িয়ে।

গ্রামে যারা বসবাস করত তাদের পক্ষে আগুন হল সাংঘাতিক বিপদ। কিন্তু যে-আগুন তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিল সেই আগুনই আবার আমাদের জন্য বহু মিউজিয়মের উপযুক্ত অমূল্য জিনিসপত্র বাঁচিয়ে রাখল: কাঠের বাসনপত্র, মাছ ধরার জাল, এমনকি শস্যের দানা আর নানা রকম ডাঁটা।

কিন্তু যে-আগুন অতি সহজেই সব কিছু ভস্মীভূত করতে পারত সে আগুন তা না করে আমাদের জন্য জিনিসগুলো বাঁচিয়ে রাখল কোন যাদুমন্ত্রে?

ব্যাপারটা ঘটে এই ভাবে: জিনিসগুলো আগুন ধরে জলে পড়ে গিয়েছিল।
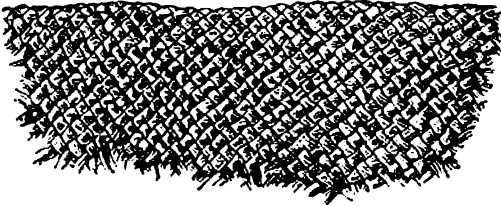
খুঁটির ওপর বসতির ভগ্নাবশেষের মাঝখান থেকে পাওয়া বস্ত্রখণ্ড।

জল আগুন নিবিয়ে জিনিসগুলো বাঁচাল। জিনিসগুলোও অক্ষত অবস্থায় হ্রদের তলে এসে ঠেকল। সেখানে আরেকটা ভয় ছিল — যদি জিনিসগুলো পচে যায়। এখানেও একটি জিনিসের জন্য পচন থেকে বেঁচে গেল — আগুন ধরায় জিনিসগুলোর চারপাশে কয়লার পাতলা আবরণ জমে গিয়েছিল। এটাই বাঁচাল তাদের পচার হাত থেকে।

জল কি আগুন যে-কোন একটা জিনিসই তাদের নষ্ট করে দিত, কিন্তু একসঙ্গে কাজ করার ফলে হাজার হাজার বছর আগে বোনা কাপড়ের টুকরোর মতো ভঙ্গুর জিনিসও টিকিয়ে রেখেছিল আমাদের জন্য।

প্রথম বস্ত্র

প্রথম বোনার কাজ যন্ত্রচালিত তাঁতে হয় নি। হয়েছিল হাতে বিনুনি পাকিয়ে।

এস্কিমোরা এখনো না বুনে বিনুনি পাকায়। কাপড়ের পোড়েন-এর লম্বা সুতোগুলোকে তারা একটা ফ্রেমে বিছিয়ে দেয়। ছোট টানাগুলোকে তারা আঙুলে করে ওদের মধ্যে দিয়ে ওপরে নীচে সামনে পেছনে টেনে নিয়ে আসে — মাকু লাগায় না।

বিছানো সুতোর এই ফ্রেমকে আমাদের যন্ত্রের তাঁত বলে অনুমান করা কঠিন। তাহলে কী হয়, যন্ত্রের তাঁতের উদ্ভব হয়েছে কিন্তু অমনি চার তক্তার সহজ ফ্রেম থেকেই।
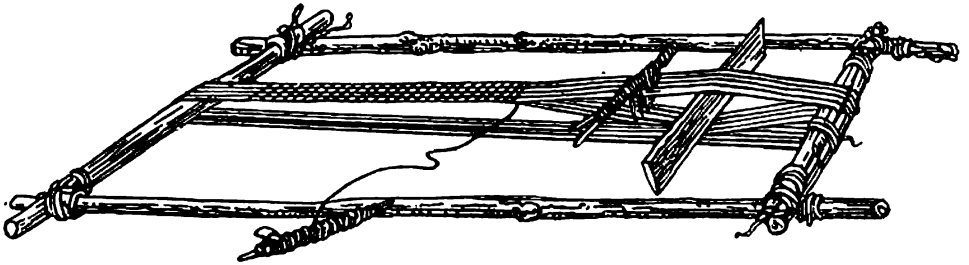
প্রথম যুগের কাপড় বোনার তাঁতযন্ত্র সম্ভবত ব্রাজিলের রেড ইণ্ডিয়ানদের এই তাঁতযন্ত্রটার মতো দেখতে ছিল।

হ্রদের তলায় কুড়িয়ে পাওয়া পোড়া কালো ন্যাকড়াটুকু কিন্তু মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আদি কালে যে-মানুষ পশুর চামড়ায় লজ্জা নিবারণ করত এখন তারাই তিসি থেকে কৃত্রিম চামড়া বানাতে শিখল। সে চামড়ার উপাদান তৈরি হত জমিতে। কাপড়ের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে ছুঁচের উদ্ভব। এখন সে ছুঁচ সরাসরি তার কাজে নামল।

নীল ফুলে ভরা তিসির ক্ষেতে মেয়েদের কাজ আরও বেড়ে গেল। কাস্তে ধরার কাজ থেকে তাদের হাত বিশ্রাম পেয়েছে কি পায় নি, অমনি তাদের গোড়াশুদ্ধ তিসিগাছ টেনে তুলতে হত। তারপর তাকে শুকিয়ে, ভিজিয়ে আবার শুকোতে দিতে হত। তখনও শেষ হয় নি কাজ। আছড়ে আছড়ে সেই তিসি আল্‌গা করে পরে তাকে আঁচড়ে আলাদা করে নিত। তারপর, সকলের শেষে তক্‌লি ঘুরিয়ে সেই সাদা শনের আঁশ পাকিয়ে সুতো তৈরি করত। এত সব হলে তবেই তারা বোনা আরম্ভ করতে পারত। মেয়েরা কষ্ট সহ্য করে কাপড় বুনত। কিন্তু তার বিনিময়ে তারা পেত চমৎকার উড়ুনি, আঙরাখা, চওড়া পাড়ের ঝলমলে শাড়ি।

প্রথম খনিকর্মী ও ধাতুবিদ্‌

আজ প্রত্যেক বাড়িতেই দেখতে পাবে এমন সব কৃত্রিম পদার্থে তৈরি কত রকমের জিনিস, যা প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় না।

স্বাভাবিক ইট, চীনামাটি, ঢালাই লোহা, কাগজ বলে প্রকৃতিতে কিছু নেই। ঢালাই লোহা কি চীনামাটি পেতে হলে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে পদার্থ নিয়ে তাকে এমনভাবে বদলে দেয় যে আর চেনাই যায় না। ঢালাই লোহা দেখতে এতটুকুও খনিজ লোহার মতো নয়। ঈষৎ স্বচ্ছ পাতলা চীনামাটির কাপ দেখে কে চিনতে পারবে যে এর মূলে রয়েছে কাদা?

আর এই সব জিনিস — কংক্রীট, সেলোফেন, প্লাস্টিক, নকল সিল্ক, নকল রবার! কখনও কংক্রীটের তৈরি পাহাড়ের চূড়া দেখেছ? আর এমন গুটিপোকাই বা কোথায় আছে যে কাঠ থেকে সিল্ক তৈরি করবে?

পদার্থ জয় করতে গিয়ে মানুষ ক্রমেই প্রকৃতিদেবীর কারখানার গভীরে ঢুকতে লাগল। সে শুরু করেছিল পাথর দিয়ে পাথর ঘষা থেকে। আর আজ সে কাজ

করছে অণু নিয়ে — সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এমন সব কণা নিয়ে যা খালি চোখে দেখা যায় না।

একাজ অনেক আগেই শুরু হয়েছিল — রসায়নশাস্ত্র অথবা পদার্থ বিজ্ঞানের উদ্ভবের বহু আগে। হাতড়াতে হাতড়াতে নিজের অজান্তেই মানুষ পদার্থের রূপান্তর ঘটাতে আরম্ভ করেছিল।

প্রথম কুমোররা মাটি পোড়ানোর সময় নিজেদের অজ্ঞাতেই পদার্থের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছিল। একাজ বড় সহজ নয়। পাথরের রূপান্তর ঘটানোর সময় হাত দিয়ে তা করলেও যে-সব সূক্ষ্মকণা নিয়ে পদার্থ গঠিত, ঢালাই করার সময় হাত দিয়ে সেগুলো বদলানো সম্ভব নয়। পদার্থ পুনর্গঠন করতে হাতের শক্তির দরকার হয় না, দরকার অন্য শক্তির।

যখন আগুনের সাহায্য মানুষ নিয়েছিল তখন থেকেই এই শক্তি মানুষ আবিষ্কার করেছিল। আগুন মাটি পোড়ায়, আগুন ময়দাকে রুটিতে পরিণত করে, আগুন তামা গলিয়ে দেয়।

পাথরের যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা হ্রদের তলায় প্রথম তামার তৈরি যন্ত্রপাতিও পাই।

যে-মানুষ এত হাজার বছর ধরে পাথরের যন্ত্রপাতি তৈরি করে আসছিল সে কী করে হঠাৎ ধাতু দিয়ে সে-সব তৈরি করতে আরম্ভ করল? কোথায়ই বা ধাতু পেল সে?

বনে-জঙ্গলে কি মাঠে আমরা বেড়াতে গেলে খাঁটি তামার টুকরো ইতস্তত পড়ে থাকতে দেখি না। তামার তাল আজকাল মহাদুষ্প্রাপ্য জিনিস; কিন্তু চিরকাল তেমন ছিল না। কয়েক হাজার বছর আগেও এখনকার তুলনায় তামা অনেক সহজলভ্য ছিল। প্রচুর ছড়িয়ে থাকত এদিক সেদিক। কিন্তু তখন চকমকি পাথর দিয়েই যন্ত্রপাতি বানানো হত বলে লোকজনের তামার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

তামার তাল তখনই তাদের নজরে পড়ল যখন যদৃচ্ছা ব্যবহার করার ফলে চকমকি পাথর দুর্লভ হয়ে উঠল। দুর্লভ হয়ে ওঠার কারণ এই যে লোকে চকমকি পাথর যদৃচ্ছা খরচ করত। কাজের সময় বিরাট স্তূপ জমে উঠত তাদের ইতস্তত ছড়ানো অব্যবহার্য বাতিল টুকরো আর চাঁচের। আজকের দিনেও যেমন কারখানার চারপাশে ছড়ানো থাকে অকেজো সব জিনিসের টুকরো, তেমনি।

হাজার হাজার বছর পরে চকমকি পাথরের সরবরাহ বেশ খানিকটা কমে এসেছিল।

পৃথিবীতে চকমকি পাথরের অভাব দেখা দিল — বিষম বিপদ হল সেটা। আমাদের কল-কারখানায় লোহার অভাব হলে কী দশা হবে একবার ভেবে দেখ! খনিজ আকরের সন্ধানে আমরা ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর খাদে নামব।

পুরাকালেও মানুষ ঠিক তাই করেছিল। তারা খনি খুঁড়তে আরম্ভ করেছিল— পৃথিবীর আদি খনি ছিল সেগুলো। নানাস্থানে খড়িমাটির স্তরে তিরিশ থেকে ষাট ফুট গভীর পুরাকালের কতকগুলি খনি দেখা গেছে। খড়িমাটি আর চকমকি প্রায়ই পাশাপাশি থাকে।

সেযুগে মানুষের পক্ষে মাটির নীচে কাজ করা বড়ই ভয়াবহ ছিল। দড়ি বেঁধে, নয়ত খাঁজকাটা থাম বেয়ে তাদের নীচে নামতে হত। নীচে অন্ধকার আর ধোঁয়ায় ভরা। লোকে কাঠের চিলতে জ্বালিয়ে তার আলোয় কিংবা ছোট তেলের পিদিম জ্বালিয়ে কাজ করত। আজকাল নিরাপত্তার জন্য খনির দেওয়াল সব কাঠের বর্গা দিয়ে ঠেসে টেনে জোর দিয়ে রাখা হয়; কিন্তু সেযুগের মানুষ মাটির নীচের পথের মাথার ওপরকার খিলান কি দেওয়াল কী করে ঠেস দিয়ে শক্ত করতে হয় তা জানত না। প্রায়ই এমন হত যে ছাদের চাঙড় ভেঙেই লোকজন চাপা পড়ে মরত। পুরাকালের চকমকির খনিতে খড়িমাটির স্তূপের নীচে হরিণের শিঙের শাবল সমেত চাপা পড়া খনি কর্মীদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে।

এক জায়গায় পাওয়া যায় দুটি কঙ্কাল — একটা বয়স্ক লোকের অন্যটি ছোট ছেলের। বেশ বোঝা যায় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাবা কাজে নেমেছিল — কিন্তু তারা কেউই আর বাড়ি ফিরে আসতে পারে নি।

প্রত্যেক শতাব্দীতেই চকমকি দুর্লভ হতে লাগল; খুঁজে পেতে বের করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল। অথচ মানুষের চকমকি চাই। সে কুড়োল, ছুরি আর কোদাল তৈরি করত চকমকি পাথর দিয়ে।

এর স্থান গ্রহণ করতে পারে এমন কিছু বার না করলে আর চলছিল না।

তামার পিণ্ড এসে তাদের উদ্ধার করল। লোকজন তামার পিণ্ড পরীক্ষা করতে লাগল: এটা আবার কেমন সবুজ পাথর! এ কি কোন কাজে লাগবে?

তারা এক টুকরো তামা নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে তাকে ভাঙতে চেষ্টা করল। কারণ বুঝতেই পার, তারা এটাকে পাথর বলে ভেবেছিল। ঠিক পাথরের মতো করেই এটাকে দিয়ে কিছু একটা গড়ার চেষ্টা করছিল সকলে। যতই তারা জোরে জোরে হাতুড়ির বাড়ি মারে ততই সেটা শক্ত হয়ে ওঠে — আর তার গঠনও যায় বদলে। কিন্তু কায়দা করে পিটানো দরকার ছিল। বড় বেশি জোরে হাতুড়ির ঘা মারতে গিয়ে তামার পিণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

এই ভাবেই মানুষ প্রথমে ধাতুকে পিটিয়ে পিটিয়ে জিনিস বানাতে শিখল। ঠিক বটে এটা ঠান্ডা ধাতুকে পিটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল; তবে ঠান্ডা থেকে গরম হাপরে পৌঁছাতে বেশি দেরি হল না।

একটা তামার তাল কিংবা টুকরো হয়ত আগুনে পড়ে গিয়েছিল। কিম্বা এও হতে পারে মানুষ ইচ্ছে করেই মাটি পোড়ানোর মতো তামাও আগুনে পুড়িয়েছিল। আগুন নিভে গেলে চুল্লীর পাথরের মধ্যে একটা ছোট্ট চ্যাপ্টা দলা পড়ে থাকল গালানো তামার।

এই 'আজব' জিনিসটার দিকে লোকেরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। ভাবত তারা নয়, আগুনের ভূতই সেই সবজেটে-কালো পাথরটাকে চকচকে লাল তামায় পরিণত করেছে।

তারা সেই তামার দলা ভেঙে টুকরো টুকরো করে পাথরের হাতুড়ির ঘা মেরে ছুরি, শাবল, কুড়োল বানিয়ে নিল।

এমনি করে প্রকৃতির যাদুঘর থেকে মানুষ একটা চকমকে ধাতু পেল। আগুনে খনিজপিন্ড ফেলে দিত আর সেটা ফিরে আসত তামা হয়ে।

এই আশ্চর্য ব্যাপারটাও মানুষের শ্রমের ফল।

রাশিয়ার আদিযুগের চাষী

বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে রুশ প্রত্নতত্ত্ববিদ খ্ভোইকো কিয়েভ জেলার ত্রিপোলিয়ে গ্রামের কাছে একটি প্রাচীন কৃষক পল্লীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান।

পরে রাশিয়ার দক্ষিণে ঐ রকম আরও বহু পল্লীর সন্ধান পাওয়া যায়।

সোভিয়েত আমলে পাস্‌সেক ও বগায়েভ্স্কি নামে দুই প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐ সমস্ত পল্লী নিয়ে অনুসন্ধানের কাজ চালান। তাঁদের গবেষণাকর্মের কল্যাণে পাঁচ হাজার বছর আগে চাষীরা কী ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত তার একটা স্পষ্ট চিত্র আজ আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই।

কৃষকপল্লী ছিল উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে একটা চত্বরের ওপর গবাদি পশু রাখার খোঁয়াড়। চত্বরটার চারপাশে থাকত মাটি দিয়ে লেপা কতকগুলো কাঠের চৌচালা বাড়ি।

সেই সময়কার মাটির তৈরি একটা বাড়ির মডেল অটুট অবস্থায় পাওয়া গেছে। জিনিসটা খেলনা বলে মনে হয় না — সম্ভবত কোন আচারানুষ্ঠানে তুকতাক মন্ত্র

পড়ার সময় কাজে লাগানো হত। ভেতরে কতকগুলো ছোট ছোট নারীমূর্তিও আছে। লোকে হয়ত ভাবত এই ছোট্ট বাড়িটা ভূতপ্রেতের উপদ্রব ও নানারকম বিপদ-আপদ থেকে সত্যিকারের বড় বাড়িটাকে রক্ষা করবে।

ছোট মডেল-বাড়িটার ঢোকার মুখে ডান দিকে আছে একটা চুল্লী, বাঁ দিকে একটা উঁচু জায়গা — সেখানে আছে বিভিন্ন জিনিসের মজুদ রাখার বড় বড় পাত্র। তার পাশেই একটি নারীমূর্তি যাঁতার ওপর ঝুঁকে আছে। ঢোকার দরজার মুখোমুখি, জানলার ধারে বেদি। চুল্লীর পাশে একটি নারীমূর্তি — গৃহলক্ষ্মী।

এ ধরনের বাড়ি সত্যিকারের বাড়ি বলে অভিহিত হওয়ার অধিকার রাখে। বাড়ির চালার আড়া ছিল। চুল্লীর ওপরে তক্তপোষ — রাশিয়ার গ্রামদেশের চুল্লীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘরের মেঝে শক্ত — পোড়ামাটির তৈরি। মেঝের মাটি পোড়ানোর জন্য বাড়ি বানানোর সময় মেঝের ওপর আগুন জ্বালাতে হয়েছিল। কাদামাটিতে লেপা দেওয়ালে নানা রকম নক্‌শা আঁকা। প্রতিটি বাড়িতে বেড়া দিয়ে আলাদা করা এই রকম কয়েকটি ঘর ছিল।

এ ছাড়া গ্রামে বড় বড় সুড়ঙ্গ-ঘরও দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রামবাসীদের দক্ষ কুমোর, কামার এবং তামার কারিগরও ছিল। কুমোরেরা
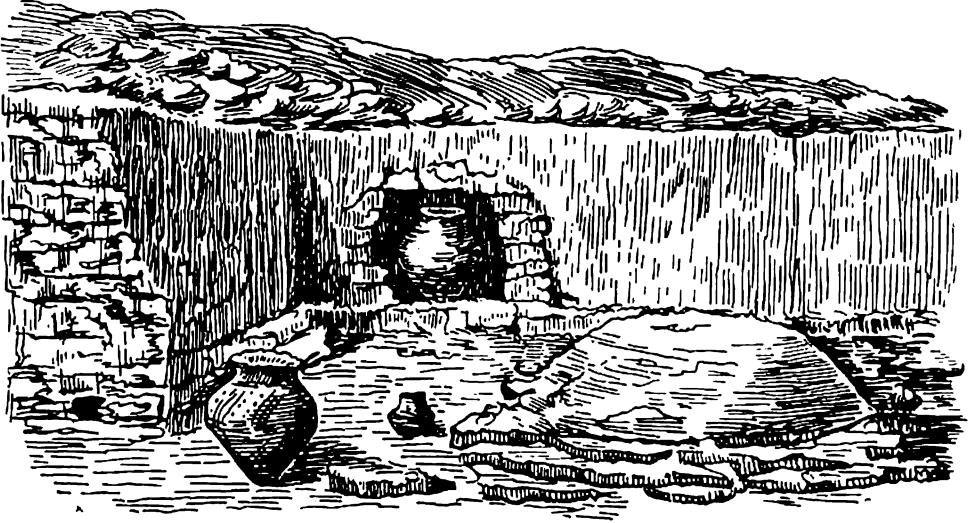
সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাঞ্চলে খননকার্যের ফলে এই প্রাচীন চুল্লীটি পাওয়া গেছে।

তিন ফুট উঁচু পাত্র তৈরি করে সেগুলোর গায়ে বিচিত্র বর্ণের নক্‌শা আঁকতে পারত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা গোলাপী রঙের কিছু মৃৎপাত্র পেয়েছেন যেগুলোর গায়ে ফিতে, সর্পিল রেখা ও কুঞ্চিত রেখার জটিল নক্‌শা আছে। ঐ সমস্ত নক্‌শা জায়গায় জায়গায় কখনও মানুষের মুখ ও ডাগর চোখের, কখনও সূর্যের, কখনও বা পশুর আকৃতির আভাস দেয়।

এককালে যেখানে বসতি ছিল সেখানকার মাটির নীচে যে-সমস্ত হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেগুলো ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলে বুঝতে বাকি থাকে না কি ভাবে পাথরের হাতিয়ার থেকে মানুষ তামার হাতিয়ারের দিকে এগোচ্ছিল। সবচেয়ে পুরানো যে-সমস্ত হাতিয়ার — ছুরি, চাঁছার যন্ত্র, তীরের ফলা — সেগুলো চকমকি পাথর আর হাড়ের তৈরি। লোকে মাটি কোপাত পাথর কিংবা হরিণের শিঙের গাঁইতি দিয়ে। গাঁইতিতে গর্ত করে একটা কাঠের হাতল লাগানো হত। শস্য কাটা হত গোরুর কাঁধের হাড় কিংবা কাঠের কাস্তে দিয়ে। কাঠের কাস্তের নিজের সাধ্য ছিল না শস্যের গোড়ায় দাঁত বসায়। তাকে কাজের উপযোগী করে তোলার জন্য চকমকি পাথরের ধারাল দাঁত গায়ে বসানো হত। ঐ সমস্ত গ্রামেই আবার তামার তৈরি প্রথম হাতিয়ার — চওড়া ধারের কুড়োল ঢালাইয়ের ছাঁচও পাওয়া গেছে।

এমনকি ঠিক কী ধরনের ফসল তখনকার দিনে বোনা হত তাও আমরা জানতে পারি। কলোমিশ্চিনো গ্রামের বাড়িগুলো যে-মাটিতে লেপা ছিল প্রত্নতত্ত্ববিদরা তার মধ্যে গম, যব, রাই ও জোয়ারের দানা ও শীষের সন্ধান পেয়েছেন।

শ্রমপঞ্জী

আমরা বছর, শতাব্দী সহস্রাব্দ ধরে সময়ের হিসাব করতে অভ্যস্ত। কিন্তু যাকে পুরাকালের মানুষের জীবন অনুশীলন করতে হয় তাকে ব্যবহার করতে হয় অন্য দিনপঞ্জী, সময়ের অন্য মাপ। 'এত এত হাজার বছর আগে', বলার বদলে আমরা বলব 'পুরা প্রস্তর যুগে', 'নব্য প্রস্তর যুগে', 'তাম্রযুগে', 'ব্রোঞ্জযুগে'। এটা কালপঞ্জী নয় — এ হল শ্রমপঞ্জী। এই পঞ্জিকার সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে মানুষ তার যাত্রাপথে কোথায়, কোন্ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

সাধারণ বর্ষপঞ্জীতে শতাব্দী, বছর, মাস, দিন, ঘণ্টা — বড় ছোট সব মাপেরই সময় আছে।

লোকে জিনিসপত্র লেনদেনের উদ্দেশ্যে নদীপথে ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করত। প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাহাজের আঁকা ছবি।

শ্রমপঞ্জীতেও তেমনি বড় ছোট মাপ আছে। যেমন ধর বলা যায় 'কুড়োলের আমলের প্রস্তরযুগ' কিংবা 'পালিশ করা হাতিয়ারের আমলের প্রস্তরযুগ'।

এই মুহূর্তে আমাদের এই কাহিনীতে আমরা মানবেতিহাসের এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যখন পাথরের হাতিয়ার ধাতুর তৈরি হাতিয়ারের কাছে পিছু হটেছে, যখন কৃষিকাজ ও পশুপালনের আবির্ভাব ঘটেছে। শ্রমবিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় প্রথাও শুরু হয়েছে। কোথাও তামার কুড়োলের আবির্ভাব ঘটলে তা আস্তে আস্তে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর কাছেও পৌঁছুতে লাগল।

মানুষ এক গ্রাম থেকে শালতি চালিয়ে অন্য গ্রামে এসে শস্যের সঙ্গে চামড়া, কাপড়ের সঙ্গে মাটির পাত্র বিনিময় করতে যেত। কোন গোষ্ঠী তামাতে সমৃদ্ধ, কোনটির বা প্রসিদ্ধি তার কুমোরদের জন্য। কাজেই খুঁটির উপরের বাড়িগুলিতেই অতিথি সমাগম হত। তারা সেখানে আসত তাদের সঙ্গে সওদা বিনিময় করতে। অবশ্য সওদা বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও কৃৎকৌশলও বিনিময় করত।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত বলে মানুষকে ভঙ্গি-ভাষার আশ্রয় নিতে হত। কিন্তু তাহলেও এই সব অতিথিরা চলে যাবার সময় শুধু বিদেশী দ্রব্যই নিয়ে ফিরত না, সেই সঙ্গে অজান্তে শেখা নতুন শব্দও নিত সঙ্গে করে। এই ভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেল। ধ্যান-ধারণাকে ভাষা থেকে পৃথক করা যায় না বলে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধ্যান-ধারণাও মিশে গেল। নিজেদের দেবদেবীর পাশে বিদেশী দেবদেবীও স্থান করে নিল। নানা ধর্মবিশ্বাস মিলে গিয়ে একটি ধর্মবিশ্বাস আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করল; পরযুগে এই ধর্মবিশ্বাস গ্রাস করে নিল সমগ্র জাতিকে।

দেবতারাও পর্যটনে বেরোলেন। নতুন জায়গায় তাঁদের নতুন নামকরণ হলেও সহজেই তাঁদের চিনতে পারা যায়।

পুরাকালের মানুষের ধর্মের আলোচনা করলে আমরা ব্যাবিলনের তামুজ, মিশরের ওসিরিস এবং গ্রীক এ্যাডোনিসের মধ্যে একই দেবতাকে দেখতে পাই। এরা সবই হলেন প্রাচীন কৃষকদের সেই দেবতা যিনি প্রতিবৎসর মরে গিয়ে আবার পুনর্জন্ম লাভ করেন।

কখন কখন আমরা মানচিত্র ধরে দেখিয়েও দিতে পারি দেবতারা কোন পথে ভ্রমণ করেছিলেন। যেমন, এ্যাডোনিস সেমাইটদের দেশ সিরিয়া থেকে গ্রীসে এসেছিলেন। এ্যাডোনিস নামটাই তার প্রমাণ। সেমিটিক ভাষায় এর অর্থ 'মহাশয়'। গ্রীকরা কথাটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে একজনের নাম হিসেবে এটা ব্যবহার করে।

সুতরাং জিনিসপত্র, শব্দ, ধর্মবিশ্বাস সব কিছুর বিনিময় ঘটতে লাগল।

অবশ্য এটা বলা ঠিক হবে না যে বিনিময় সব সময়ে বিনা সংগ্রামে নির্ঝঞ্ঝাটে ঘটত। জোর করে তামা, কাপড়, শস্য নিতে পারলে 'অতিথিরা' বিনিময়ের ধার ধারত না। যে-ব্যবসা ছিল অমনিতেই শঠতার নামান্তর তা এবার প্রকাশ্য রাহাজানিতে

প্রাচীন মিশরে দ্রব্যবিনিময়ের বাণিজ্য।

পরিণত হল। অতিথি ও গৃহস্থরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছোটখাটো যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এর মীমাংসা করে নিত। তা ছাড়া অপরিচিত কাউকে লুঠ কি হত্যা করাকে কেউ পাপ বলে মনে করত না।

অতএব গ্রামগুলো যে দুর্গের মতো দেখাবে তাতে আর আশ্চর্যের কি! গ্রামবাসীরা চারিধারে খুঁটি পুঁতে বাঁধ বেঁধে দিতে লাগল — যেন অতিথিরা হঠাৎ এসে হাজির না হতে পারে।

অন্য গোষ্ঠীর লোককে সবাই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। প্রত্যেক গোষ্ঠী শুধু নিজেদের মানুষ বলে মনে করত, অন্য গোষ্ঠীর কাউকেই মানুষ বলে মনে করত না। তারা নিজেদের 'সূর্যবংশের সন্তান', 'অন্তরীক্ষের মানুষ' — এই সব বলে পরিচয় দিত, আর অপরিচিতদের দিত অপমানকর সব নাম।

আজকের দিনেও অপরিচিতদের সম্বন্ধে প্রাচীন শত্রুতার জের দেখা যায় — আর তাই হল বড় সাংঘাতিক। এখনও অনেক মানুষ আছে যারা অপরিচিতের বিরুদ্ধে শত্রুতা, জাতি-বিদ্বেষ প্রচার করে। তারা শুধু নিজেদেরই মানুষ বলে মনে করে, তাদের মতে অন্যেরা মনুষ্য পদবাচ্য জীব নয়, কোন মনুষ্যেতর জীব হবে।

অপরিচিত, 'বিজাতীয়' অন্য গোষ্ঠীর লোকের প্রতি বৈরী ভাব হল আদিম ভাবধারা ও কুসংস্কারের চিহ্ন মাত্র।

ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে উচ্চ ও নীচ জাতি বলে কোন কিছু নেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়া লোক আছে। শ্রমপঞ্জী অনুসারে একই যুগের মানুষ সবাই সমসাময়িক নয়, সবাই একই যুগে বাস করে না।

সমস্ত জাতিই সমান উন্নত নয়। কেউ বাস করে যন্ত্রের যুগে, কেউ এখনো সেই প্রাচীন কাঠের লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে আর আদিম হাতে চালানো তাঁতে কাপড় বোনে। কেউ কেউ হাড়ের অস্ত্রশস্ত্র বানায় — তারা জানেই না লোহা কাকে বলে।

উন্নত জাতিদের উচিত পিছিয়ে পড়া লোকদের সাহায্য করা। গত কয়েক দশকের মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া আর সুদূর উত্তরের লোকজন এক শতাব্দী এগিয়ে গেছে। অনুন্নতরা উন্নতদের ধরে ফেলছে।

শ্রমপঞ্জী অনুসারে আমাদের দেশের সব মানুষ সমাজতান্ত্রিক যুগের মানুষ। সোভিয়েত দেশের জাতিগুলি ছোট বড় নির্বিশেষে সকলে সমান অধিকার সম্পন্ন।

দুই ধরনের বিধান

জাহাজে চড়ে সমুদ্রে অভিযানের সময় মানুষ শুধু নতুন দেশই নয়, দীর্ঘকালের ভুলে যাওয়া যুগও আবিষ্কার করেছে।

অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার — আর গোটা মহাদেশটা দখল করা — ইউরোপীয়দের পক্ষে বিরাট সৌভাগ্যের কথা।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়াবাসীদের পক্ষে সেটা দেখা দিয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আকারে। ভেবে দেখ, অস্ট্রেলীয়রা শ্রমপঞ্জী অনুসারে অন্য যুগে বাস করছিল। তারা ইউরোপীয় রীতিনীতি বুঝত না, ইউরোপীয় চালচলনের কাছে তারা নতি স্বীকার করতে চায় নি। সেজন্য ইউরোপীয়রা তাদের পেছনে ধাওয়া করে বন্য জন্তুর মতো তাদের হত্যা করেছে। অস্ট্রেলীয়রা তখনও কুঁড়েঘরে বাস করত, অথচ ইউরোপে তখন নগরে নগরে ছিল বিরাট বিরাট অট্টালিকা। অস্ট্রেলীয়রা তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাকে বলে জানত না, অথচ ইউরোপে আর কারও জঙ্গলের হরিণ মারলেই লোককে জেলে পাঠানো হত।

অস্ট্রেলীয়দের কাছে যেটা বিধিসঙ্গত ইউরোপীয়ের চোখে তাই অপরাধ। অস্ট্রেলীয় শিকারীরা এক পাল মেষ দেখতে পেলে উল্লাসধ্বনি করতে করতে সেই ভীত পশুদের ঘিরে তাদের ওপর চারিদিক থেকে বর্শা আর বুমেরাং মারত। কিন্তু এখানেই ঘটনাস্থলে হস্তক্ষেপ করত ইউরোপীয়রা — গর্জে উঠত ইউরোপীয় জোতদারদের বন্দুক।

পশুপালক ইউরোপীয়দের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল ভেড়া। আদিম অস্ট্রেলীয় অধিবাসীর চোখে সেটা হল বরাত জোরের শিকার। 'যে তাকে কিনেছে বা পেয়েছে ভেড়া হল তার' — এ হল ইউরোপীয় আইন। 'যে তাকে শিকার করেছে বন্য জীব হল তার' — সেটা অস্ট্রেলিয়ার আইন।

অস্ট্রেলীয়রা তাদের যুগের আইন মানত বলে ইউরোপীয়রা তাদের গুলি করে মারত। তাদের মানুষ বলে মনে করত না, তারা যেন কতগুলো হিংস্র নেকড়ে কোন রকমে ভেড়ার পালে এসে ছিটকে পড়েছে।

কোন আদিবাসী মেয়ে আলুর ক্ষেত দেখতে পেলেও দু'টি বিধানের সংঘর্ষ উপস্থিত হত। মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে তারা সঙ্গের লাঠি দিয়ে সেই মজার আলু তুলতে আরম্ভ করত। এত খাবার আলু, তাও আবার সব একই জায়গায় পাওয়া এক বিরাট ব্যাপার! সারা মাসে তারা যা না পেত এক ঘণ্টার মধ্যেই পেল তার চেয়ে ঢের বেশি।

কিন্তু এই সৌভাগ্যই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দেখা দিল। বন্দুকের গুলিতে তারা নিহত হল আর আলুর বস্তাসুদ্ধ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল — টেরও পেল না কে তাদের মারল আর কেনই বা মারল এমন করে।

আমেরিকা আবিষ্কারের ফলেও ঠিক এমনি সংঘর্ষ চলেছিল দুই জগতে।

প্রাচীন 'নতুন জগৎ'

ইউরোপীয়েরা আমেরিকা আবিষ্কারের সময় ভাবল এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছে। কলম্বাসকে এই আবিষ্কারের জন্য স্বাগত জানিয়ে বিশেষ প্রতীকচিহ্ন খচিত পোশাকও উপহার দেওয়া হয়েছিল।

অথচ প্রকৃতপক্ষে এই নতুন জগতটাই ছিল এক প্রাচীন জগত। ইউরোপীয়রা নিজেদের অজ্ঞাতসারে বহুকাল-ভুলে যাওয়া অতীতকে পুনরাবিষ্কার করল আমেরিকায়। মহাসাগরের ওপারের নবাগতদের চোখে আমেরিকার আদিবাসীদের রীতিনীতি অসভ্য অবোধ্য বলে মনে হল। আদিবাসীদের ঘরদোর ইউরোপীয়দের মতো নয়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও এক নয় আর চালচলনও আলাদা।

উত্তরাঞ্চলে যে-সব আদিবাসী থাকত তারা পাথর আর হাড় দিয়ে মুগুর আর তীরের ফলা তৈরি করত। লোহা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। কৃষির সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল — তারা ভুট্টা বপন করত। বাগানের ক্ষেতে কুমড়ো, শীম আর তামাক জন্মাত। তবে তাদের প্রধান জীবিকা ছিল শিকার। তারা কাঠের বাড়িতে বাস করত আর উঁচু খুঁটি পুঁতে বেড়া দিয়ে গ্রাম ঘিরে রাখত।

আর দক্ষিণে, মেক্সিকোতে আদিবাসীদের তামার হাতিয়ার ছিল, তারা সোনার গহনা পরত। জিপসাম দিয়ে লেপা, কাঁচা ইটে তৈরি বিরাট বিরাট বাড়ি ছিল তাদের।

সর্বচেয়ে প্রথম ঔপনিবেশিক ও আমেরিকা বিজেতারা তাদের দিনপঞ্জীতে এসবের পুংখানুপুংখ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তবে আচার-ব্যবহারের চেয়ে সহায়-

রেড ইণ্ডিয়ানরা বসবাস করত কাঠের বাড়িতে। তারা তাদের বসতির চারধার উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরত (ষোড়শ শতাব্দীর খোদাইকাজ)।
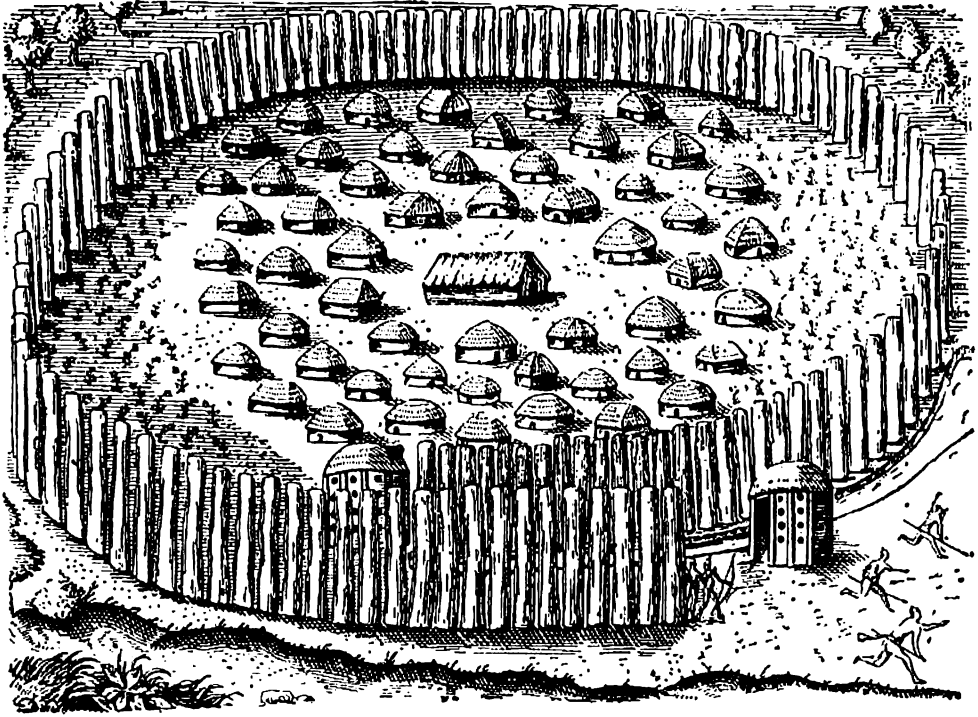
সম্পদ বর্ণনা সহজ। আমেরিকার আচার-ব্যবহার এমন অদ্ভুত যে ইউরোপীয়েরা তার কিছুই বুঝত না। তারা সে-সব কথা অস্পষ্ট এলোমেলো ভাবে বর্ণনা করেছে।

'নতুন জগতে' টাকাপয়সার কারবার ছিল না, ব্যবসা বলতে কিছু ছিল না — ধনী-দরিদ্রও ছিল না কেউ। আদিবাসীদের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী সোনার কথা জানলেও সোনার কদর বুঝত না।

কলম্বাস ও তাঁর সঙ্গী নাবিকরা যে-সব আদিবাসীদের প্রথম দেখেছিল তাদের অনেকের নাকে সোনার গহনা ছিল, কেউ কেউ সোনার হারও পরে ছিল। তবে তারা খুশি হয়েই কাঁচের মালা, সস্তার অলংকার আর কাপড়ের সঙ্গে সে সব বদল করে।

মহাসাগরের ওপারের নবাগতেরা ভাবত যে পৃথিবীর মানুষেরা প্রভু আর দাস, জমিদার ও ভূমিদাস এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু এখানে সবাই সমান। আদিবাসীরা কোন শত্রুকে বন্দী করলে তাকে দাস বা চাকরে পরিণত করত না। হয় তাকে মেরে ফেলত, নয় তাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করত।

এখানে কোন ব্যক্তিগত প্রাসাদ, কুঠি কি তালুক ছিল না। লোকেরা যে সর্বজনিক বাড়িতে থাকত তার নাম দিয়েছিল 'লম্বা বাড়ি'। কুলের সকলে একসঙ্গে বসবাস করত আর কাজকর্মও করত একত্রে। জমিজমা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল না, গোটা গোষ্ঠীরই কর্তৃত্ব ছিল তার উপর। এখানে অন্যের জমিতে চাষ করার ভূমিদাস বলতে কেউ ছিল না, সবাই ছিল স্বাধীন, মুক্ত।

ইউরোপীয়দের হতভম্ব করে দেবার পক্ষে এই-ই ছিল যথেষ্ট। তারা সামন্ত যুগের অধিবাসী — প্রভু ও ভূমিদাসের আমলের লোক। কিন্তু এই-ই সব নয়।

ইউরোপে প্রত্যেকেই জানে সে যদি অন্য কারও সম্পত্তিতে হাত দেয় ত পুলিশ তাকে হাতকড়া পরিয়ে জেলে চালান করে দেবে — অথচ এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, পুলিশ কিংবা জেল বলতেও কিছু নেই। তা সত্ত্বেও নিজস্ব এক ধরনের আইনশৃঙ্খলা এখানে ছিল। জনতাই সে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখত। অবশ্য ইউরোপের কায়দায় নয়।

ইউরোপে গরিব লোকেরা যাতে বড়লোকদের সম্পত্তি কেড়ে নিতে না পারে, যাতে চাকর-বাকররা তাদের মনিবদের বাধ্য থাকে, ভূমিদাসরা জমিদারদের জমিতে বেগার দেয়, রাষ্ট্র সেদিকে নজর রাখত।

এখানে কোন লোককে তার আত্মীয়-কুটুম্ব আর গোষ্ঠীর সঙ্গীরা রক্ষা করত। কেউ নিহত হলে কুলের সকলে একজোট হয়ে তার প্রতিশোধ নিত। কখন কখন আবার এসব ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতেও দেখা গেছে। হত্যাকারীর আত্মীয়-স্বজন এসে ক্ষমা চেয়ে উপঢৌকন পাঠিয়ে দিত নিহতের কুটুম্বদের কাছে।

ইউরোপে ছিল সম্রাট, রাজা, রাজপুত্র। কিন্তু এখানে কোন রাজা ছিল না, রাজসিংহাসন ছিল না। গোষ্ঠীপতিরা সভা করে গোষ্ঠীর সকলকে নিয়ে যত কিছু কাজকর্ম করতেন। কাজের জন্য নেতা নির্বাচিত হত, ভালোভাবে কাজ করতে না পারলেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হত। নেতা সমস্ত দলের প্রভুস্থানীয় ছিলেন না। কোন কোন আদিবাসী ভাষায় 'নেতা' কথাটিরই অর্থ হল 'বক্তা'।

প্রাচীন জগতে রাজা হলেন সরকারের কর্তা, পিতা হলেন সংসারের কর্তা। সমাজের সবচেয়ে বড়ো সংস্থা হল রাষ্ট্র আর ছোটটি পরিবার। রাজা সকলের বিচার করে প্রজাদের শাস্তি বিধান করতেন। পিতা তার সন্তানদের বিচার করত, তাদের

'লম্বা বাড়িতে'। পাইপমুখে লোকটি গোষ্ঠীপতি।

শাস্তিবিধান করত। রাজা তার পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে যান, আর পিতা তার জমিদারীর ভার দেন পুত্রকে।

এখানকার এই নতুন জগতের গোষ্ঠীগুলিতে সন্তানের ওপর পিতার কোন অধিকারই ছিল না। সন্তানেরা ছিল মায়ের দায় — তারা মায়ের সঙ্গেই থাকত। 'লম্বা বাড়িতে' মেয়েরাই সব কাজকর্ম চালাত। ইউরোপের পরিবারে ছেলেরা থাকে সংসারে আর মেয়েরা নীড়ভ্রষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। এখানে উল্টো রীতি— এখানে স্বামী স্ত্রীকে ঘরে আনে না, স্ত্রীই স্বামীকে নিয়ে যায় নিজের সংসারে। মেয়েরাই বাড়ির কর্তা।

নতুন জগতের এক পর্যটক লিখেছেন:

'মেয়েরা সচরাচর সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনা করত, সেজন্য স্বভাবতই তারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়ত। রসদের ভাঁড়ার ছিল সাধারণের সম্পত্তি। কিন্তু যে স্বামী ভালো যোগাড়ে নয় কিংবা তেমন শিকার করতে পারে না তার কপালে দুঃখ আছে। যত ছেলেপুলে আর সহায় সম্বল তার থাকুক না কেন যে-কোন সময়েই তার উপর পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ার হুকুম হতে পারে। সে নির্দেশ অমান্য করে কোন লাভ নেই। তার পক্ষে বাড়িতে টেকা দায় হত। কোন পিসী কি ঠাকুমা তাকে রক্ষা করতে না এলে তাকে নিজের কুলে ফিরে যেতে হবে, নয়ত অন্য কোনও কুলে বিয়ে করতে হবে। মেয়েদের অসীম ক্ষমতা। দরকার হলে তারা তাদের নেতাদের মাথার 'শিঙ্ উপড়ে' ফেলতে অর্থাৎ কিনা তাকে সাধারণ সৈনিকের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করত না। সুতরাং নেতা নির্বাচন সর্বদা তাদেরই উপরে নির্ভর করত।'

প্রাচীন জগতে মেয়েরা পুরুষের পদানত। অথচ নতুন জগতের এই আদিবাসীদের মধ্যে মেয়েরা বাড়ির কর্তা এমনকি গোটা গোষ্ঠীরই ছিল কর্তা। রুশ লেখক পুশকিনের একটি রচনায় কেমন করে জন ট্যানার নামে জনৈক আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে পড়েছিলেন এবং পরে তাঁর ভাগ্যে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। ঘটনাটা সত্যি। অটোয়া গোষ্ঠীর প্রধান নিয়েৎ-নোকু নামে একটি মহিলা তাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছিল। মহিলার নৌকায় নিশান উড়ত; নিয়েৎ-নোকু কোন ইংরেজ বন্দরে এলেই তার সম্মানে তোপ দাগা হত। শ্বেতকায় ও আদিবাসীরা সকলেই তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত।

লোকেরা যে এমন অবস্থায় পিতার বদলে মাতার দিক থেকে বংশ পরিচয় খুঁজবে এতে আর আশ্চর্যের কি? ইউরোপে সন্তানরা পিতার পদবী নেয় আর এখানে তারা মাতৃকুলের পদবী গ্রহণ করত। পিতৃকুলের নাম 'হরিণ' আর মাতৃকুলের

নাম 'ভালুক' হলে সন্তানসন্ততি ভালুককুলের অন্তর্গত হত। মেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়ে, মেয়ের দিকের নাতিনাতনি আর তাদের নাতিপুতি নিয়ে গঠিত হত সে কুল।

ইউরোপীয়রা এসব কিছুই বুঝতে পারত না। তারা আদিবাসীদের এই সব রীতিনীতিকে বলত বন্য, আর তাদের সবাইকে বলত 'অসভ্য'। তারা ভুলে গেল যে প্রথম তীর-ধনুক, প্রথম শালতি, প্রথম কোদালের যুগে তাদের মধ্যেই ঐ একই প্রথা প্রচলিত ছিল।

ঔপনিবেশিক ও বিজেতারা আমেরিকা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে কুলপতিদের রাজা ও সামন্তপ্রভু বলে বর্ণনা করেছে। তারা 'নেতা' শব্দটিকে খেতাব বলে মনে করত — টোটেমের লাঠিটাকে ভাবত কুলমর্যাদার চিহ্ন। তারা নেতাদের সভাকে সিনেট বলে ব্যাখ্যা করত, প্রধান সামরিক নেতাকে রাজা বলে মনে করত। আমরা আজ কোন সেনাপতিকে রাজা বললে যা হয় এও ছিল ঠিক তাই।

কয়েক শতাব্দী ধরে আমেরিকার শ্বেতকায় অধিবাসীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের আচার-ব্যবহার কিছু বুঝে উঠতে পারল না। মর্গান নামে জনৈক আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ তার 'প্রাচীন সমাজ' গ্রন্থটিতে পুনর্বার আমেরিকা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত এমন ভাবেই চলেছিল। মর্গানই প্রথম দেখলেন যে ইরোকুই এবং আজটেকদের কুলের সংগঠন এমন এক স্তরে ছিল ইউরোপ বহু আগে যা পেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু মর্গান ১৮৭৭ সালের আগে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন নি আর আমরা বলছি প্রথম আমেরিকার বিজেতাদের কথা।

শ্বেতাঙ্গরা আদিবাসীদের বুঝত না, আদিবাসীরাও বুঝত না শ্বেতকায়দের। আদিবাসীরা বুঝত না শ্বেতাঙ্গরা কেন সামান্য একমুঠো সোনার জন্য নিজেদের মধ্যে এমন হানাহানি করে। শ্বেতাঙ্গরা কেন আমেরিকায় এলো তাও তারা বুঝত না কিংবা 'বিদেশ জয়' কথাটাও ছিল তাদের কছে অবোধ্য।

আদিম অধিবাসীদের ধারণায় জমিজমা ছিল সমস্ত গোষ্ঠীর সম্পত্তি, কুলদেবতাই রক্ষা করেন সে সব কিছু। অন্যের অধিকারের জমি জোর করে দখল করলে তাদের রক্ষক দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হবে দখলকারীদের ওপর।

আদিবাসীদেরও সময় সময় যুদ্ধ করতে হত। কিন্তু তারা পার্শ্ববর্তী কোন গোষ্ঠীকে পরাজিত করলে তাদের দাসে পরিণত করত না কিংবা নিজেদের জীবন প্রণালী চাপিয়ে দিত না তাদের ওপর। নেতাকেও সরাত না। কেবল পণ দাবি করত। নেতাকে সরানোর অধিকার ছিল কেবল তার নিজের কুলের বা তার নিজের গোষ্ঠীর লোকদের।

মেক্সিকোর রেড ইণ্ডিয়ান পল্লী পুএব্‌লো।

এমনি করে দুই জগতের দুটি জীবনের ধারার মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। আমেরিকা বিজয়ের ইতিহাস হল দুইটি জগতের সংঘর্ষের ইতিহাস।

এই সংঘর্ষের সুন্দর উদাহরণ হল স্পেন কর্তৃক মেক্সিকো বিজয়।

ভুলের পর ভুল

১৫১৯ সালে মেক্সিকোর উপকূলের কাছেই তিন মাস্তুলওয়ালা এগারোটি জাহাজের একটা বহর দেখা গেল। জাহাজগুলোর পেট মোটা, তাদের সামনে আর পেছনটা জল থেকে অনেক উঁচু। চৌকো পাটাতনের ওপর কামান বসানো, ডেক গিজগিজ করছে বর্শা, আর সামরিক বন্দুকে। জাহাজের সমুখে দাঁড়িয়ে চওড়া-কাঁধ, দাড়িওলা, চোখ অবধি টুপি নামানো একজন লোক। তাঁর শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ঢালু উপকূলের ওপর জমায়েত অর্ধনগ্ন আদিবাসীদের জনতার দিকে।

পতাকাবাহী জাহাজের এই লোকটির নাম হেরমান্দো কোর্তেজ। তিনিই

মেক্সিকো বিজয়ের জন্য প্রেরিত অভিযাত্রীদলের অধিনায়ক। সত্য বটে, স্পেনের শাসনকর্তা যে তাঁকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছে, সেই চিঠি আছে তাঁর পকেটে। কিন্তু কোর্তেজের মতো বেপরোয়া দুঃসাহসীর কাছে কর্মচ্যুতির নির্দেশে কী যায়
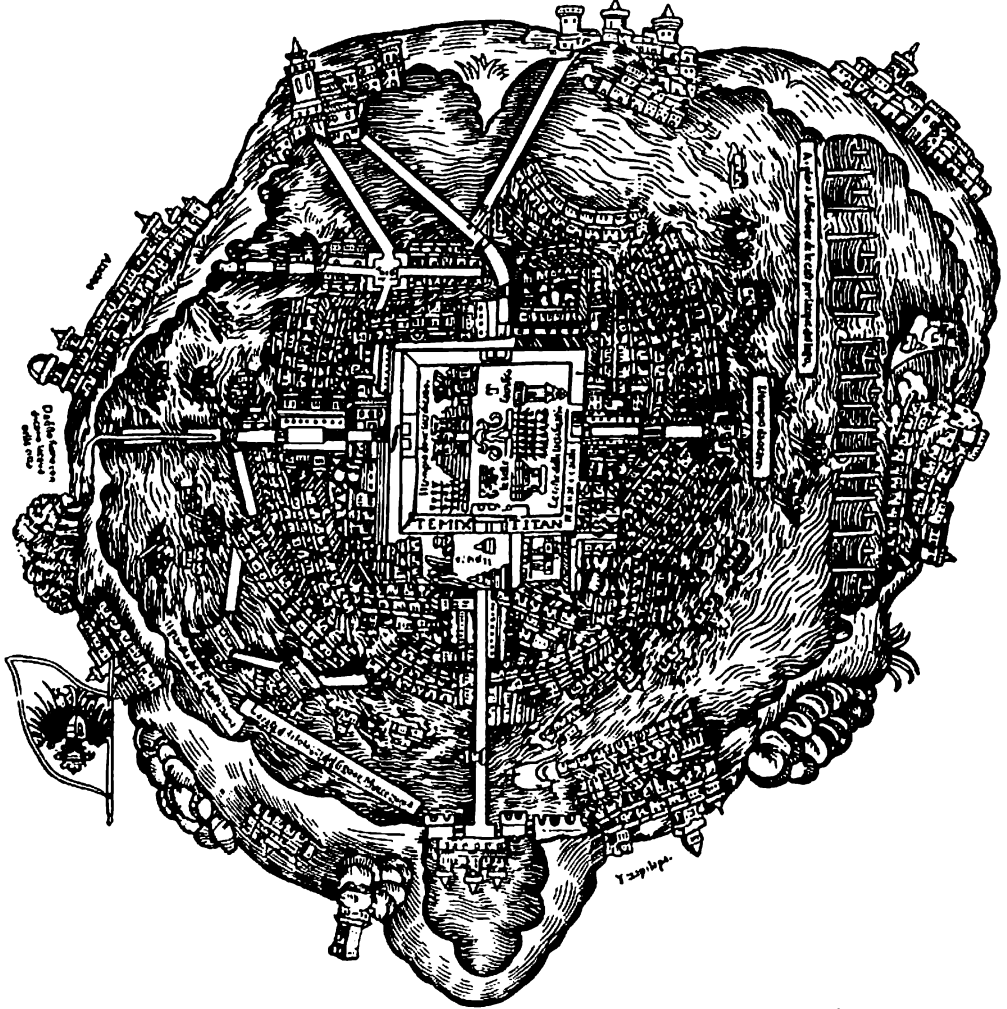
টেনখ্‌টিট্‌লানের পরিকল্পনা।

আসে? স্পেন আর তাঁর মধ্যে অসীম জলরাশির ব্যবধান। এখানে এই জাহাজের মধ্যে তিনি নিজেকে রাজা মনে করলেন।

জাহাজগুলো নোঙর করে ছিল। আসবার সময় দ্বীপের পথে যে-সব আদিবাসী দাসদের কোর্তেজ বন্দী করেছিলেন তারা ভারী ভারী কামান, কামানের গাড়ি, বাণ্ডিল বাণ্ডিল গাদা বন্দুক নামাতে লাগল দাঁড়টানা নৌকায়। ঘোড়াগুলো ভয়ে কম্পমান — পেছনের দুপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের নিয়ে আসা হল ডেক-এ। সবচেয়ে কষ্টকর কাজ ছিল নৌকা থেকে তাদের তীরে নামানো।

আদিবাসীরা অবাক হয়ে সেই সব ভাসমান বাড়ি, সারা শরীর পোশাকে ঢাকা সেই ফেকাসে চামড়ার লোকজন আর তাদের অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। তবে তাদের সবচেয়ে বিস্ময়ের বস্তু ছিল ঐ সব উড়ন্ত কেশরওয়ালা হ্রেষা-ধ্বনিকারী জীব। এমন দানব তারা এর আগে কখনও দেখে নি।

শ্বেতাঙ্গদের আগমন সংবাদ দেখতে দেখতে সারা উপকূলে, দেশের অভ্যন্তরে — পাহাড়-পর্বতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সেখানে এক পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকায় আদিবাসী-পল্লী পুএব্‌লোতে বাস করত আজটেকেরা। এদের সবচেয়ে বড় বসতির নাম টেনখ্‌টিট্‌লান। একটি হ্রদের মাঝখানে ছিল পল্লীটা, সাঁকো দিয়ে ছিল সেটা কূলের সঙ্গে যুক্ত। চক্‌চকে সাদা বাড়ির দেওয়াল আর মন্দিরের সোনার চূড়া অনেক দূর থেকে দেখা যেত। এখানকার সবচেয়ে বড় বাড়িতে আজটেকদের সামরিক নেতা মণ্টেজুমা তাঁর বাহিনীসহ বাস করতেন।

শ্বেতাঙ্গদের আগমন বার্তা পেয়ে মণ্টেজুমা সামরিক নেতাদের বৈঠক আহ্বান করলেন। কী করা উচিত সে বিষয়ে তাঁরা বহুক্ষণ ধরে পরামর্শ করলেন। প্রধান ব্যাপার হল কী জন্য শ্বেতাঙ্গরা এসেছে, কি চায় তারা — সে কথা জানা।

অন্যান্য স্থান থেকে যে জনরব তাদের কানে এসেছে তাতে তারা বুঝেছিল যে শ্বেতকায়রা সোনা ভালবাসে। সুতরাং পরিষদ স্থির করল তাদের কাছে সোনার উপঢৌকন পাঠিয়ে অনুরোধ জানাবে তাদের নিজের দেশে ফিরে যেতে।

এ হল এক সাংঘাতিক ভুল; কারণ সোনা শ্বেতাঙ্গদের লোভ আরও বাড়াল মাত্র। আদিবাসী ও শ্বেতাঙ্গরা দুই বিভিন্ন যুগে বাস করত বলে আজটেকেরা সেকথা জানত না, কিংবা তাদের জানবার কথাও নয় সেটা।

বার্তাবহদের পাঠিয়ে দেওয়া হল তাদের কাছে। তারা গাড়ির চাকার মতো বিরাট সোনার আংটি, সোনার গহনাপত্র, মানুষ আর জীবজন্তুর সোনার প্রতিমূর্তি সঙ্গে নিয়ে গেল। এসব মূল্যবান সামগ্রী তারা মাটির নীচে চাপা দিয়ে রাখলে বরঞ্চ বুদ্ধিমানের কাজ করত।

কোর্তেজ আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা সে সোনা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আজটেকদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। বৃথাই বার্তাবহরা সমুদ্রের ওপারে চলে যেতে অনুরোধ জানাল তাদের, বৃথাই তারা রবাহূত অতিথিদের পাহাড়িয়া অঞ্চলে যাতায়াতের দুঃখ কষ্টের কথা বলে ভয় দেখাতে চেষ্টা করল।

ইতিপূর্বে স্পেনীয়রা জনশ্রুতির মধ্য দিয়ে মেক্সিকোর সোনার কাহিনী শুনেছে, এবার তারা স্বচক্ষে দেখতে পেল তা। তাদের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল; এতদিনকার শোনা কাহিনী তাহলে সত্যি।

দূতদের অনুরোধ হাস্যকর মনে হল তাদের কাছে। লক্ষ্য যখন এত কাছে তখন কিনা ফিরে যাবে সাগর পারে! এ নিছক পাগলামি।

কত কষ্ট না তাদের সহ্য করতে হয়েছে পথে! পাথরের মতো দাঁত ভাঙা শক্ত বিস্কুট খেয়ে তাদের থাকতে হয়েছে, ভিড়করা জাহাজের খোলে ঝোলানো কঠিন

দূতেরা কোর্তেজের কাছে উপঢৌকন নিয়ে এসেছে (মেক্সিকান ছবি)।

বিছানায় শুতে হয়েছে, আলকাতরা মাখানো পালের দড়াদাড়ি নিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে, ঝড়ঝাপ্টা, পাল ওঠানো নামানো — এত সব তারা সহ্য করেছে শুধুমাত্র ঐশ্বর্যের চিন্তায় — যে ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখেছে তারা রাত্রিতে।

কোর্তেজ হুকুম দিলেন তাঁবু তুলে রওনা দিতে। তাঁর লোকেরা গুলিভরা অস্ত্রশস্ত্র আর খাবার-দাবার দাসদের পিঠে চাপিয়ে দিল। মানুষের চেয়ে ভারবাহী পশুর মতো বেশি দেখতে এই দাসরা বোঝার চাপে গোঙাতে গোঙাতে চলতে আরম্ভ করল। পথ না চলে উপায়ই বা কী তাদের? কেউ পিছিয়ে পড়লেই স্পেনীয়রা তলোয়ার দিয়ে তাদের খোঁচাত আর যে যেতে চাইত না তার মাথাই ফেলত কেটে।

সে সময়ের একটা ছবি আজও রক্ষিত আছে; তাতে আজটেকরা নিজেরাই এ অভিযানের ছবি এঁকেছিল। এই ছবিতে আছে তিনটে রাস্তা দিয়ে নেংটিপরা লোকজন কাঁধে বোঝা নিয়ে চলেছে। একজনের পিঠে কামানের চাকা আর একজন নিয়েছে এক বাণ্ডিল গাদা বন্দুক, তৃতীয়জন বাক্সভর্তি রসদ। জনৈক স্পেনীয় অফিসার একজন আদিবাসীর মাথার ওপর মুগুর তুলেছে। সে আদিবাসীটিকে চুলের মুঠি ধরে পেটে বুটের ডগা দিয়ে লাথি মারছে। পাশেই একটা পাহাড়ের গায়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকা।

বিজেতারা নিজেদের সৎ ক্যাথলিক মনে করত। কোন দেশ জয়ে বেরোলেই তারা ক্রুশ নিয়ে যেত। এই ছবিটিতে ধড় থেকে কাটা মাথা, কাটা হাত সব মাটিতে ইতস্তত ছড়ানো পড়ে আছে। এই ভাবে মেক্সিকোর স্বাধীন, মুক্ত আদিবাসীরা প্রথম জানতে পারল মানুষ কীভাবে মানুষকে দাসে পরিণত করে।

এক পা এক পা করে স্পেনীয়রা এগোতে লাগল। অবশেষে এক পার্বত্য পথ থেকে তারা হ্রদ ও তার মধ্যের শহরটিকে দেখতে পেল।

আজটেকরা কোন বাধা দিল না। 'অতিথিরা' শহরে প্রবেশ করল। তারপর প্রথমেই যে কাজ তারা করল তা আর যাই হোক না কোন ভদ্র মোটেই নয়। শহরের শাসনকর্তা বলে পরিচিত সামরিক নেতা মণ্টেজুমাকে তারা বন্দী করল।

কোর্তেজ মণ্টেজুমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হুকুম দিলেন। তাঁকে বলল স্পেনের রাজার অনুগত্যের শপথ নিতে। তারা তাঁকে যা কিছু করতে বলল বন্দী অত্যন্ত বিনীতের মতো তা সব আউড়ে গেলেন; তবে তাঁর বিন্দুমাত্রও কোন ধারণা ছিল না তারা রাজা বলতে কী বোঝে আর তাঁর ঐ শপথেরই বা অর্থ কি।

কোর্তেজ ভাবলেন জয়লাভ হয়ে গেছে। তিনি ভাবলেন মেক্সিকোর রাজাকে তিনি বন্দী করেছেন এবং বন্দী তাঁর সমস্ত ক্ষমতা স্পেনের রাজাকে হস্তান্তরিত

করেছেন। অর্থাৎ সব মীমাংসা হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর হিসাবে বড় রকমের গলতি ছিল। মণ্টেজুমা যেমন স্পেনীয়দের বিষয় কিছুই জানতেন না তিনিও তেমনি আজটেকদের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তিনি মণ্টেজুমাকে রাজা ভেবেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন সামরিক নেতা মাত্র। দেশ দান করবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর।

ডিম পাড়বার আগেই তা গুনতে বসলেন কোর্তেজ; ভাবলেন তাঁর বিজয় লাভ হয়ে গিয়েছে। তিনি যা আশা করতে পারেন নি আজটেকেরা তাই করল। তারা মণ্টেজুমার ভাইকে নতুন নেতা নির্বাচিত করল।

নতুন নেতা গোষ্ঠীর সমস্ত সৈনিককে আহ্বান জানালেন বড় বাড়ি আক্রমণ করতে; বড় বাড়িতে তখন ঘাঁটি গেড়েছিল স্পেনীয়রা।

স্পেনীয়রা তাদের কামান আর গাদা বন্দুক চালাতে লাগল। আজটেকেরা ছুঁড়তে লাগল পাথর আর তীর। পাথর আর তীরের তুলনায় কামানের গোলা
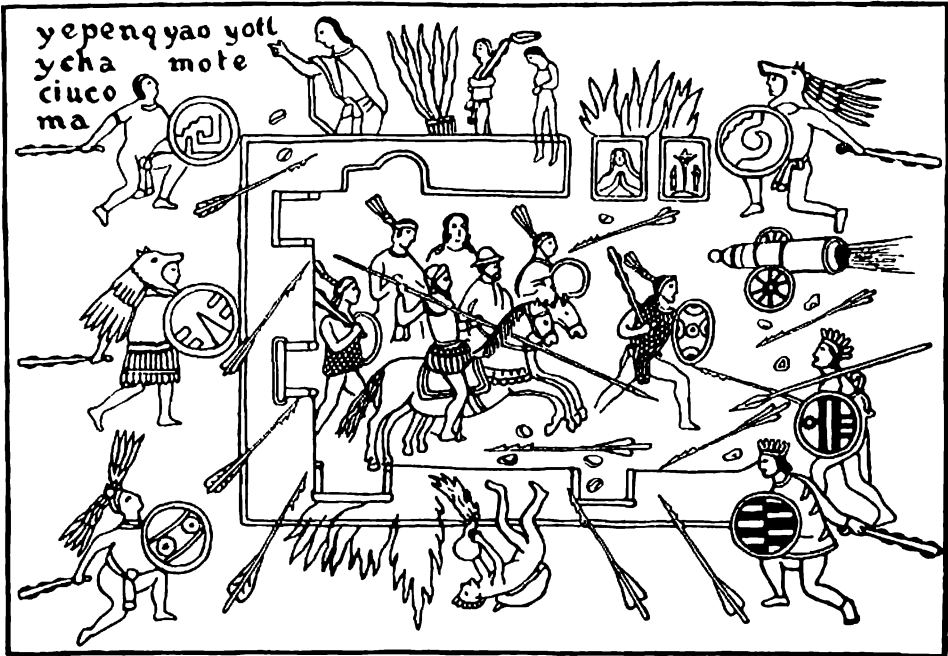
মণ্টেজুমা বাড়ির ছাদে উঠে অধিবাসীদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন (সেকালের আঁকা ছবি)।

স্পেনীয়রা রেড ইণ্ডিয়ানদের ধরে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে।

আর বন্দুকের গুলির ক্ষমতা ঢের বেশি, তবে কিনা আজটেকরা করছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, কিছুই তারা পরোয়া করল না। দশজন নিহত হলে একশজন এসে তাদের স্থান গ্রহণ করে। তাদের লড়াই হল ভ্রাতৃহত্যার পরিশোধ নেবার সংগ্রাম, গোষ্ঠীভুক্তের হত্যার প্রতিশোধেরই লড়াই। কোন কুলের এবং কুলের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র গোষ্ঠীরও বিপদ ঘটলে আজটেকরা নিজের প্রাণের পরোয়া করত না এতটুকু।

গতিক খারাপ দেখে কোর্তেজ আজটেকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ভেবেচিন্তে মণ্টেজুমাকেই মধ্যস্থ হিসাবে নিয়োগ করা স্থির করলেন। মণ্টেজুমা তাদের রাজা; তিনি যেন তাঁর প্রজাদের অস্ত্র ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন।

তারা মণ্টেজুমার শৃঙ্খল খুলে দিল। মণ্টেজুমা বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু লোকজন তাঁকে ভীরু বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করল। পাথর আর তীর দিয়ে

অভিনন্দিত হলেন তিনি। চতুর্দিক থেকে রব উঠল: 'এই অকর্মা! তোর মুখে কোন কথা সাজে না। তুই মোটেই সৈনিক নস্! তুই হলি মেয়েমানুষ — সুতো কাটা আর কাপড় বোনাই হল তোর কাজ! তা নইলে ঐ কুকুরগুলো তোকে বন্দী করে রাখে। ভীরু কোথাকার!'

মণ্টেজুমা গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেলেন।

বেষ্টনকারীদের ব্যূহভেদ করে বেরোতে কোর্তেজকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তাঁর সেনাদের অর্ধেক নিহত হল। সৌভাগ্যের কথা, আজটেকরা তাঁকে অনুসরণ করে নি। তাহলে আর তাঁকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হত না।

কোর্তেজকে পালাতে দিয়ে আজটেকরা আরেক ভুল করল। তিনি তখন আর একটি বাহিনী নিয়ে ফিরে এসে টেনখ্‌টিট্‌লান অবরোধ করলেন। আজটেকরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে কয়েকমাস ধরে আত্মরক্ষা করল; কিন্তু কামানের সম্মুখে তীর-ধনুক কী করবে? টেনখ্‌টিট্‌লান দখল হল, দখলের পর ধ্বংস হল।

লৌহযুগের মানুষ তাম্রযুগের মানুষকে পরাজিত করল। নতুন বিধানের প্রথার আক্রমণে প্রাচীন বিধান লোপ পেল। ইতিহাসের গতি ছিল কোর্তেজের পক্ষে।

সপ্তযোজন পাদুকা

বিগত শতাব্দীর কোন এক লেখক একটি লোকের কাহিনী বর্ণনা করেন। লোকটি সৌভাগ্যবশত বাজারে সাধারণ জুতো না কিনে এক সপ্তযোজন পাদুকা কিনে ফেলেছিলেন। রূপকথার নায়কটি ছিলেন আনমনা। তখন তখনি তিনি তাঁর ভুল ধরতে পারেন নি। বাজার করে তিনি গম্ভীরভাবে কী যেন ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ তাঁর খুব ঠাণ্ডা লাগতে আরম্ভ করল। তিনি চারিদিকে তাকালেন। দেখলেন শুধু বরফ আর বরফ, দূরে দিগন্তের নীচে ম্লান সূর্যের ছবি। ব্যাপার এই যে, সপ্তযোজন পাদুকা তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁকে সুমেরুতে এনে ফেলেছে।

তাঁর জায়গায় অন্য কেউ হলে এই অলৌকিক সৌভাগ্য থেকে যত বেশি পারা যায় লাভ ওঠানোর চেষ্টা করত। কিন্তু গল্পের নায়কটির টাকার উপর কোন লোভ ছিল না। তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানের, তাই তিনি এই সৌভাগ্যের সুযোগ নিয়ে সারা পৃথিবী পর্যটন ও অনুশীলন করা স্থির করলেন। ঐ জুতো পরে তিনি উত্তর থেকে দক্ষিণ, আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে, এমনি করে গোটা পৃথিবী টহল দিতে আরম্ভ করলেন। কখন হয়ত শীত তাঁকে সাইবেরিয়ার জমাট প্রান্তর থেকে খেদিয়ে নিয়ে এলো আফ্রিকার মরুভূমিতে। রাত্রি তাঁকে বাধ্য করল ভূমণ্ডলের পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমে যেতে।

জীর্ণ কালো কোট পরে, সংগ্রহগুলো বয়ে আনবার জন্য বগলে বাক্স নিয়ে মাঝের দ্বীপপুঞ্জগুলিকে তিনি পা-রাখবার জায়গার মতো ব্যবহার করে পাড়ি জমালেন অস্ট্রেলিয়া থেকে এশিয়ায় আবার এশিয়া থেকে আমেরিকায়।

সাবধানে এক শৃঙ্গ থেকে অন্য শৃঙ্গে পা রেখে রেখে, কখন অগ্নিস্রাবী আগ্নেয়গিরির মধ্য দিয়ে, কখন বরফে ঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়ে তিনি খনিজ দ্রব্য এবং ঘাস সংগ্রহ করলেন, দেখতে লাগলেন যত প্রাচীন মন্দির আর গুহা, পরীক্ষা করলেন জগৎটাকে আর যত কিছু আছে এই জগতে।

মানুষের জীবন কাহিনী যিনি অধ্যয়ন করেন সেই ইতিহাসবিদকেও অমন

সপ্তযোজন পাদুকা পরতে হয়। এই বই-এর পৃষ্ঠায় আমরা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে গিয়েছি, এক যুগ থেকে গিয়েছি অন্য যুগে।

কখন কখন হয়ত স্থান ও কালের বিশাল ব্যাপ্তিতে আমাদের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠেছে, কিন্তু আমরা তবু থামি নি। সাধারণ জুতো পরে মানুষ যেমন করে আমরা তেমন করে থেমে থেমে খুঁটিনাটি বিচার করতে পারি নি।
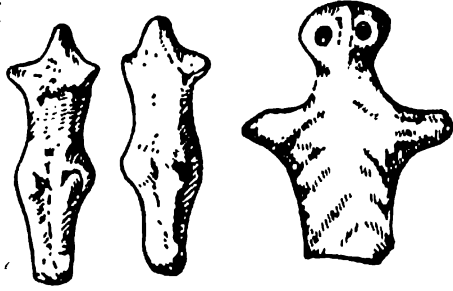
মাটির তৈরি নারী মূর্তি — গৃহলক্ষ্মী (প্রস্তরযুগ)।

এক লাফে শতাব্দী পার হবার সময় আমরা হয়ত দু-একটা জিনিসের আভাস মাত্র পেয়েছি কিন্তু তখন যদি আমরা সপ্তযোজন পাদুকা খুলে মিনিট খানেকের জন্যও সাধারণ জুতো পরতাম, তাহলে খুঁটিনাটির হাত এড়িয়ে আসতে পারতাম না। জঙ্গলের মধ্যে প্রত্যেকটা গাছ পরীক্ষা করতে লাগলে আর তুমি গাছের আড়াল কাটিয়ে জঙ্গলটাকেই দেখতে পাবে না।

সপ্তযোজন পাদুকা পরে আমরা শুধু যুগ যুগান্তর পার হই নি, এক বিজ্ঞান থেকেও গিয়েছি অন্য বিজ্ঞানে।

গাছপালা জীবজন্তুর বিজ্ঞান থেকে আমরা ঢুকেছি ভাষার বিজ্ঞানে, ভাষাবিজ্ঞান থেকে যন্ত্রপাতির ইতিহাসে, সেখান থেকে ধর্মের ইতিহাসে, পরে ভূমণ্ডলের ইতিহাসে।

স্বভাবতই এ তেমন সোজা কাজ নয়। তবু আমরা তা এড়াতে পারি নি। মানুষই মানুষের জন্য যত বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে মানুষের গোটা জীবন আর সেখানে তার অবস্থান নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন এদের সকলেরই দরকার হয়ে পড়ে।

এইমাত্র আমরা কোর্তেজের যুগের আমেরিকায় ছিলাম। এবার খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর ইউরোপে ফেরা যাক। সেখানেও ইরোকুই ও আজটেকদের মতো কুল দেখতে পাব। সেখানেও দেখতে পাব সাধারণের 'লম্বা বাড়ি', যেখানে মেয়েদেরই ছিল রাজত্ব।

নগরলক্ষ্মী।

তারা সংসারে মেয়েদেরই উ'চুতে দেখে, কারণ তারাই হল গৃহনির্মাতা আর কুলপ্রধান। তারা শীতকালে ভাঁড়ারের তদারক করে। চাষের জমি খোঁড়ে আর ফসল তোলে ঘরে।

মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশি কাজ করে বলেই তাদের উচ্চাসন দেওয়া হয়। সে-যুগে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক বাড়িতে পাথর কি হাড়ে খোদাই মেয়েদের মূর্তি দেখা যেত। ইনি হলেন আদিম মাতা যাঁর থেকে এই কুলের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর আত্মাই গৃহ রক্ষা করে। সবাই তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায় রুটির জন্য, শত্রুর হাত থেকে ঘর সংসার নিরাপদ করবার জন্য।

কিছুকাল পরে বাড়ির রক্ষাকর্ত্রী মাতা এথেনার রূপ নিলেন। দেবীর হাতে বর্শা — তিনি নগরলক্ষ্মী — নগর রক্ষা করেন। এখন আর সেই নারীমূর্তি ছোট নয় — তাঁর নামে যে (এথেন্স) নগর, তার দ্বারপথে তাঁর অতিকায় মূর্তি রক্ষা করত নগরটিকে।

প্রাচীন দালানে ফাটল ধরল

আমাদের ভাষায় এখনও কুলতন্ত্রের কিছু কিছু চিহ্ন আছে, তবে আমাদের আর তা মনে নেই ।

বড়রা অনেক সময় 'বন্ধু' না বলে বলেন ভাই, অপরিচিত ছোট ছেলের সঙ্গে

কথা বলবার সময় আমরা তাকে ছেলে বলেই সম্বোধন করি। অপরিচিতা বয়স্কা মহিলাকে আমরা 'মা', 'পিসি' বলি কিংবা বয়োবৃদ্ধদের 'দাদু-দিদিমা' বলি। এসবই হল সেই প্রাচীন সমাজব্যবস্থার জের যেখানে সকলেই ছিল কুলসম্পর্কে সকলের আত্মীয়।

জার্মান ভাষায় নেফিউ (Nephew) বলতে 'বোনের ছেলেমেয়ে' বোঝায়। তার কারণ বোনের ছেলেমেয়েরাই তখন গোষ্ঠীতে থাকত। ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা ছিল অন্য গোষ্ঠীর, তার স্ত্রীর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বোনের ছেলেমেয়েদের কুটুম্ব 'ভাগ্নে ভাগ্নী' বলা হত, কিন্তু ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা অন্য কুলের বলে তাদের কুটুম্ব বলা হত না।

প্রাচীন সাক্‌স রাজ্যে রাজার ছেলে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হত না, উত্তরাধিকারী হত রাজার ভাগ্নে। বিগত শতাব্দীতেও আফ্রিকায় আশান্তি নামে একটি রাজ্য ছিল যেখানকার রাজাকে বলা হত 'নানে' যার অর্থ 'মাতামহী'। মধ্য এশিয়ার সমরখন্দে রাজাকে বলা হত 'আফশিন' — পুরাকালে যার অর্থ ছিল 'গৃহকর্ত্রী'। মাতৃকুলের তথা মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্মৃতি যে কতকাল আমাদের টিকে ছিল তার ঝুড়ি ঝুড়ি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

আমরা নিজেদের অজান্তে এখনও যে-সব কথা স্মরণ করি তা থেকে স্পষ্টই বুঝতে হবে গোষ্ঠীব্যবস্থা ছিল ভীষণ শক্তিশালী। কিসে ভাঙল সেটা?

আমেরিকায় ইউরোপীয় বিজেতারা এসে সেটা ভেঙে দেয়। ইউরোপে আমেরিকা আবিষ্কারের হাজার হাজার বছর আগে ঘুণে-ধরা ঘরের মতো সে ব্যবস্থা আপনা-আপনি লোপ পেয়েছে।

পুরুষরা যখন থেকে ক্রমেই বেশি বেশি করে সংসারের কাজকর্ম দেখতে লাগল তখন থেকে ধ্বংসের সূত্রপাত।

স্মরণাতীত কাল থেকে মেয়েরা মাটি খুঁড়েছে আর পুরুষ করেছে পশুচারণ। যখন পশুর সংখ্যা ছিল কম তখন মেয়েদের কাজ চাষবাসই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তারা কদাচিৎ মাংস খেত, আর সকলের জন্য দুধও প্রচুর মিলত না তাদের। মেয়েরা যদি তখন শস্য না কুড়োত, তাহলে সকলের মতো খাওয়াই জুটত না তাদের সংসারে। সে যুগের আহার বলতে প্রায়ই বোঝাত একখানা ছোট ওটের রুটি, নয়ত একমুঠো চাল। এর সঙ্গে থাকত জংলা মধু, জংলা ফলমূল। তাও মেয়েদেরই সংগ্রহ করা। মেয়েরাই সংসার দেখাশোনা করত, তাই তারা ছিল সব কিছুর কর্তা।

তবে সর্বত্র এবং সর্বকালে এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। স্তেপ-সমভূমিতে ভালো

ফসল হত না। সেখানকার ঘাস শস্য চাপা দিয়ে মারত। তার শক্ত শেকড় মাটি আঁকড়ে থাকত। কোদাল নরম মাটির বদলে খুব শক্ত ঘাসের চাপে এসে বসত; মাটির চাপ ভাঙা কঠিন হয়ে উঠত।

দু-তিন জন মেয়ে একত্রে মিলে কোদাল চেপে ধরত, তবুও তারা জমির ওপর আঁচড় কাটা ছাড়া আর কিছু করতে পারত না। এই সব অগভীর জমিতে চাষ করে বীজ ছড়ালে তা রোদে পুড়ে যেত নয়ত পাখিতে খেয়ে ফেলত। শস্য হয়ত ফলত তবে তা হত বিরল ও অপ্রচুর। তার ওপর অনাবৃষ্টি ত ছিলই — তাতে শস্য যেত পুড়ে অথচ শুকনো আবহাওয়ায় অভ্যস্ত স্থানীয় শক্ত ঘাস থাকত পড়ে — তার কোনই ক্ষতি হত না।

ফসল কাটার সময় এলে কোন ফসলই নজরে পড়ত না। আগাছার মধ্যে থেকে শস্যের গাছ চেনার সাধ্য হত না। হাওয়ায় স্তেপের ঘাস দুলতে থাকত, মনে হত যেন বিতাড়িত শত্রু বাহিনী আবার ফিরে এসেছে, তার নিশান উড়ছে।

শস্যের বদলে বুনো ঘাস! এত খাটাখাটুনি কি পোষায় তাতে?

কিন্তু মানুষের কাছে শস্যের যা দাম — ঘাস হল পশুর কাছে তাই। স্তেপের ঘাস খেয়েই গোরুভেড়া বেঁচে থাকত। সর্বত্রই তাদের চমৎকার চারণভূমি — তাই বছর বছর তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। কোমরে ছোরা গুঁজে মানুষও গোরুভেড়ার পিছু নিল। রাখালের সেই বিশ্বস্ত বন্ধু কুকুর তাকে পশুপালনে সাহায্য করল। গোরুভেড়ার দল যাতে তৃণভূমির মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে কুকুর নজর রাখত। পশুর পাল বাড়তে লাগল, আর বেশি বেশি করে দুধ মাখন পশম দিতে লাগল।
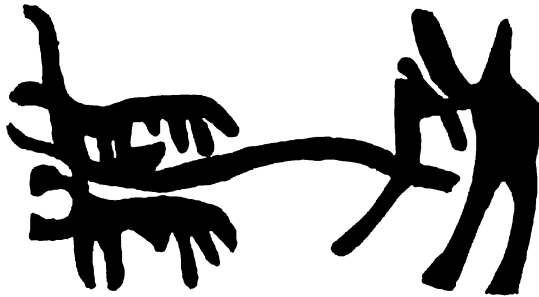
সুইডেনে শিলাগাত্রে আঁকা ছবি — হলধর।

সংসারে শস্য ছিল কম; কিন্তু ভেড়ার পনীর ছিল প্রচুর, সুস্বাদু ভেড়ার মাংস রান্না হত হাঁড়িতে।

সমভূমিতে পুরুষের কাজ পশুপালনই হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু অচিরেই উত্তরাঞ্চলেও পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের কোণঠাসা করে ফেলল।

সুইডেনের এক পাহাড়ে একটি লাঙ্গলধারী কৃষকের ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা কাঁচা হাতের আর কুৎসিত দেখতে। ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির মতো দেখায় সেই কৃষককে। তবে ছবিটি ভালো আঁকা হয়েছে কিনা তা নিয়ে আমাদের তত দরকার নেই। আমাদের কাছে এটা ছবি নয়, এ হল এক সাক্ষী। আর সেই সাক্ষী পরিষ্কার বলছে যে লাঙ্গলধারী ব্যক্তিটি বলদে টানা কাঠের লাঙ্গলের পেছন পেছন চলেছে।

মানবজাতির ইতিহাসে এটাই প্রথম লাঙ্গল। এটা দেখতে অনেকটা গাঁইতির মতো। তফাতের মধ্যে এই যে একটা লম্বা লাঠি লাগানো আছে এর সঙ্গে এবং মানুষের বদলে বলদে টানে সে লাঙ্গল। এই পথেই মানুষ প্রথম স্থলযান আবিষ্কার করল। কারণ লাঙ্গলের সঙ্গে জোড়া বলদই জীবন্ত মোটর, ধাতুর কলের লাঙ্গলের ঠাকুর্দা। মানুষ বলদের ঘাড়ে জোয়াল দেবামাত্র সে নিজের কাজ বলদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। গবাদিপশু আগে শুধু তাদের মাংস, দুধ আর চামড়া দিত, এখন তারা শ্রমশক্তিও দিতে লাগল তাকে।

মন্থরগামী শক্তিশালী বলদগুলো কাঁধে কাঠের জোয়াল নিয়ে জমির ওপর দিয়ে লাঙ্গল টেনে নিত। গাঁইতির চেয়ে লাঙ্গল অনেক গভীর দাগ কাটত মাটিতে। চষা জমিটা দেখাত যেন লম্বা কালো এক ফালি ফিতের মতন।

আদি কালের কৃষক সমস্ত জোর দিয়ে লাঙ্গলের হাতল চেপে ধরত। এবারে বলদকে সে কাজ করতে হল তার সমস্ত শক্তি দিয়ে। মানুষ তাকে দিয়ে লাঙ্গল দেওয়ানো, শস্য মাড়াই আর মাল টানা ইত্যাদি সব কাজই করাল। হেমন্তে সে তাকে মাড়াই-এর জায়গায় নিয়ে এসে শস্যের উপর দিয়ে চালিয়ে দিত। শস্যের ছড়া থেকে শস্যগুলো পায়ের চাপে চাপে আলাদা করা ছিল তার কাজ। তারপর ভারী একটা চাকা ছাড়া টানা গাড়ির সঙ্গে তাকে জুতে দিয়ে মাঠ থেকে বস্তাবন্দী শস্যের দানা ঘরে তুলে আনত।

পশুপালন কৃষি কাজের সাহায্য করল। পশুপালক পুরুষই হল আবার লাঙ্গলধারী কৃষক। আর তাতেই সংসারে তার কর্তৃত্ব গেল বেড়ে।

অবশ্য এটা ঠিক যে মেয়েদেরও তখন প্রচুর কাজ ছিল। তাকে সুতো পাকানো, কাপড় বোনা, ফসল কাটা, ছেলে রাখার কাজ করতে হত। তবে আগের মতো
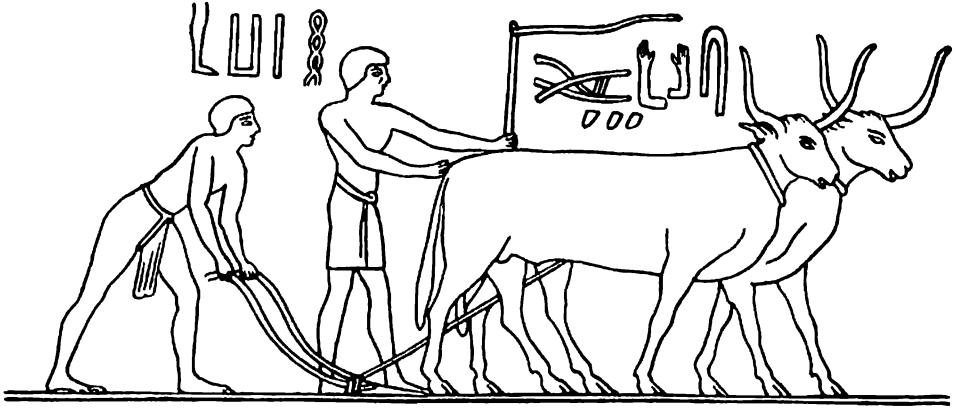
বলদ দিয়ে জমি চাষ করা হত (মিশরীয় ছবি)।

সম্মান তার আর রইল না। ময়দানে কি কৃষিক্ষেত্রে পুরুষই প্রধান স্থান গ্রহণ করল।

বাড়িতে পুরুষদের ওপর মেয়েদের চোটপাট কমে গেল। পুরুষেরা আত্মরক্ষার স্তর থেকে এগিয়ে গেল আক্রমণকারীর পর্যায়ে। আগে শাশুড়ী, পিসীমাসী, ঠাকুরমার পক্ষে কোন নতুন লোককে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এমন কিছু ছিল না। এখন তারা তাকে খাতির যত্ন করতে শুরু করল, কেননা অন্য কুল থেকে এসে লোকটি তাদের সকলের জন্য খাটবে আর খাওয়াবে গোষ্ঠীর সকলকেই। তারপর কোন কুলও আবার তাদের পুরুষদের কুলছাড়া করতে চাইত না।

গোষ্ঠীতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার উদ্দেশ্যে পুরুষেরা তাদের নিজেদের মধ্যে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হল। আগেকার দিনে কোন লোক মারা গেলে তার সম্পত্তির অধিকারী হত তার ভাগ্নে-ভাগ্নীরা। এখন পুরুষেরা এই প্রথা বদল করার জন্য উঠে-পড়ে লাগল।

আফ্রিকার যাযাবর টুয়ারেগদের মধ্যে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি 'ন্যায়সঙ্গত' ও 'অন্য' উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। 'ন্যায়সঙ্গত' উত্তরাধিকার বর্তায় ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ওপর — অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি তার মা'র কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যা যা পেয়েছে এবং গৃহস্থালিতে শ্রমের দ্বারা যা কিছু অর্জন করেছে সে সমস্তই পাবে তার ভাগ্নে-ভাগ্নীরা। 'অন্যেরা' অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ছেলেপুলেরা পাবে তার যুদ্ধে অর্জিত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা সঞ্চিত বিষয়সম্পত্তি।

হাজার হাজার বছর ধরে টিকে ছিল এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু অবশেষে ফাটল ধরতে শুরু করল প্রাচীন রীতিনীতিতে, যেমন ভাবে ফাটল ধরে প্রাচীন ওক গাছে। মানুষ ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রাচীন আচার-নিয়ম ভাঙতে লাগল। আগে স্ত্রীরা স্বামীকে ঘরে আনত, এখন স্বামীরাই স্ত্রীকে ঘরে আনতে আরম্ভ করল।

প্রাচীন প্রথার বিরোধী বলে যে একাজ করত তাকে সবাই অপরাধী বলে ভাবত। বর কনেকে সঙ্গে করে নিজের বাড়ি আনতে পারত না; চুরি করে, জোর করে ধরে নয়ত ঠকিয়ে নিয়ে আসতে হত তাকে নিজের বাড়িতে।

আঁধার রাতে বর আর তার আত্মীয় কুটুম্বেরা বল্লম আর ছোরা-ছুরি নিয়ে লুকিয়ে পছন্দমতো কনের বাড়ির কাছে যেত। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে জাগিয়ে তুলত সবাইকে। কনের পক্ককেশ বৃদ্ধ ঠাকুর্দা থেকে আরম্ভ করে গোঁপ না ওঠা ছোট ভাইরা পর্যন্ত অস্ত্র তুলে নিত। পুরুষদের সিংহনাদে মেয়েদের কান্নার রোল চাপা পড়ে যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কনেকে কোলে করে বর পালিয়ে আসতে সমর্থ হত, গোটা গোষ্ঠী তাকে পাহারা দিতে দিতে আসত তার পেছনে।

বছরের পর বছর কাটল। প্রথমে যেটা আচার লঙ্ঘন বলে মনে হত তাই শেষে আচারের রূপ গ্রহণ করল। বর কনের দুই দলের লড়াই হয়ে দাঁড়াল মিলন মধুর উৎসব। রক্তাক্ত যুদ্ধের বদলে শুরু হল যৌতুক দান। কনের মা-বোন ও সইদের কান্নাও উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল, সকলের শেষে রইল ভোজ।
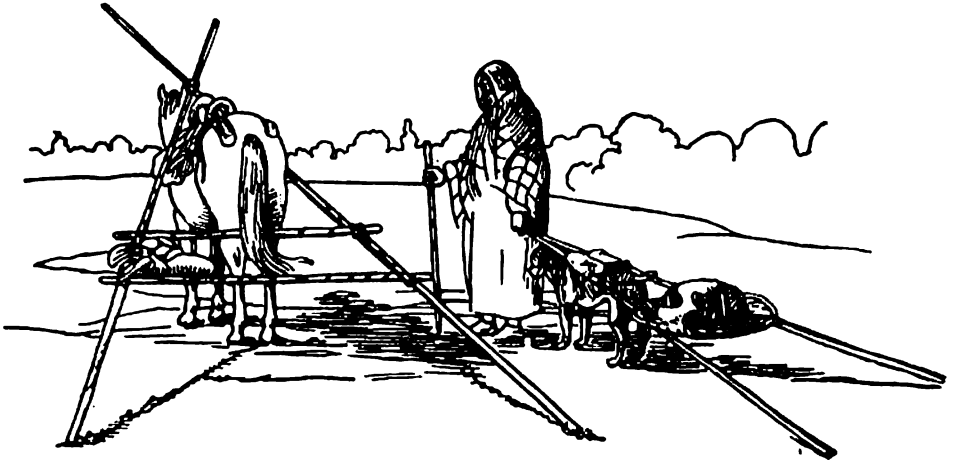
কানাডার রেড ইণ্ডিয়ানদের জমিতে মই দেওয়ার পদ্ধতি।

অন্য সংসারে যাওয়ার সময়ে প্রাচীনকালের কনের করুণ বিলাপ চলে আসছে আজ পর্যন্ত।

আর সত্যিই এ ভাগ্যে কারও ঈর্ষা হবার কথা নয়। নতুন সংসারে মেয়েরা স্বামীর পদানত হল। সেখানে এমন কেউ নেই যার কাছে সে তার অভিযোগ জানাতে পারে; কারণ তার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামীর যত আত্মীয় স্বজন তারা সকলেই স্বামীর দলের। তারা কনেকে বাড়ির একজন অতিরিক্ত দাসী বলে মনে করত, সবাইকার লক্ষ্য থাকত যেন সে গতর খাটিয়ে পেট ভরায়, হাত গুটিয়ে বসে না থাকে। মাতৃপ্রধান কুল বাতিল করে পিতৃপ্রধান কুল প্রতিষ্ঠিত হল।

সন্তান-সন্ততিরা এখন আর মায়ের কাছে থাকে না, তারা থাকে বাবার কাছে। বংশক্রম মায়ের দিক থেকে না ধরে পিতার দিক থেকে ধরা হতে লাগল। কোন কোন জায়গায় নিজের আর কুলের নামের ওপরেও একটা বেশি নাম নিতে হল সকলকে — 'অমুকের ছেলে'।

সে-আমল থেকে রুশদেশে একটা রীতি এখনও চলে আসছে — পিতৃনাম — লোকজনকে পিতার নামে ডাকা। যেমন 'পিওতর ইভানভিচ' অথবা পুরাকালে তারা যেমন বলত 'ইভানের পুত্র পিওতর'।

প্রথম যাযাবর

যে আজব ভাণ্ডার মানুষ আবিষ্কার করেছিল তা থেকে সে ক্রমেই বেশি বেশি করে রসদ সংগ্রহ করছিল। হাজার হাজার ভেড়া মাঠে-ময়দানে আর সমভূমিতে চরে বেড়াত। কৃষিক্ষেত্রে লাঙ্গলধারীরা পিছিয়ে পড়া বলদকে হাঁকডাক করে নরম কালো মাটির বুকের ওপর দিয়ে জোরে জোরে চালিয়ে নিয়ে যেত।

উর্বর উপত্যকার প্রথম বাগিচা আর দ্রাক্ষাকুঞ্জে ফুল আর ফল ধরতে শুরু হল। সন্ধ্যেবেলা লোকজন ডুমুর গাছ তলায় এসে জমতে লাগল।

কাজ করে মানুষ ক্রমেই বেশি খাবার আহরণ করল বটে তবে তাকে খাটতেও হচ্ছিল বেশি। প্রত্যেকটি আঙুরের থোকা ও গমের দানার সঙ্গে মানুষের পরিশ্রমও যুক্ত ছিল।

ধর না কেন, আঙুরের জন্যই কত কাজ করতে হত মানুষকে! ভারী ভারী থোকাগুলো পেড়ে আনার পরে যাঁতায় ফেলে তা পিষতে হবে। রক্তের মতো রস ঝরে জমা হত ছাগলের চামড়ার বোতলে। লোকজন মদের বন্দনা গান করত —
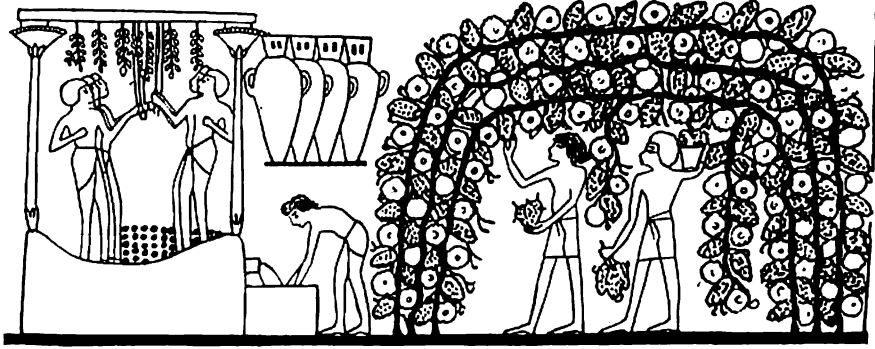
আঙুরের ভারী থোকা সংগ্রহ করার পর যাঁতাকলে ফেলা হচ্ছে (মিশরীয় ছবি)।

ছাগচর্মাবৃত এক সুন্দর দেবতার স্তবস্তুতি করত — কত দুঃখ কষ্ট তাকে সইতে হয়েছে!

নদীর নীচু জমিতে যেখানে বছর বছর বন্যা এসে বানের পলিমাটি দিয়ে জমি উর্বর করে দিয়ে যেত সেখানে প্রকৃতি যেন স্বয়ং শস্যের তদারকির ভার নিতেন।

এখানেও কিন্তু কৃষকের খাটুনির রেহাই ছিল না। সে খাল কেটে ক্ষেতে জল আটকে রাখত, যেখানে জলের খুব দরকার সেখানে বাঁধ বেঁধে জল আটকাত।

নদী তাদের জমিকে উর্বর করত; তাই মানুষ তার কাছে জানাত প্রার্থনা। তারা ভুলেই যেত যে নিজেরা খাটাখাটুনি না করলে সে জমিতে দেখা দিত শুধু আগাছা আর ঘাসপাতা।

কৃষকের কাজ ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিল, তবে পশুপালকেরও যে খুব আরামে কাটছিল তা নয়। শস্যশ্যামল তৃণাঞ্চলে পশুপাল তাড়াতাড়ি করে বাড়তে থাকল — আর পশুপাল যতই বাড়ে মানুষেরও খাটুনি বাড়ে তার সঙ্গে। ডজন খানেক ভেড়া চরানো এক কথা — কিন্তু হাজার হাজার ভেড়া চরানো হল সম্পূর্ণ আলাদা কথা। তারপর বিরাট পাল তাড়াতাড়ি একটা মাঠ সাফ করে ফেলে — তখন তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় ঘরদোর থেকে ক্রমেই দূরের মাঠে।

শেষে এমন দাঁড়াল যে গোটা গ্রামকে গ্রামই লটবহর নিয়ে পশুপালের পেছন পেছন চলল। আগে আগে পশুর পাল খেদিয়ে উটের পিঠে তাঁবু চড়িয়ে তারাও পথে নামল।

যাযাবর মোঙ্গলীয় (চীনের প্রাচীন চিত্র)।

তাদের পেছনে পড়ে রইল আগাছায় ভরা শূন্য মাঠ-ময়দান। এতেও তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হত না কারণ শুকনো মাঠে ভালো ফলন হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব।

এই প্রথম শুধু এক গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে নয়, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে শ্রম-বিভাজনের সূচনা দেখা দিল।

সমভূমিতে ছিল পশুপালক গোষ্ঠী — পশুপালন তাদের কাজ। তারা পশুর বদলে শস্য সংগ্রহ করতে লাগল। তারা কোনও নির্দিষ্ট এক জায়গায় স্থির হয়ে না থেকে দেশান্তরে চলে যেত এক বিচরণক্ষেত্র থেকে অন্য বিচরণক্ষেত্রে। এ যাযাবরদের জীবন হল বন্য ও স্বাধীন।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে, যেখানে গাছ গাছড়ায় কি ঘরবাড়িতে ঢাকা পড়বে না এমন জায়গায় তারা তাঁবু খাটাত। সারা খোলা ময়দানই ছিল তাদের বাসভূমি। দীর্ঘ যাত্রাপথে উটের পিঠের দোলানিই হত বাচ্চাদের দোলনা।

যে কালের কথা আমরা বলছি তখনও অবশ্য পশুপালক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে খাঁটি যাযাবরদের সংখ্যা কম ছিল।

জীবন্ত হাতিয়ার

যাযাবর গোষ্ঠীগুলোর জীবন শান্ত বা নিশ্চিন্ত ছিল না। যাত্রাপথে চাষীদের ক্ষেত বা পশুর পাল পড়লে তারা অনেক সময়ই ফসল বা পশু আত্মসাৎ করে নিত। পাহাড়ের চড়াই থেকে নদীর অববাহিকা ধরে কিংবা সমভূমির অরণ্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা গ্রামাঞ্চল লুঠতরাজ করত, জ্বালিয়ে দিত, তাজা শস্যক্ষেত্র দলেমলে পশুপাল আর মানুষকে বন্দী করে নিয়ে যেত।

তাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হত লোকের। কারণ পশুপাল চরানোর জন্য তাদের লোক খাটানোর দরকার। তাদের কুলে সর্বদাই লোকাভাব, রাখাল মেলাই দায়।

যাযাবর পশুপালক কুলগুলির কাজই ছিল তাই। তবে কৃষকরাও একেবারে শান্তিপ্রিয় ছিল না। হেমন্তে ফসল কাটা হয়ে যাবার পর তারাও প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলোর উপর হামলা করে তাদের ভাঁড়ার থেকে শস্য, কাপড়চোপড়, গহনাপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে নিয়ে আসতে দ্বিধা করত না। তবে সবচেয়ে যে লুঠের মালের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল বেশি তা হল বন্দী মানুষগুলো।

কারণ কৃষকদেরও খালকাটা, বাঁধ বাঁধা, চাষের সময় বলদ চালনা করার মতো লোকবলের অভাব ছিল।

গোড়ায় তারা বন্দীদের দাসে পরিণত করত না, কারণ তা করলে কিছু সুবিধা হত না। দাসের বাড়তি দুটি হাত থাকলেই তাদের আয় ত বাড়ত না।

মিশরীয়দের যুদ্ধলব্ধ শিকার।

মানুষ কাজ করত যেমন খেতেও তেমনি যে যতটুকু উৎপন্ন করত তার সবটাই। বিরাট বিরাট পশুপাল আর উর্বর ক্ষেতখামার হবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বদলে গেল। এক এক জনের কাজের ফলে তার নিজের দরকারের চেয়ে বেশি শস্য, মাংস আর পশম উৎপন্ন হতে লাগল। শস্যের বিনিময়ে যাতে পশম পাওয়া যায় তার জন্য কৃষকেরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল বোনার চেষ্টা করতে লাগল। এদিকে পশুপালকরাও তাদের নিজেদের পোশাক ও খাদ্যের জন্য যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি ভেড়ার পাল রাখার চেষ্টা করত, যেহেতু পশমের বিনিময়ে খাদ্যশস্য বা অস্ত্রশস্ত্র পাবার সম্ভাবনা।

বিনিময়প্রথা এবং কখন কখন লুঠতরাজের কল্যাণে কোন কোন কুল ও পরিবার অন্যদের তুলনায় বেশি ধনী হয়ে গেল। তাদের পশুপাল যেমন বেশি তেমনি তারা ফসলও বুনত বেশি। ভেড়া চরানো ও জমি চাষের জন্য লোকবলের অভাব দেখা দিল তাদের। তখনই একদল লোক আরেক দলকে দাসে পরিণত করতে শুরু করল।

দাস তার নিজের শ্রমে নিজেকে এবং প্রভুকে — দু'জনকেই খাওয়াতে। প্রভুকে খালি দেখতে হত যেন দাস বেশি করে কাজ করে আর খায় কম। এমনি করে মানুষ তার সঙ্গী মানুষকে এক জীবন্ত হাতিয়ারে পরিণত করল। সে মানুষকে অধঃপতিত করে বলদের মতো তার কাঁধে এক জোয়াল জুড়ে দিল। মুক্তির পথে, প্রকৃতি বিজয়ের মুখে মানুষ নিজেই তার সঙ্গী মানুষের দাস হয়ে পড়ল।

আদিতে জমি ছিল সাধারণের সম্পত্তি — যারাই কাজ করত তাদের সকলেরই ছিল সেটা। এখন দাস যে জমি চাষ করতে আরম্ভ করল তাতে তার কোন অধিকার
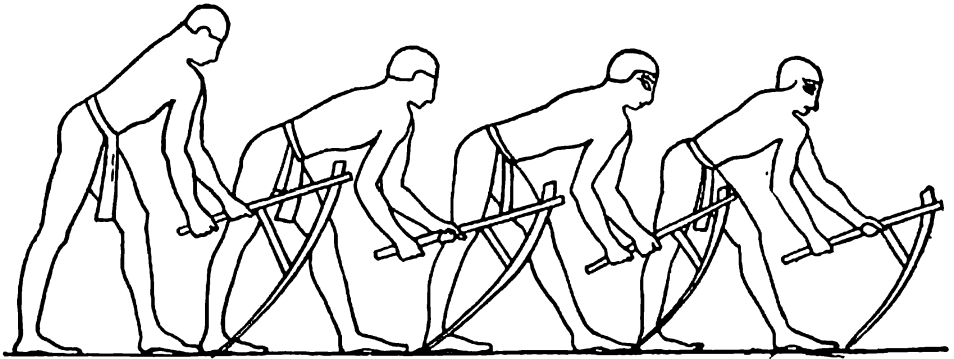
ক্রীতদাসেরা জমি চাষ করছে (মিশরীয় ছবি)।

রইল না। যে বলদ সে খেদাত তাও তার নয়, যে শস্য সে উৎপাদন করত তাও তার ছিল না।

প্রাচীন মিশরের দাস বলদ চালাতে চালাতে গান গাইত:

> ওরে বলদ, মাড়িয়ে দিয়ে যা রে গমের ছড়া,
> মাড়িয়ে যা রে যত গমের ছড়া,
> এই ফসলের মালিক আমার প্রভু।

এই ভাবে মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম প্রভু আর দাসের আবির্ভাব ঘটল।

স্মৃতি ও স্মারক

অতীতের পথে যাত্রা এতকাল ছিল শুধু বিপদসংকুল। গুহার গোলকধাঁধায় আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা শখের পর্যটনকারী ছিলাম না, আমরা ছিলাম গবেষণাকারী অভিযাত্রী। যা কিছু পেয়েছি তা ছিল ধাঁধার আকারে, যার সমাধান বার করতে হয়েছে। যাত্রাপথে গবেষণায় সাহায্য করার মতো না পেয়েছি কোন চিহ্ন, না কোন স্তম্ভের গায়ে খোদিত অনুশাসন। প্রস্তর যুগের লোকেরা লিখতেই জানত না, তারা কী করে আমাদের জন্য অনুশাসনের আকারে কিছু লিপিবদ্ধ করে যাবে?

কিন্তু এবার আমরা শেষ পর্যন্ত এমন একটি রাস্তায় এসে পড়েছি যার সর্বত্র চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। সমাধিপ্রস্তর এবং মন্দির গাত্রে আমরা প্রথম খোদিত লিপি দেখতে পাই। এগুলো মোটেই পুরাকালের ভূতপ্রেত ও দেবতাদের জন্য আঁকা ভুতুড়ে ছবি নয়। এগুলো সব ছবিতে আঁকা গোটা কাহিনী — মানুষের জন্য কথা — মানুষকে নিয়ে রচিত।

আমাদের অক্ষরের মতো অবশ্য তখনও কিছু হয় নি। ষাঁড় বোঝাতে হলে ষাঁড় এঁকে দেখানো হত, ডালপালা শুদ্ধ গাছ আঁকতে হত।

লেখার ইতিহাসের সূত্রপাত ছবির লেখা থেকেই। এই ছবিগুলোকে সহজ করে প্রচলিত প্রতীকে পরিণত হতে বহুকাল লেগেছে।

আমাদের অক্ষরগুলোর দিকে তাকালে আন্দাজ করা কঠিন কোন্ ছবি থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে। কে কল্পনা করতে পারে যে ইংরেজী অক্ষর 'A' হল ষাঁড়ের
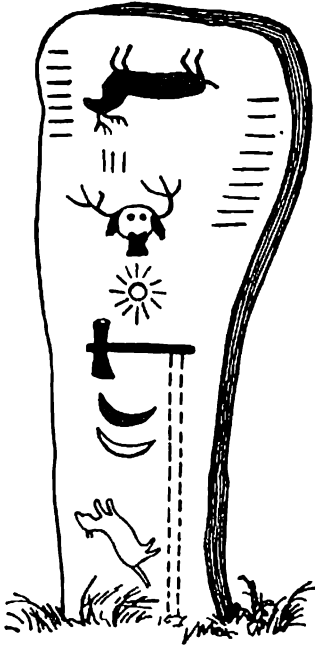
কোন এক রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীপতির সমাধিচিহ্ন।

মাথা! কিন্তু 'A'-কে উল্টে দিলেই দেখতে পাবে শিঙ-ওয়ালা একটি মাথা। প্রাচীন সেমাইট জাতিদের কাছে এই শিঙওয়ালা মাথার অর্থ ছিল 'A' — তাদের প্রথম অক্ষর 'আলেফ' মানে ষাঁড়।

এই ভাবে আমাদের প্রত্যেকটি অক্ষরেরই ইতিহাস খুঁজে বার করতে পারবে। 'O' হল চোখ, 'P' হল লম্বা ঘাড়ের ওপরের একটি মাথা।

কিন্তু আমাদের সপ্তযোজন পাদুকা বহুদূর নিয়ে এসেছে আমাদের। আমরা এসে হাজির হয়েছি আমাদের কাহিনীর প্রথম কালে চিত্রলিপির উদ্ভবের সময়।

মানুষ হাতড়ে হাতড়ে ধীরে ধীরে লিখতে শিখেছে। লিখতে না শিখে তার আর উপায় ছিল না।

যতদিন বিশেষ কিছু জানবার ছিল না ততদিন মানুষ সবই মনে করে রাখত। লোকের মুখে মুখে ইতিকথা, কিংবদন্তী, কাহিনী চলে এসেছে। প্রত্যেক বৃদ্ধই ছিল জীবন্ত একটা বই। কাহিনী, কিংবদন্তী ও সদ্‌জীবনযাপনের নীতিকথার প্রত্যেকটি শব্দ পুংখানুপুংখ মনে রেখে তাঁরা সন্তানসন্ততিদের সেই মহামূল্যবান উত্তরাধিকার দান করে যেতেন। এরা আবার দান করত তাদের সন্তানসন্ততিদের। কিন্তু উত্তরাধিকার যত ভারী হয়ে আসতে থাকে ততই কঠিন হয়ে পড়ে তাকে মস্তিষ্কে রাখা।

এবার স্মারকস্তম্ভ এলো স্মৃতির সাহায্যে। মানুষের অভিজ্ঞতার কাহিনী কথিত ভাষায় বলার সাহায্য করতে এলো লিখিত ভাষা। নেতার সমাধিস্তম্ভে তারা তাঁর সাহসিকতা ও যুদ্ধজয়ের কাহিনীর ছবি এঁকে রাখত যাতে ভাবী বংশধরেরা সে কথা জানতে পারে। প্রতিবেশী গোষ্ঠীর নেতাদের কাছে দূত পাঠাবার সময় তারা গাছের ছালে কি ভাঙা মৃৎপাত্রের গায়ে কোন চিত্রলিপির আঁচড় কেটে তাকে স্মরণ করিয়ে দিত।

পৃথিবীর প্রথম বই হল সমাধিপ্রস্তর। প্রথম অক্ষর হল বল্কল।

আমরা টেলিফোন, রেডিও ও স্থান-কালজয়ী অন্যান্য শব্দগ্রহণের যন্ত্রপাতির

গর্ব করি। বেতারে হাজার হাজার মাইল দূরে আমরা মানুষের স্বর পাঠিয়ে দিতে শিখেছি। দশকের পরে দশক, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফিতে ও রেকর্ডে ছাপানো আমাদের গলার স্বর শুনতে পাবে সকলে। আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি, কিন্তু তাই বলে আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কৃতিত্বও বিস্মৃত হলে চলবে না। বহু বহু কাল আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা বল্কলের গায়ে যে সংবাদ প্রেরণ করেছেন তা দিয়ে তাঁরা স্থান জয় করেছেন, আর কাল জয় করেছেন স্মারকস্তম্ভের গায়ে লিপি খোদাই করে।

পুরাকালের যুদ্ধ ও সাহসিকতার কাহিনীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করা অনেক স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের যুগ পর্যন্ত টিকে আছে। পাথরের উপর তলোয়ার ও বর্শা হাতে সৈনিকদের ছবি আঁকা আছে। বিজয়ীরা পিছনে হাত বাঁধা, নতমুখ বন্দীদের নিয়ে বিজয় গর্বে দেশে ফিরছে। প্রথম শব্দের প্রতীক সেই ছবিগুলিতেই আমরা
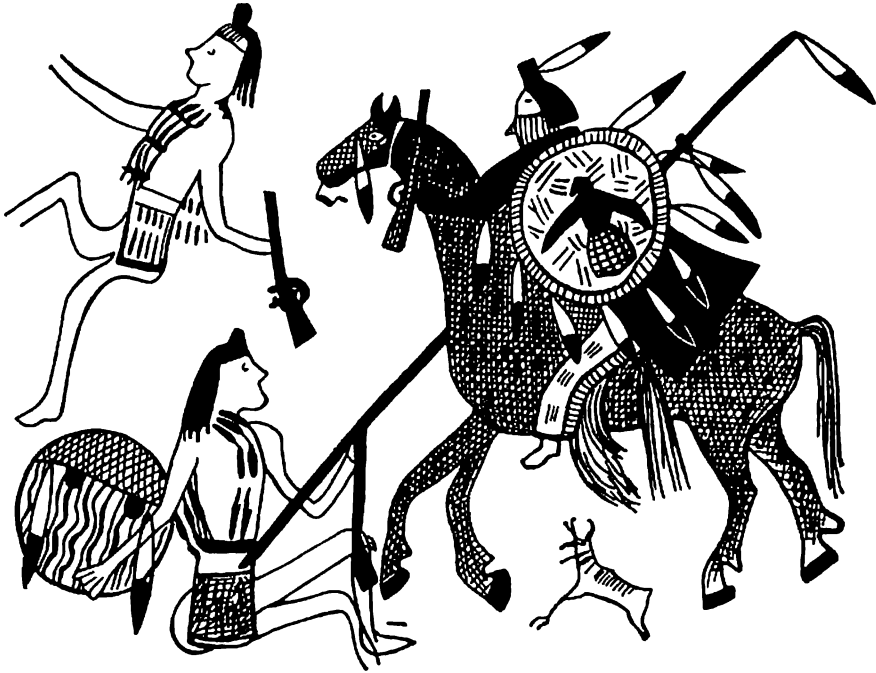
উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের চিত্র-বিবরণী।

ক্রীতদাস রাজমিস্ত্রিরা মন্দির বানাচ্ছে। ডানদিকে ওপরে লাঠি হাতে বসে আছে ওভারসিয়ার (মিশরীয় ছবি)।

অধীনতা ও দাসত্বের প্রতীক শেকলের হাত-কড়া দেখি। এই চিহ্নই মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের কাহিনী বলছে — দাসপ্রথার আরম্ভ।

মিশরের মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে পরের যুগে আমরা এমন অনেক ছবির সাক্ষী পাই। একটিতে দেখা যায় লম্বা সার বেঁধে দাসরা একটা দালানের জন্য ইট বয়ে আনছে। তাদের একজন এক বাক্স ইট ঘাড়ে করে দু'হাত দিয়ে সেটা ধরে আছে, আর একটিতে আছে বাঁকে করে জল আনার মতো করে ইট বওয়ার ছবি। রাজমিস্ত্রীরা দেওয়াল গাঁথছে আর কাছেই একটা ইটের ওপর ওভারসিয়ার বসে আছে। তিনি হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে বসেছেন. লম্বা একটা লাঠি আছে তাঁর হাতে। তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে না; তাঁর কাজই হল অন্যকে খাটানো। আর একজন ওভারসিয়ার কাছেই যে দালান তোলা হচ্ছে তার সামনে পায়চারি করছেন। তাঁর ছড়িটা ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে এক দাসের মাথার ওপরে তোলা। পরিষ্কার বোঝা যায় দাসটি এমন কিছু করেছে যা তাঁর মনঃপূত হয় নি।

দাস ও স্বাধীন লোক সম্বন্ধে

'পেঁয়াজ থেকে যেমন গোলাপ জন্মায় না, তেমনি স্বাধীন লোকও দাসীর গর্ভে জন্মায় না।'

দাসপ্রথা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি রীতি হয়ে উঠবার পর গ্রীক কবি থিওগ্নীস এই কথা লিখেছিলেন।

পূর্বে দাসদের নীচুস্তরের লোক বলে মনে করা হত না। স্বাধীন লোক ও দাসেরা একই সঙ্গে এক বিরাট গোষ্ঠী গঠন করে বাস করত আর কাজ করত। পিতাই ছিলেন এই পারিবারিক গোষ্ঠীর প্রধান ও শাসক — কুলপতি। তাঁর ছেলে, ছেলের বৌ ও তার ছেলেমেয়ে, দাসদাসীরা একই আশ্রয়ে তাঁর সঙ্গেই বাস করত এবং সর্বতোভাবে ছিল তাঁর অধীন। অবাধ্য পুত্র ও অবাধ্য দাসকে একই রকম ভাবে বেত্রাঘাত করার অধিকার ছিল পিতার।

প্রাচীন রীতি এই রকমই ছিল যে বৃদ্ধ দাস প্রভুকে 'ছেলে' বলে ডাকবে আবার প্রভুও বৃদ্ধ দাসকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করবে।

'অডিসী' পড়ে থাকলে নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে যে বৃদ্ধ শূকর-পালক ইউমিউস প্রভুর সঙ্গে একই টেবিলে অতি স্বাভাবিক ভাবেই খাওয়াদাওয়া করত। যে লোক-কবি ও চারণরা 'অডিসী' রচনা করেছেন তাঁরা শূকর-পালককে কুলপতির মতোই 'দেবতুল্য' বলতেন।

কিন্তু গীতটির মধ্যে সবটা সত্য নয়। শূকর-পালক ইউনিউস প্রভু বা ঈশ্বর কারুরই সমান ছিল না। তাকে কাজ করতেই হত, কিন্তু প্রভুর পক্ষে কাজ করা না করা ইচ্ছাধীন। পরিবারের একজন সভ্যের চেয়ে দাসের কাছে চাওয়া হত অনেক বেশি, আর তাকে দেওয়া হত অনেক কম। দাস ছিল সম্পত্তি, আর স্বাধীন লোক ছিল সম্পত্তির মালিক।

প্রভু মারা গেলে গোরু, ভেড়া ও অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে দাসও প্রভুর ছেলের হাতে চলে আসত।

এই পারিবারিক গোষ্ঠীর ভেতরে আর আগের সাম্যভাব ছিল না। এখানে পিতা হচ্ছেন সন্তানদের শাসক, স্ত্রী স্বামীর অধীন, বধূ শাশুড়ীর অধীন, ছোট বউরা বড় বউদের অধীন। আর সকলের নিচে হল দাস।

কুলগুলির মধ্যে এবং গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে আগে যে সাম্য ছিল, তা আর থাকল না। কারুর কারুর বেশি গোরু ভেড়া ছিল, অন্যের ছিল কম। অথচ গোরু ভেড়া হচ্ছে মূল্যবান; তার বিনিময়ে বস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যেত। এ থেকেই বোঝা যায় সবচেয়ে প্রাচীন মুদ্রাটি যে ষাঁড়ের চামড়ার আকারে নির্মিত হত তাও মোটেই হঠাৎ হয় নি।

কিন্তু দাসের দাম ছিল আরও বেশি। দাস শূকরছানা, গোরু, ভেড়ার তদারক করত। সন্ধে হলে সে শক্ত বেড়া দিয়ে ঘেরা গোয়াল, শূকরের খোঁয়াড় আর ভেড়ার ঘরে খেদিয়ে নিয়ে যেত তাদের। দাস ফসল কাটার কাজে সাহায্য করত, আঙুরের রস নিঙ্ড়াত আর তেল বার করত অলিভ থেকে। ভাঁড়ারে প্রচুর

সোনালী শস্যের সম্ভার জমে উঠত। মাটির ঘড়া, পিলসুজ সব ভরে থাকত সুগন্ধি তেলে।

দাসরা স্বাধীন লোকদের সাহায্য করত, কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজ দাসদের ভাগ্যেই জুটত।

যুদ্ধ বাধলে দাস পাওয়া যেত, দাস থেকে ঐশ্বর্য লাভ হত বলে যুদ্ধ লাভজনক হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং গোরু ভেড়া চরানো আর খেত খামার করার জন্য দাসদের বাড়িতে রেখে স্বাধীন লোকেরা চলে যেত যুদ্ধে।

যুদ্ধ লোকের আরও অনেক কাজ জুটিয়ে দিল। আক্রমণের জন্য তলোয়ার চাই, বর্শা চাই, চাই যুদ্ধের রথ। যুদ্ধের রথের সঙ্গে আবদ্ধ দুটি দ্রুতগামী অশ্ব ঘূর্ণির মতো তাদের রণাঙ্গনের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেত; কিন্তু যুদ্ধে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা একই সঙ্গে চলে। যোদ্ধারা মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে শত্রুপক্ষের তলোয়ার ও বর্শার আঘাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বাঁ হাতে ঢাল ধরত। সাধারণ আবাস-স্থানের চারপাশ ঘিরে বিশাল পাথরের চাঁই দিয়ে কঠিন প্রাচীর গড়ত। যে কুল যত ধনী আর শক্তিশালী ছিল, তাদেরই আত্মরক্ষার জন্য খাটতে হত বেশি — কারণ
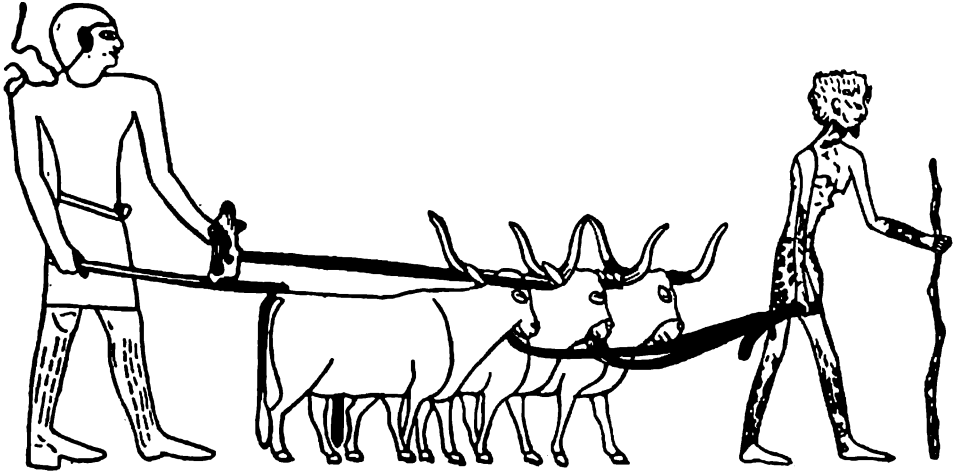
ক্রীতদাস রাখাল ও পশুপালের মালিক (মিশরীয় ছবি)।

মিশরে বন্দী নিগ্রোদের আদমশুমারী।

রক্ষা করার মতো জিনিস তাদের ছিল। ডজন ডজন ঘর আর ভাঁড়ার, দেওয়াল জুড়ে গম্বুজ ও শক্ত-সমর্থ দরজা লাগানো অতিকায় দুর্গ গড়া হল পাহাড়ের গায়ে বসত-বাড়ির মতো করে। ·

কুটির থেকে কোঠাবাড়ি, কোঠাবাড়ি থেকে শহর

সোভিয়েত ইতিহাসবিদ স. প. তল্‌স্তোভ তাঁর 'প্রাচীন খরেজ্‌ম' গ্রন্থে মধ্য এশিয়ার বালুকারাশির মধ্যে প্রাপ্ত গৃহদুর্গের ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা দিয়েছেন। আকারের দিক থেকে এই নির্মাণকর্মগুলোকে বাড়ি না বলে সম্ভবত শহর বলাই ভালো।

কয়েক মাইল লম্বা বিশাল প্রাচীর দিয়ে একটা খালি চত্বরের চারপাশ ঘেরা। গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত লোক এই প্রাচীরবেষ্টিত জায়গাটার ভেতরে ছাদের গায়ে ছোট ছোট ঘুলঘুলি বসানো খিলান দেওয়া অলিন্দগুলোর মধ্যে বাস করত।

হাজার হাজার লোক প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিন্দগুলোর মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি করে

বাস করছে, অথচ মাঝখানের চত্বরটা খালি পড়ে রয়েছে — ব্যাপারটা প্রথম দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য মনে হয়।

তল্‌স্তোভ এ রহস্যের একটা সরল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে যুগের খরেজ্‌মবাসীদের কাছে প্রধান সম্পদ ছিল গবাদি পশু। চারকোনা চত্বরটা আসলে ছিল অসংখ্য পশুপালের একটা খোঁয়াড়, আর দেয়ালের গায়ের ঘুলঘুলি ও চৌকিমিনারগুলো শত্রুর আক্রমণ থেকে ঐ সম্পদকে রক্ষা করত।

শত্রু যখন হানা দিত তখন গৃহদুর্গের সমস্ত অধিবাসীরা প্রাচীরের ঘুলঘুলিগুলোর পাশে জায়গা নিয়ে দাঁড়াত, সেখান থেকে হানাদার সৈন্যদের ওপর তীর বর্ষণ করত।

কিন্তু যে সম্পদ তারা সকলে মিলে রক্ষা করত তা আর সর্বসাধারণের সম্পত্তি ছিল না। এখানে সকলে একই কুলের অন্তর্ভুক্ত হলে কী হবে, কোন কোন পরিবারের অন্যদের তুলনায় বেশি ভেড়া, ষাঁড় আর ঘোড়া ছিল।

প্রাচীন কিংবদন্তী ইত্যাদি থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ই ভাষায় ‘ধনী’ শব্দটির আবির্ভাব ঘটে। তবে লোকে তখন শুধু ধনী না বলে বলত ‘পশুপালে ধনী’, ‘ঘোড়ায় ধনী’।

প্রত্যেকবার অন্যের দুর্গে নতুন করে হানা দেওয়ার ফলে সামরিক নেতাদের পশুপাল বৃদ্ধি পেত, পরিণামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দূরত্বও বর্ধিত হতে থাকত।

তল্‌স্তোভ ও তাঁর সহকর্মীরা বালুকারাশির মধ্যে আরও পরবর্তীকালে তৈরি ঘরবাড়ি ও গৃহদুর্গের সন্ধান পান। তাঁদের বিরাট ও কঠিন খননকর্ম বহু বছর ধরে চলে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মোটরগাড়ি, নৌকো ও এরোপ্লেনে চড়ে বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া জগতের চিহ্ন খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন। কখন কখন উটের পিঠ থেকে কিংবা টিলা থেকে ছাইরঙা লোনামাটির শক্ত স্তরে ঢাকা ঢিবি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু এরোপ্লেনে চড়ে মরুভূমির ওপরে উঠলেই নীচে ছকের মতো চোখে পড়ে গোষ্ঠীর সকলের বসবাসের বড় বড় সাধারণ ঘরবাড়ি, দেয়াল আর রাস্তাঘাট।

এই সমস্ত ঘরবাড়ি ও শহরের সন্ধান পেয়ে সেগুলোর মধ্যে তুলনা করার পর বিজ্ঞানীরা আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থা থেকে দাসব্যবস্থায় সমাজের উত্তরণের একটা সুস্পষ্ট চিত্র চোখের সামনে দেখতে পান। এ যেন পুরো একটা গ্রন্থবদ্ধ কাহিনী।

জানবাস-কালার কাছে জেলেদের একটা বাড়ি। এটা একটা কুটির। এখানে ধনী-দরিদ্র বলে কিছু নেই। বাড়ির সবগুলো চুল্লী একরকম, সব লোক সমান,

কেননা সবাই একইরকম গরিব। বাড়ি সুরক্ষিত করা হয় নি, যেহেতু বাড়ির ভেতরে এমন কোন সম্পদ নেই যাকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়।

ঐ জানবাস-কালারই কাছে, জেলেদের বসতি থেকে কিছু দূরে বিজ্ঞানীরা মাটির তৈরি 'লম্বা 'বাড়ির' একটা ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন। দেড়শ' ফুট করে লম্বা দুটো অলিন্দের ভেতরে সারি সারি চুল্লী। এই বাড়িটাও সুরক্ষিত নয়।

কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল খালি উঠোনের চারধারে গৃহপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা কয়েকটা 'লম্বা বাড়ি' একসঙ্গে জুড়ে আছে। এই রকম বেষ্টিত বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে কিউজেলি-গির-এ। এখানে দেয়ালের গায়ে ঘুলঘুলি আছে, চৌকিমিনারও আছে। এখানকার লোকজন শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের পশুপাল রক্ষা করত। কিন্তু অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য প্রতিবেশীদের ওপর চড়াও হওয়াতে তাদের নিজেদেরও আপত্তি ছিল না। এই বসতির কোন কোন পরিবার অন্যদের তুলনায় বড়লোক। কিন্তু যিনি খননকার্য পরিচালনা করছেন সেই প্রত্নতত্ত্ববিদের চোখে পার্থক্যটা তেমন প্রকট হয়ে উঠছে না। তিনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও অংশে বসবাসকারী জাতিগুলোর রীতিনীতি বিশ্লেষণ করে এই বৈষম্য সম্পর্কে খানিকটা অনুমান করতে পারছেন মাত্র।

এর পরের ধাপ — জানবাস-কালা দুর্গ। প্রাচীরের ভেতরকার চৌকোনা জায়গাটা আর খালি নেই — সেখানে উঠেছে সর্বসাধারণের বসবাসের জন্য বহু কক্ষবিশিষ্ট দুটি বিরাট বাড়ি। ঐ বাড়িদুটোর মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে 'অগ্নিগৃহের' দিকে। আদিম জেলেদের শিবিরের সেই যে চুল্লী যেখানে দিনরাত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত সেটা এখন মন্দিরে পরিণত হয়েছে।

দুর্গে এখন একটি কুলের জায়গায় দুই কুলের লোকজন বসবাস করে। দুই কুলের আলাদা আলাদা দুটি বাড়ি। এখানে খোঁয়াড় নেই, কারণ অধিবাসীদের প্রধান বৃত্তি আর পশুপালন নয়, তারা এখন কৃষিজীবী। দুর্গের বাইরে আছে চাষের জমি — জমি ফালা ফালা করে চলে গেছে জলসেচের খাল। দুর্গ যাযাবরদের হাত থেকে এই জমি ও খাল রক্ষা করে।

এরও পরের ধাপ আছে — তোপ্‌রাক-কালা দুর্গ। এই দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে বাড়ি দুটোর অনেক বেশি — প্রায় ডজনখানেক বহুকক্ষবিশিষ্ট বাড়ি।

দুর্ধর্ষ প্রাচীর আর মিনার শহরটিকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে। চট করে ফটক পার হয়ে নগরে প্রবেশ করা কোন আগন্তুকের পক্ষে সম্ভব নয়। ঢোকার মুখ সুরক্ষিত করে আছে একটা গোলকধাঁধা। আগন্তুককে প্রথমে সেই গোলকধাঁধা পার হয়ে যেতে হবে।

প্রবেশদ্বার থেকে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে টানা চলে গেছে রাজপথ। পথের দু'ধারে একেকটি কুলের বাসোপযোগী বিশাল বিশাল ঘরবাড়ি — সেগুলোর একেকটিতে শত শত কক্ষ, বুরুজ; বাড়ির সামনেই আঙ্গিনা। রাজপথ ধরে চললে 'অগ্নিগৃহে' এবং মহাপ্রতাপান্বিত নগরাধিপতির তিন মিনারযুক্ত জমকাল প্রাসাদে পেঁছানো যায়।

এখন অবশ্য এসবের কিছুই নেই — পড়ে আছে জায়গায় জায়গায় বালু আর মাটিতে ঢাকা ধ্বংসাবশেষ। শহরের আদত চেহারা পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রচুর খাটতে হয়েছিল।

খোঁড়াখুঁড়ি করে তাঁরা যে-সমস্ত জিনিসের সন্ধান পেলেন তাতে তাঁদের শ্রম সার্থক হল। বিশেষত তিন মিনার যুক্ত প্রাসাদটির ভেতরে কৌতূহল জাগানোর মতো অনেক জিনিস পাওয়া যায়। সদরবাড়ির ঘরগুলোর দেয়ালে এখনও কুশলী শিল্পীদের হাতে আঁকা ভিত্তিচিত্রের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এখানে জনহীন মরুভূমির মধ্যে প্রাসাদের দেয়ালের গায়ে যেন অতীত মূর্ত হয়ে উঠেছে — বীণাবাদিকা, একটি মেয়ে থোকা থোকা আঙুর তুলে ঝুড়িতে ভরে মাথায় করে নিয়ে চলেছে, কালো কোর্তা পরা একটি পুরুষ, ঘোড়া, বাঘ, ময়ূর। ভাঙাচোরা মূর্তির যে-সমস্ত টুকরো পাওয়া গেছে তাতেও রীতিমতো শিল্পনৈপুণ্যের ছাপ আছে।

প্রাসাদের সব কিছু থেকে এটাই বলতে হয় যে এর অধিকারীরা শহরের অন্যান্য অধিবাসীর তুলনায় অনেক বেশি ধনী ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তাছাড়া প্রাসাদটাও যে-রকম উদ্ধত ভঙ্গিতে আর সব বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তার বাসিন্দাদের সঙ্গে অন্য কারও কোন তুলনা চলে না।

এখানে নগরাধিপতি এবং সমগ্র দেশের অধীশ্বর খরেজ্‌মশাহ সপরিবারে, তাঁর অসংখ্য গোলাম ও বাঁদী নিয়ে বাস করতেন।

এটা ছিল সত্যিকারের একটি রাজ্য। নগরাধিপতির সেনাবাহিনী ছিল। সেই বাহিনী দরিদ্রসম্প্রদায় ও গোলামদের বশে রাখার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করত, ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের অধিকার রক্ষা করত, জলসেচের খাল খননের কাজে তদারকি করত। জলসেচের বিশাল খাল খোঁড়ার জন্য হাজার হাজার দাসকে খাটতে হত। একটা দুর্গ নয়, খরেজ্‌মে বহু দুর্গ জমি, খাল এবং কৃষকদের খোলা বাড়িঘর রক্ষা করত।

এই ভাবে হাজার হাজার বছর পরিক্রমা করে বিজ্ঞানীরা স্বচক্ষে দেখতে পেলেন

কেমন করে কুটির থেকে কোঠাবাড়ি হল, কোঠাবাড়ি থেকে শহর হল, কেমন করে সমাধিকারসম্পন্ন মানুষের গোষ্ঠী পরিণত হল দাসব্যবস্থা ভিত্তিক রাজ্যে।

কেবল মধ্য এশিয়ায় নয়, অন্যান্য জায়গায়ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই রকম বড় বড় গৃহদুর্গের সন্ধান পেয়েছেন। যেখানে-যেখানে সঞ্চিত ধনসম্পদকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করার আবশ্যকতা দেখা যায় সেখানেই এগুলো গড়ে ওঠে।

একটি দুর্গের অবরোধ

দুর্গপ্রাকার থেকে অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। সমভূমিতে ধূলার ঝড় উঠলে বা বর্শাফলকের ঝিকিমিকি দেখতে পেলেই দুর্গের ভেতরের লোকজন আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হয়ে উঠত। কৃষকরা তাড়াহুড়ো করে বলদ নিয়ে ফিরত, রাখাল পশুর পাল খেদিয়ে নিয়ে আসত দুর্গের ভেতরে। শেষ মানুষ আর পশুটি ভেতরে এসে পড়লেই ভারী ভারী ফটকগুলো বন্ধ করা হত। প্রাকারের ওপর, চৌকো ঘর থেকে যোদ্ধারা শত্রুদের জন্য অপেক্ষা করত। এলেই পালক-গোঁজা তীর ছুঁড়বে তাদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে।

অবরোধকারীরা দুর্গের কাছে এসে প্রাকারের বাইরে তাঁবু ফেলত। তারা বেশ ভালো করে জানত যে সুরক্ষিত জায়গা দখল করা সহজ কথা নয়, উঁচু দেয়াল ভেঙে ফেলতে অনেক মাস কেটে যাবে। প্রত্যেক দিন সকালে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ফটক খুলে যেত। একদল দুর্গরক্ষী যোদ্ধা বর্শার আড়ালে আত্মরক্ষা করে ছুটে বেরোত খোলা ময়দানে গোষ্ঠীর ভাগ্য নিরূপণ করতে। ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে সাজানো শত্রুর চক্‌মকে শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাত। শত্রু মিত্র নির্বিচারে অবসন্ন হয়ে না পড়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করত।

একপক্ষের যুদ্ধে প্রেরণা আসত এই ভেবে যে তারা নিজের গৃহ, স্ত্রী-পুত্র, পরিজনদের রক্ষা করছে, আর অপরপক্ষের প্রেরণা আসত এই ভেবে যে কত আয়াসলব্ধ মহামূল্য ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করা যাবে। মৃতদের রণক্ষেত্রে ফেলে রেখে গভীর রাত্রির অন্ধকারে রক্ষীরা পশ্চাদপসরণ করত। ভোর না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ থেমে থাকত।

দিনের পর দিন কেটে যেত। অবরুদ্ধ লোকেরা বীরত্বের সঙ্গে অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত; কিন্তু তাহলে কি হবে। শত্রুপক্ষের তলোয়ার আর তীরের চেয়ে ক্ষুধার আক্রমণই ছিল বেশি ভয়াবহ।
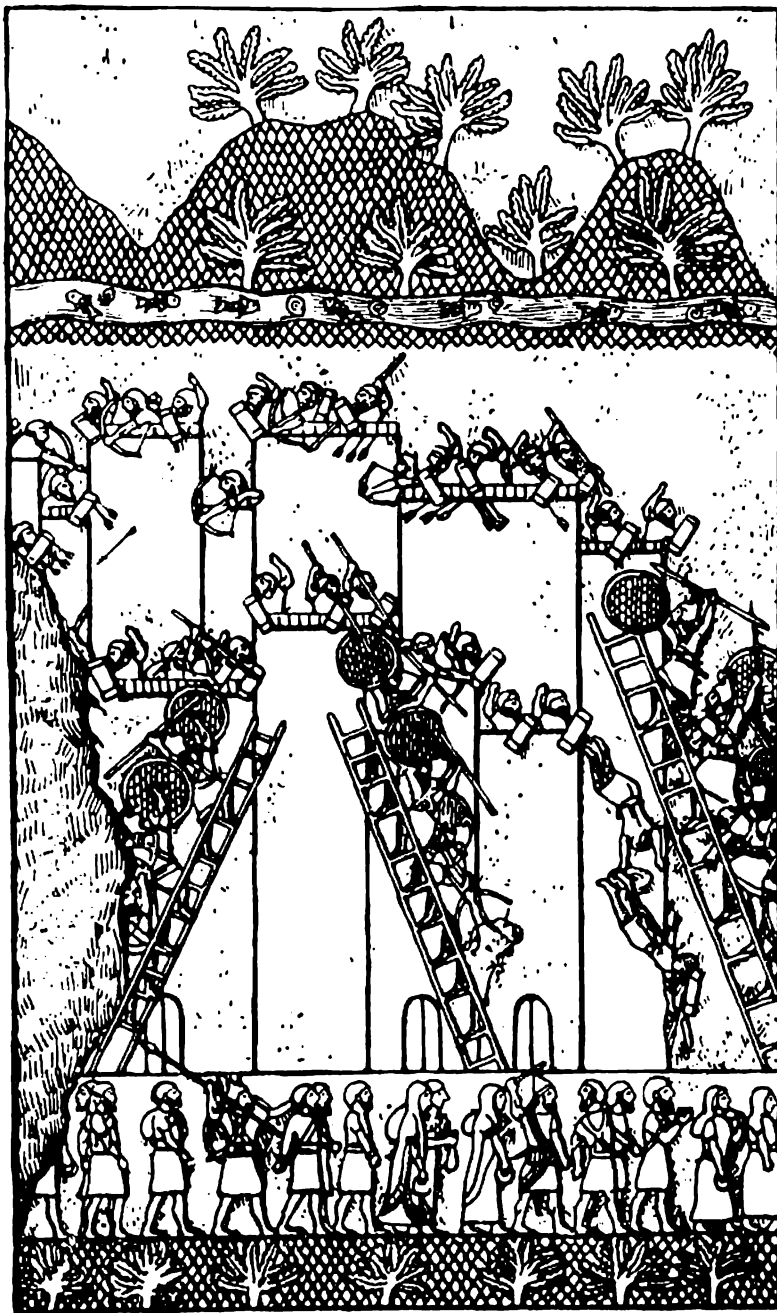
যখন শস্যের গোলায় দানার পরিবর্তে অবশিষ্ট থাকত শুধু ধুলো, পিলসুজের বাতির তেলের শেষ কণাটুকু যখন ফুরিয়ে গিয়ে এক একটি ফোঁটায় পরিণত হত তখন দুর্গের অভ্যন্তরে কান্নার রোল উঠত। ক্ষিদের জ্বালায় শিশুরা কাঁদত — আর পাছে পুরুষরা রাগ করে সেই ভয়ে মেয়েরা নীরবে তাদের অশ্রু দিত মুছিয়ে।

প্রত্যেক আক্রমণের পরেই দুর্গরক্ষীর সংখ্যা কমতে থাকে, তারপরে একদিন আসে যখন অবরোধকারীরা পলায়নপর দুর্গরক্ষীদের অনুসরণ করে দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারা প্রাচীর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, একটি পাথরও আস্ত রাখে না। আগে যেখানে লোকজনের বাস ছিল, যেখানে তারা কাজ করত, আনন্দ উৎসবে কাটাত এখন সেখানে রইল শুধু ধ্বংস আর নিহতের মৃতদেহ। বিজয়ীরা নারী, পুরুষ ও শিশুদের দাস করবার জন্য বন্দী করে নিয়ে যেত, তাদের আগেকার মুক্ত জীবন শেষ হয়ে যেত।

মৃতের মুখে জীবিতদের কাহিনী

র‍্যাশিয়ার দক্ষিণে যে বিস্তৃত স্তেপ তৃণভূমি আছে সেখানে স্থানে স্থানে যত দূর দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে উঁচু উঁচু ঢিবি। স্থানীয় অধিবাসীদের কেউই মনে করতে পারে না কোথা থেকে সমতলভূমিতে ঢিবিগুলো এলো, আর কে-ই বা এগুলো গড়েছে।

জানতে চাইলে জিজ্ঞেস করতে হবে প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে, যারা ঢিবিগুলো খুঁড়ে অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা তাঁদের জন্মেরও বহু শতাব্দীর আগেকার ঘটনা জানেন। এই ঢিবিগুলো আসলে একদা এই সমভূমিতে যে সমস্ত মানুষ বাস করত তাদেরই সমাধি, কবরের ঢিবি।

খননকারীরা ঢিবির ভেতরে খনন করে তার অনেক তলায় নরকঙ্কাল দেখতে পান। তারই সঙ্গে ছিল মাটির কলসী, পাথর আর ব্রোঞ্জের হাতিয়ার এবং কয়েক টুকরো ঘোড়ার হাড়। শেষ যাত্রার সঙ্গে নেবার জন্য এগুলো মৃতের বন্ধুবান্ধবরা দিয়েছিল। মানুষ ভাবত মরার পরেও লোকজনের আহার ও কাজ করতে হয়, মেয়ের আত্মা চায় তকলি, আর পুরুষের দরকার হয় বর্শা।

যত প্রাচীনতম ঢিবি আছে তার সবগুলোই একরকম — সেগুলোর মধ্যে মৃতের যা-কিছু সম্পত্তিও তার সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়েছে। তবে সেই পুরাকালে
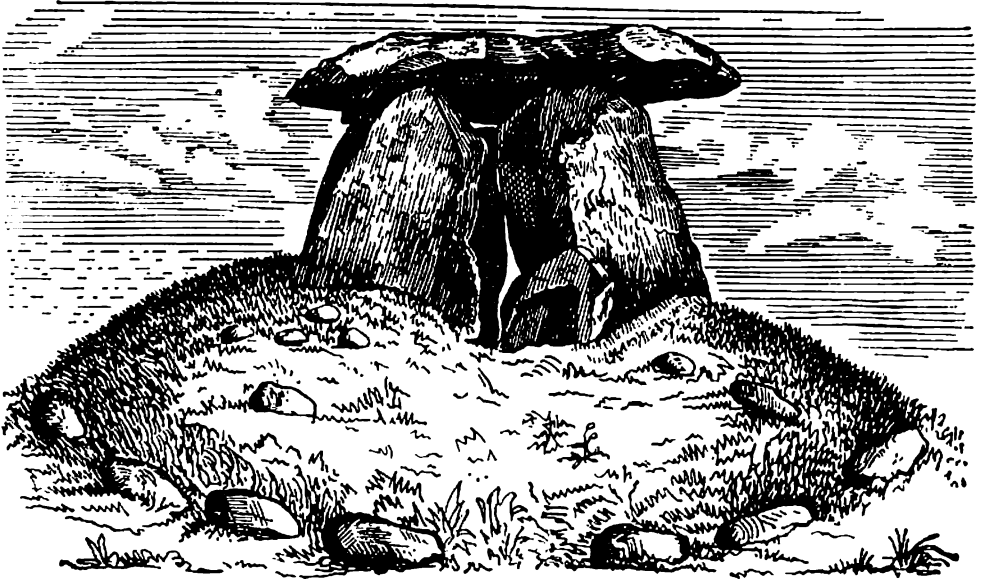
প্রাচীন কবরখানা — এখানকার সমাধিশিলাগুলো বিশাল বিশাল।

মানুষের সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। মানুষের এমন কী ছিল যাকে সে 'নিজের' বলতে পারত? একটা গলায় পরার কবচ কিংবা শত্রু নিধনের বর্শা। বাড়ির যা কিছু তা ছিল সাধারণের সম্পত্তি — কারণ ঘরবাড়ি চালানোর দায়িত্ব ছিল গোটা কুলের। সেজন্য সবচেয়ে পুরাকালের ঢিবিগুলিতে ধনীর সমাধি দরিদ্রের সমাধি বলে কিছু নেই, মৃতেরা সবাই ছিল সমান।

মৃতের মধ্যে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য দেখা দিয়েছে পরের যুগে।

দন নদীর তীরে প্রত্নতত্ত্ববিদরা তিন রকমের সমাধিবিশিষ্ট ঢিবি দেখতে পেয়েছিলেন। প্রথমটিতে ছিল ধনীরা, দ্বিতীয়টিতে মাঝারি অবস্থার লোকেরা আর তৃতীয়টিতে দরিদ্ররা।

সবচেয়ে বড় ঢিবির মাঝখানে তাঁরা দেখেন বিরাট গর্ত কাটা। সেটাই সমাধি। তার মধ্যে ছবি আঁকা গ্রীক ফুলদানি, সোনার কাজ-করা বর্ম, এবং কারুকার্যখচিত ছোরা ছিল।

মাঝারি আকারের ঢিবিতে কোন সোনার জিনিস বড় একটা ছিল না — মীনা করা ফুলদানি ত কখনই থাকত না। তবে দরিদ্রদের সমাধি এগুলোকে বলা যায় না। তা-ই যদি হত এখানে দরিদ্রের সমাধিতে কোন বার্নিশের কাজ করা বাসনপত্র কিংবা বর্ম-টর্ম কিছুই থাকত না।

সেই গোরস্থানে অন্যদের তুলনায় দরিদ্রদের সমাধির সংখ্যাই ছিল বেশি। এই সব ছোট ছোট গর্তগুলিতে মৃতব্যক্তির ডান হাতের কাছে পড়ে থাকত একটা বর্শা আর বাঁ হাতের কাছে থাকত জলের মগ, তৃষ্ণা পেলে যেন পান করতে পারে। সমাধিতেও গরীবর গরীবই থাকত।

কথায় বলে 'শ্মশানের স্তব্ধতা'। কিন্তু এ সব সমাধিকে কি নিস্তব্ধ বলব? পৃথিবীতে কখন প্রথম ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ দেখা দিল এই সমাধি থেকে আমরা পরিষ্কার জানতে পারি। এ যেন মৃতের মুখে জীবিতদের কাহিনী।

সমাধি ছেড়ে ঢিবিগুলির কাছের বসতিতে গেলে আমরা দেখতে পাব অতীতের বিরাট ধন ঐশ্বর্য এবং দারিদ্র্যের চিহ্ন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেছেন যে বসতির দুটি দেয়াল ছিল; একটা গেছে বাইরে দিয়ে, অন্যটি নদীতীরে অবস্থিত কেন্দ্রের একটি বৃত্তকে ঘিরে রয়েছে। এই কেন্দ্রীয় অংশটুকুতে তাঁরা দূর গ্রীস দেশ থেকে আনা বহু দামী বাসনপত্র ও ফুলদানির ভাঙা টুকরো দেখতে পেয়েছেন। বাইরের অংশে, মধ্যের ও বাইরের দেওয়ালের মাঝখানে কদাচিৎ তেমন কোন জিনিস নজরে পড়ে। সেখানে অতি সাধারণ স্থানীয় হাঁড়িকুড়ি কলসীর ভাঙা টুকরো ইতস্তত ছড়ানো পড়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে কেন্দ্রে বাস করত উপকণ্ঠবাসীদের তুলনায় ধনী লোকজন। উপকণ্ঠবাসীদের দামী থালাবাসন বা বাটি কেনার কোন সামর্থ্যই ছিল না।

এই সব লোকের সমাধির ওপর পরের যুগে উঁচু উঁচু বাঁধ তুলে দেওয়া হত। সমতলের বুকে আকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে উঁচু বাঁধ দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

এমনি করেই কবরগুলির কাছ থেকে কবরস্থ মানুষের কাহিনী জানতে পারা যায়। কখন কখন কবরগুলো থেকে ভয়ংকর কাহিনী শোনা যায় — প্রভুর সঙ্গে যাতে স্বর্গে যেতে পারে সেজন্য দাসকে নিহত করা হয়েছে। মৃত স্বামীর সহগমন করার জন্য স্ত্রীকে কবর দেওয়া হয়েছে — এই সব কাহিনী। যে-কোন বইয়ের লেখার চেয়ে অনেক স্পষ্ট ভাবে পিতা ও ধনিক কুলের প্রধানের নিষ্ঠুরতার কথা এই কবর থেকে জানতে পারা যায়। এই পিতা মারা গেলে স্ত্রী ও দাসদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতেন তিনি, কারণ সোনা ও ব্রোঞ্জের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর মতোই এগুলোও ছিল তাঁর সম্পত্তি।

মানুষ নতুন ধাতু সৃষ্টি করল

যে-সব মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী হাজার হাজার বছর ধরে সমাধির অন্ধকারে এবং সুরক্ষিত বসতির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছিল এখন তা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এতকাল যা মানুষের চোখের আড়ালে ছিল সে সব বহু পুরাকালের জিনিসপত্র এখন সকলেরই দেখার মতো করে প্রদর্শিত হচ্ছে। আমরাও স্বচক্ষে সে সব দেখতে পারি।

সংগ্রহশালার কাচের আধারের সামনে দাঁড়িয়ে সোনার হাতলওয়ালা তলোয়ার, খুব সূক্ষ্ম কাজ করা পাকানো শৃঙ্খল, সোনার বাছুরের মাথা দিয়ে তৈরি মালা, ষাঁড় ও হরিণের আকারে তৈরি রূপার বাসনপত্র দেখতে এখন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

কত পরিশ্রম আর কী রকম শিল্পকলার দরকার হয়েছে ঐ সব জিনিস তৈরি করতে!
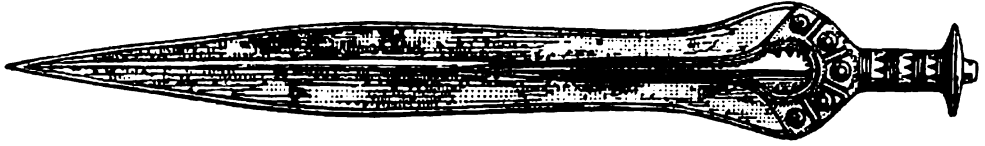
ব্রোঞ্জের তৈরি সুপ্রাচীন তরবারি।

অতি সাধারণ ব্রোঞ্জের ছোরা করতেও অনেক দিন লাগত। প্রথমে দরকার হত খনিজ পিণ্ড যোগাড় করা। বিশুদ্ধ তামার তাল যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যাবে সেদিন ফুরিয়ে গিয়েছিল। চকমকি পাথর পেতে যেমন করতে হত, তেমনি তামার পিণ্ড যোগাড় করতেও মাটির নীচে অনেক গভীরে নামতে হত। খনির গভীর গর্তে নেমে তারা শাবল দিয়ে কেটে কেটে চামড়ার থলিতে করে তামার পিণ্ড উপরে তুলত।

সহজে খনিজ পিণ্ড তুলবার জন্য তারা খনির মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিত। আগুনে খনির দেয়াল গরম হয়ে উঠলে তাতে ঢালত জল। হিস্ হিস্ করে জল থেকে বাষ্প বেরুত এবং তার ফলে পাথরে ফাটল ধরে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ত। খনিজীবীর শাবলের কাজেই সাহায্য করল আগুন আর জল।

সেকালের খনি দেখতে লাগত আগ্নেয়গিরির মতো। আগ্নেয়গিরির মতো এর

মুখ থেকেও নীচের আগুনে গম্ গম্ করা বাষ্পের মেঘ উঠত। আগ্নেয়গিরির ইংরেজী নাম 'ভলক্যানো' এসেছে পুরাকালের কর্মকার দেবতা 'ভালকানের' নাম থেকে।

খনিজ পিণ্ড পাবার পর তা গলিয়ে তা থেকে তারা ধাতু বের করত। এতেও প্রচুর নৈপুণ্যের দরকার হত। ধাতুটিকে শক্ত করে আরও সহজে ঢালাই করে ইচ্ছে-মতো জিনিস গড়বার জন্য তারা তামার পিণ্ডের সঙ্গে টিন মিশিয়ে দিত। এই ভাবে টিন আর তামায় মিলিয়ে এক মিশ্রিত ধাতু তারা তৈরি করল। এ আর বিশুদ্ধ তামা রইল না — এ হল ব্রোঞ্জ, নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এক নতুন ধাতু।

পুরাকালে পাথরের এবড়োখেবড়ো হাতিয়ারের আমলে যে কেউ সহজেই অন্যের কাজ করতে পারত। কোন কাজ শেখা বিশেষ কঠিন ছিল না। শিকারী গোষ্ঠীর সকলেই ছিল শিকারী, এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের তীরধনুকও বানাতে পারত।

কিন্তু একটা শাখা বেঁকিয়ে ছিলা পরানো, আর একটুকরা খনিজ পিণ্ডকে চকমকে ব্রোঞ্জের তলোয়ারে পরিণত করা — এ দুইয়ে অনেক তফাৎ। অস্ত্রশস্ত্র বানানোর কারিগরি বিদ্যা শিখতে বছরের পর বছর কেটে যেত। পিতার কাছে থেকে শিখত ছেলেরা। কারিগরি বিদ্যা হল কুলের সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ। কখন-কখন কুমোর, অস্ত্রনির্মাতা, তাম্রকার নিয়ে পুরো একটা বসতি হত। তাদের যশ ছড়িয়ে পড়ত দেশে-বিদেশে।

আপন-পর

প্রথম প্রথম প্রত্যেক কারিগরই নিজের গোষ্ঠীর জন্য বা গ্রামের জন্য সব কাজ করত, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই অস্ত্রকার, কুমোর সকলেই তাদের জিনিসপত্রের বিনিময়ে অন্যান্য কারিগরের তৈরি জিনিস — শস্য, বস্ত্র ইত্যাদি আনতে আরম্ভ করল। খনির ভেতরে তেতে ওঠা পাথরের দেয়ালে জল হিস্ হিস্ করে বাষ্প বেরিয়ে পাথর যেমন ফেটে পড়ত তেমনি পুরনো কুলব্যবস্থায়ও ফাটল ধরল।

আগে গ্রামের প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের সমান। এবার একটা প্রভেদ দেখা দিল ধনিক ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের ভেতর, আর একটা প্রভেদ এলো কারিগর ও কৃষিজীবীদের মধ্যে।

ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈজসপত্রও তৈরি হতে লাগল।

যতদিন কারিগর সারা গোষ্ঠীর জন্য খাটত ততদিন গোষ্ঠীই তাকে খাওয়াত। লোকজন একসঙ্গে কাজ করত আর যা উৎপন্ন হত ভাগ করে নিত তাই। কিন্তু কারিগর যখন তার তলোয়ার আর বাসনকোসন নিজে নিজেই অন্য গ্রামের লোকজনের সঙ্গে বিনিময় করতে লাগল, তখন শস্য, বস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু পেত সেসব সে সঙ্গী কারিগরদের সঙ্গে আর ভাগাভাগি করতে চাইত না। সে ভাবত যে সে নিজে ও তার ছেলেরা অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই এই শস্য কি বস্ত্র কিংবা অন্য সব জিনিস অর্জন করেছে।

এই ভাবে মানুষ আপন-পর ভেদাভেদ করতে শিখল, নিজের পরিবার ও জ্ঞাতিপরিবারের মধ্যে ভেদ করতে লাগল।

মানুষ পৃথক বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করল। গ্রীস, মাইসিনি এবং তিরিনের গ্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় শক্ত প্রাচীরের আড়ালে সবচেয়ে ধনী পরিবার বাস করত। পাথরের প্রাচীরের আড়ালে তাদের ঐশ্বর্য গোপন করার যথেষ্ট কারণও ছিল। সেখানে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস করত সারা গোষ্ঠীর সামরিক নেতা। নীচের উপত্যকায় সবচেয়ে গরীব কৃষকরা ছোট ছোট কুঁড়েয় বাস করত। শহরতলীর নিচু পর্বতমালার ওপরে ছিল অস্ত্রকার, কুম্ভকার ও তাম্রকার—এই সব কারিগর-দের আস্তানা।

এরকম শহরে লোকজন আর সমানে সমানে কথা বলত না। চাষীরা গোষ্ঠীর ধনী ও শক্তিশালী নেতার ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে তাকে সবচেয়ে সম্মান দেখাত। তাদের বিশ্বাস ছিল ভগবান স্বয়ং হচ্ছেন শক্তিমানের পক্ষে। একেবারে শৈশব থেকে তাদের মনে একথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যত পুরুতেরা।

চাষীও কারিগর কিংবা খনিকর্মীদের ভাই বলে মনে করত না। খনিকর্মীদের তারা এক রকম মায়াবী বলে মনে করত। মাটির নীচের অগ্নিস্রাবী গহ্বর থেকে

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো একটা মানুষ তামা তুলছে সে মায়াবী ছাড়া আর কী হবে? কে জানে মাটির নীচে কী হচ্ছে সেখানে? কী করে খনিজ পিণ্ড পায় সে? নিশ্চয়ই কেউ তাকে দেখিয়ে দেয় মাটির কোথায় খুঁড়তে হবে, খুঁজে পেতে সাহায্য করে সেই পিণ্ড আর তারপরে কোন মন্ত্রবলে তাকে তামা কি ব্রোঞ্জ পরিণত করে। খনিজীবীদের নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক অভিভাবক আছে ওখানে, সাধারণ মানুষের তা থেকে দূরে থাকাই ভালো।

শুধু গ্রীসেই নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই লোকের এই ধারণা ছিল। অতি পুরাকাল থেকেই কর্মকার মায়াবীদের কাহিনী শুনে আসছি আমরা। আমাদের ভাষাতেই এমন অনেক কথা রয়ে গেছে যা থেকে বোঝা যায় লোকেরা ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য সম্বন্ধে কী ভাবত। ধনী দরিদ্রের পার্থক্য কিসে হয় তা তারা জানত না, তারা ভাবত যে মানুষের ভাগ্য আগে থাকতেই ভগবান নির্ধারিত করে দিয়েছেন; ভগবান ধনীদেরই পক্ষে, গরীবদের তিনি দুঃখই দেন শুধু। আমাদের ভাষায় 'ঈশ্বর' ও 'ঐশ্বর্যবান' ব্যুৎপত্তিগতভাবে সমার্থক শব্দ।
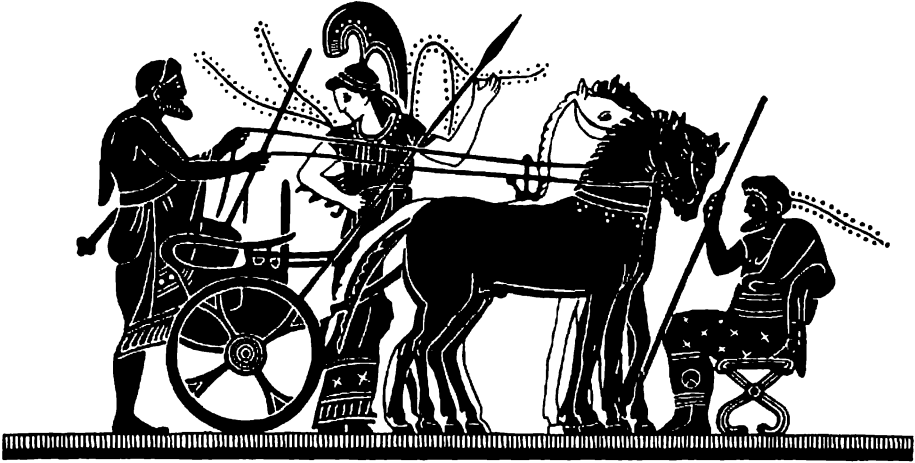
যুদ্ধের দেবী মিনার্ভা যুদ্ধের আগে সেনাপতিকে পরামর্শ দিচ্ছেন।

নতুন ব্যবস্থার শুরু

মানুষ যে পথ পেরিয়ে এসেছে আরও একবার পিছু ফিরে সে দিকে তাকিয়ে দেখা যাক।

এমন এক সময় ছিল যখন মানুষের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, দাস ও প্রভু বলে কিছু ছিল না। আদিম শিকারীরা তাদের দুর্দশাগ্রস্ত সুড়ঙ্গ-কুঠুরিগুলোতে সকলে একই রকম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনপাত করত। পাথর আর হাড় দিয়ে তারা যে সমস্ত হাতিয়ার বানাত সেগুলো উৎকৃষ্ট ধরনের হতে পারত না। হিংস্র জন্তুজানোয়ার, ক্ষুধা ও হিমের কবল থেকে মানুষ যে বাঁচত তার একমাত্র কারণ এই যে তারা একসঙ্গে বাস করত, একসঙ্গে শিকার করত, বিপদের সময় সমবেত শক্তিতে আত্মরক্ষা করত, সমবেত শক্তিতে তৈরি করত তাদের আবাস।

একা মানুষের সাধ্য কি একটা ভালুক মারে! — ম্যামথের কথা ত ছেড়েই দিলাম। বাড়ির চুল্লীর জন্য প্রকাণ্ড পাথর টেনে আনা কিংবা পাহাড়ের ঝুলন্ত চূড়ার নীচে পাথরের টালি দিয়ে দেয়াল গড়া একা মানুষের শক্তিতে কুলোবে না। মানুষের সব ছিল সর্বসাধারণের। ভালো শিকার জুটলে বয়োবৃদ্ধরা শিকারের মাংস ভাগ করে দিতেন। যারা যারা পশু খেদানো ও মারার কাজে অংশ নিয়েছিল তারা সকলে সে মাংসের ভাগ পেত।

কিন্তু এর পর কয়েক হাজার বছর কেটে গেল। কুটির আর সুড়ঙ্গ-ঘরের জায়গায় দেখা দিল কোঠাবাড়ি, পাথর ও হাড়ের তৈরি হাতিয়ারের জায়গায় এলো ধাতুর তৈরি হাতিয়ার।

লোকে জমি চাষ করতে শুরু করল প্রথমে গাঁইতি দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে, পরে লাঙল দিয়ে। মানুষ গোরু, ঘোড়া ও ভেড়াকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত করল। কামারশালায় নেহাইয়ের ওপর হাতুড়ির ঠকাঠক আওয়াজ উঠতে লাগল। বনবন করে ঘুরতে লাগল কুমোরের চাকা। শুরু হয়ে গেল লোকজনের মধ্যে শ্রমবিভাজন। কামারের নিজে জমি চাষের কোন দরকার নেই — সে কুড়োল কিংবা কাস্তের বিনিময়ে শস্য পেতে পারে। ভেড়ার পাল নিয়ে মাথা না ঘামালেও চাষীর দিব্যি চলে যায় — শস্যের বিনিময়ে সে পশুপালকের কাছ থেকে তার যতটা দরকার ততটা পশম পেতে পারে। এক বসতি থেকে আরেক বসতির দিকে চলল ফসল, পশম, কুড়োল আর মাটির বাসনকোসনে বোঝাই নৌকা ও জাহাজ। অন্যান্য জায়গা থেকে যে সমস্ত 'অতিথির' আগমন ঘটত তারা অনেক সময়ই লুঠেরায় পরিণত হত। বিনিময় ও লুঠতরাজ চলতে লাগল পাশাপাশি।

আগে কোন লোক তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কারও চেয়ে ধনী হতে পারত না। সবাই ছিল একই রকম দরিদ্র। কিন্তু এখন গরীবদের কুঁড়ের মাথার ওপর টিলার গায়ে ধনী ও প্রতাপশালী পরিবারের ঘরবাড়ি ঘিরে উঁচু উঁচু প্রাচীর উঠতে লাগল। তাদের বাড়িতে সঞ্চিত ঐশ্বর্যের ভান্ডার উপছে পড়ত। বছরের পর বছর ধরে ধনসম্পদ সেখানে জমতে থাকে, বাড়তে থাকে।

ধনীরা তাদের নিজেদের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে নিতে লাগল, যারা তাদের তুলনায় দরিদ্র তাদের বশ্যতা স্বীকার করাল। গরীবকে আরও ঘন ঘন বড়লোক প্রতিবেশীর কাছে যেতে হত, বিজিত হয়ে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হত। কিন্তু সে সাহায্যের জন্য তাকে মূল্যও কম দিতে হত না। দুর্দিনে যে ফসল সে ধার নিয়েছিল পরে তা শোধ করতে হত বছরের পর বছর বেগার খেটে।

এই ভাবে একদল লোক আরেক দল লোককে দাসত্ববন্ধনে বাঁধতে শুরু করল।

কিন্তু দাসত্ব কেবল এই পথেই চলল না। যুদ্ধবন্দীদের ধরে নিয়ে আসা হত, স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করা হত।

এক কালে সকলে পরিশ্রম করত। কিন্তু এখন একদল দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়, অন্যদের বেত মেরে কাজ করানো হয়।

এক কালে শিকারের হাতিয়ার ও শিকার — সবই ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি। কিন্তু এখন শুধু যে জমি, পশুপাল ও কর্মশালাই দাসমালিকের অধিকারে তা নয়, এমনকি যে সমস্ত দাস জমি চাষ করে, পশুপাল চরায়, কর্মশালায় কাজ করে তারাও তার অধিকারে।

এক কালে একই গোষ্ঠীভুক্ত লোকজন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হত না, শান্তিতে বসবাস করত। দাসপ্রথা আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বসতিতে, প্রতিটি শহরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

দাসমালিকেরা দাসদের অবজ্ঞা করত, দাসেরা দাসমালিকদের ঘৃণা করত।

দাসের একমাত্র চিন্তা ছিল কী করে তার প্রভুর কাছ থেকে পালানো যায়। এদিকে প্রভুর সদাজাগ্রত চেষ্টা থাকত তার সম্পত্তি রক্ষা করা, নিজের জীবন্ত, মুখর হাতিয়ারকে রক্ষা করা। দাসপ্রথাভিত্তিক রাষ্ট্র সামরিক শক্তির সাহায্যে স্বাধীন লোকদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করত। দাসেরা বিদ্রোহের চেষ্টা করলে তাদের দমন করা হত, কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।

এই ভাবে আদিম গোষ্ঠীব্যবস্থার বদলে দেখা দিল এক নতুন সমাজব্যবস্থা — দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।

বিজ্ঞানের সূচনা

মানুষের ধারণা ছিল সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি রূপকথার রাজ্য। সে কিছুই বুঝত না, ব্যাখ্যাও করতে পারত না কিছু। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি হস্ত সঞ্চালনেই হয়ত অজানা শক্তিসমূহ মানুষের ভালো মন্দ ঘটাতে পারে।

লোকের অভিজ্ঞতার গণ্ডী এতই সীমাবদ্ধ ছিল, মানুষ এত অসহায় ছিল যে রাত্রির অন্ধকারের পর দিনের আলো, শীতের পর বসন্ত আবার আসবে কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল না। তারা মন্ত্রতন্ত্র পড়ত সূর্য উঠবার জন্য।

মিশরে ফারাওকে সূর্যের অবতার বলে লোকে মনে করত। প্রতিদিন ভোরে তিনি মন্দির পরিক্রমা করতেন যাতে সূর্য তাঁর পথ পরিক্রমায় ঠিকমতো বেরোয়, মিশরীয়রা হেমন্তকালে ‘সূর্যের যষ্টি’ নামে এক উৎসব করত। তারা মনে করত দুর্বল হেমন্তকালের সূর্যের একটা যষ্টি বা লাঠি দরকার ভর দিয়ে যাত্রা করার জন্য।

তবে মানুষ কাজ করতে করতে ক্রমেই পৃথিবী আর বস্তুর ধর্ম সম্বন্ধে বেশি বেশি করে জানতে পারল।

আদিম কারিগর পাথর পালিশ আর ধার করতে গিয়ে নিজের হাতের আর চোখের সাহায্যে তার ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হল। সে জানত পাথর শক্ত, একে জোরে আঘাত করলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আঘাত লাগলে তার কান্না পাবে না। ঠিক বটে, পাথর নানা জাতের। এই পাথর কথা বলে না — কিন্তু এমনও ত হতে পারে একদিন তুমি কোন পাথর পেলে যে কথা বলতে পারে। এসব কথায় আমাদের হাসি পায়। কিন্তু আদিম মানুষদের ধারণা আমাদের মতো ছিল না।

আদিম মানুষ তখনও নিয়ম বার করতে শেখে নি, তাই তাদের কাছে জীবনটাই ছিল ব্যতিক্রমে ভরা। সে দেখত কোন দুটো পাথরই একেবারে একরকম নয়, সুতরাং সে ভাবত তাদের ধর্মও হয়ত হবে আলাদা। পাথর দিয়ে যখন সে নতুন গাঁইতি তৈরি করত তখনও সে ঠিক আগেরটার মতো করার চেষ্টা করত যাতে ভালো করে জমি চষা যায়।

এমনি করে বছর কেটে যায় — হাজার হাজার বছর চলে যায় কোথা দিয়ে।
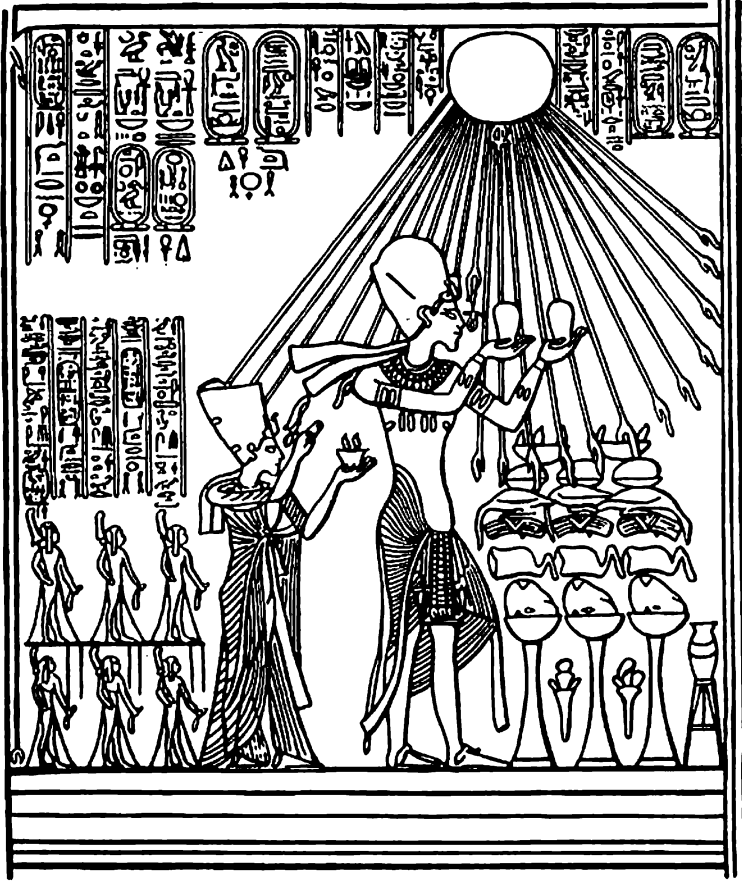
সূর্যদেবের কাছে ফারাও উৎসর্গ করছেন।

একটু একটু করে নানা জাতের পাথর ব্যবহার করায় মানুষ সাধারণ ভাবে পাথরের প্রকৃতি বুঝতে শিখল। সব পাথরই কঠিন, অর্থাৎ পাথর কঠিন পদার্থ। কোন পাথরই কথা বলল না অর্থাৎ পাথর কথা বলে না — এসব বুঝতে পারে। এই ভাবে বিজ্ঞানের আদি বীজ পদার্থ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব হল।

এখন থেকে কারিগর যখন চকমকিটাকে কঠিন পাথর বলত তাতে সব পাথরকেই বোঝাত, শুধু নিজের হাতে ধরা পাথরটাই যে কঠিন তা বোঝাত না। এই ভাবে

প্রকৃতির নিয়ম জানতে পারল মানুষ, জানতে পারল জগতে একটা নিয়মের অস্তিত্ব আছে।

'শীতের পরে বসন্ত আসে' আমরা এতে এতটুকুও অবাক হই না। একথা বলারই দরকার করে না যে শীতের পর হেমন্ত না এসে বসন্ত আসে। কিন্তু এই ঋতু পরিবর্তনের ধারা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের এক প্রাচীনতম আবিষ্কার—দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর সে আবিষ্কার করল তারা। শীত-গ্রীষ্মের পর্যায়ক্রম যে দৈবক্রমে হয় না, শীতের পরে বসন্ত, আর বসন্তের পর আসে গ্রীষ্ম ও শরৎ — এ জ্ঞান লাভ করার পরেই লোকেরা বছরের হিসাব করতে শিখেছিল।

মিশরে লোকেরা নীলনদের বন্যা দেখে এই আবিষ্কার করে। একটি বন্যা থেকে আর এক বন্যা পর্যন্ত সময়কে তারা তাদের বছর ধরত। লোকেরা নদীকে দেবতা মনে করত বলে নদীর গতি পরীক্ষা করতেন পুরোহিতরা। এখনও নদীর তীরের মন্দিরের গায়ে জলের উচ্চতা মাপার দাগ দেখা যায়।

জুলাই মাসে ক্ষেতখামার রোদে পুড়ে খাক হয়ে গেলে কৃষকরা ঘোলাটে হলদে বানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। সত্যি আসবে ত? আর যদি ভগবান তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ক্ষেতের জল না পাঠান এবার?

চতুর্দিক থেকে নৈবেদ্য আর অর্ঘ্য এসে জমা হতে লাগল মন্দিরে। কৃষক তাদের শেষ দানটুকুও পুরোহিতের হাতে তুলে দিয়ে কাতর মিনতি করে ভগবানের কাছে মানত জানাতে বলত।

প্রতিদিন প্রত্যুষে পুরোহিতরা নদীর পাড়ে যেতেন জল আসছে কিনা দেখতে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁরা মন্দিরের সমতল ছাদে উঠে হাঁটু গেড়ে নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থাকতেন। নক্ষত্র খচিত আকাশই ছিল তাঁদের পঞ্জিকা।

অবশেষে তাঁরা গম্ভীরভাবে ঘোষণা করতেন মন্দিরে এসে, 'ভগবান আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন, তিন রাত্রি পরেই ক্ষেত্রে সেচের জল আসবে।'

ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে মানুষ নতুন জগতের সব কিছু শিখে ফেলল; বুঝতে পারল যে রূপকথার জগত নয় এটা — একে বোঝা সম্ভব। জ্যোতির্বিদ্যার আদি মানমন্দির হল মন্দিরের ছাদ। কুম্ভকার ও কর্মকারদের কারখানাই ছিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার আদিতম ল্যাবরেটরি।

মানুষ দেখেশুনে সিদ্ধান্ত করতে শিখল।

আধুনিক বিজ্ঞানের থেকে এই আদি বিজ্ঞানের অনেক তফাত। বিজ্ঞান ও ভোজবাজীর মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানা কঠিন ছিল বলে বিজ্ঞানকে ভোজবাজীরই সামিল মনে হত। মানুষ শুধু নক্ষত্র পর্যবেক্ষণই করত না, তারা ভবিষ্যদ্বাণীও

করত তা থেকে। আকাশ ও পৃথিবীকে অনুশীলনের সময় তারা প্রার্থনাও জানাত তাদের কাছে। তবু অজ্ঞতার ঘন কুয়াশা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল।

দেবদেবীদের অলিম্পাসে প্রস্থান

রূপকথার জগতের কুয়াশা ভেদ করে মানুষের সামনে একটু একটু করে প্রকাশ পেতে লাগল বস্তুর প্রকৃত চেহারা।

একদা আদিম মানবের ধারণা ছিল প্রতিটি পাথরে, প্রতিটি গাছে, প্রত্যেক জীবে—সর্বত্রই ভূত আছে। ধীরে ধীরে সেই ধারণাও কেটে গেল।

মানুষ এখন আর মনে করত না যে প্রত্যেক জীবেই ভূত থাকে। নানারকমের জীবজন্তুর ভূতের স্থান গ্রহণ করল তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় এক বনদেবতা। কৃষকরা আর মনে করত না যে প্রত্যেকটি আঁটির ভেতরে আছে ভূত। এত ভূতের বদলে তারা প্রতিষ্ঠা করল একটি মাত্র কৃষিলক্ষ্মীকে, যিনি শস্যের ছড়া দান করেন।

আগের ভূতপ্রেতের জায়গায় যে-সব দেবদেবী এলেন তাঁরা আর মানুষের মধ্যে বাস করেন না। জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মানুষের বসতি ছেড়ে ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগলেন। তাঁদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল যেখানে এর আগে কারও পা পড়ে নি — পবিত্র বনভূমির গভীর অভ্যন্তরে, আর বনরাজিনীল পর্বতের চূড়ায়।

তবে মানুষ সেখানেও গিয়ে পৌঁছল। জ্ঞানালোকে অরণ্যের অন্ধকারও আলোকিত হল; পর্বতগাত্রের ঘন কুজ্‌ঝটিকা দূর হল। সুতরাং নূতন আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবদেবীরা উড়ে গেলেন আকাশে, নেমে গেলেন মহাসমুদ্রের অতলে, নয়ত আত্মগোপন করলেন বসুন্ধরার গহ্বরে — পাতালপুরীতে।

দেবদেবীরা কদাচিৎ লোকসমাজে দেখা দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তাঁরা কী করে পৃথিবীতে নেমে এসে তলোয়ার আর বর্শা নিয়ে অবরোধ ও সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতেন, কী করে নায়ককে ঘন মেঘে আছন্ন করে তাঁরাই শেষ পর্যন্ত বজ্র দিয়ে শত্রু নিপাত করতেন তার অনেক কাহিনী মুখে মুখে চলে এসেছে। তবে কাহিনীকাররা বলতেন, এসব ঘটেছিল বহু বহু যুগ আগে।

এমনি করে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল, জ্ঞানালোকের পরিধিও গেল বেড়ে, দেবদেবীরা নিকট পরিবেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন দূর দেশে — বর্তমান থেকে অতীত, ইহলোক থেকে পরলোকে।

দেবদেবীর সঙ্গে কাজকারবার করা কঠিন হয়ে উঠল। আগে যে-কোন লোকই

পালপার্বণ চালাতে পারত, মন্ত্রতন্ত্র আওড়াতে পারত। আচারানুষ্ঠানও ছিল খুব সহজ। যেমন বৃষ্টি নামাতে হলে এক মুখ জল নিয়ে নাচতে নাচতে কুলকুচি করলেই হল; মেঘ তাড়াতে হলে ছাদে উঠে হাওয়ার অনুকরণে মেঘ তাড়ানোর ভঙ্গি করলেই হল। এখন লোকেরা দেখল যে ওভাবে আর তারা বৃষ্টি আনতে কী মেঘ তাড়াতে পারে না — তাই তারা বুঝল যে দেবদেবীরা অত সহজে মন্ত্রতন্ত্রের বশীভূত হন না। শেষ পর্যন্ত পুরোহিতরাই হলেন মানুষ আর দেবদেবীর মধ্যস্থ। পুরোহিতরাই যত জটিল উৎসব জানতেন, জানতেন দেবদেবী সম্পর্কে যত অলৌকিক কিংবদন্তী।

আগের দিনে গুনিনরা ছিল শুধু উৎসবের ধারক—শিকার-নৃত্যের পরিচালক মাত্র। ভূতপ্রেতের সঙ্গে কুলের অন্যদের চেয়ে তাদের সম্পর্ক বেশি ছিল না।

পুরোহিতরা হলেন সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা পবিত্রকুঞ্জে দেবতাদের কাছে কাছেই থাকেন। একমাত্র পুরোহিতই নক্ষত্রের বই পড়তে জানতেন বলে মন্দিরের ছাদে উঠে নক্ষত্রের বই ঘেঁটে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ শোনাতেন সবাইকে। যুদ্ধের আগে জীবজন্তুর অন্ত্র দেখে তিনি জয়পরাজয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন।

মরলোক থেকে দেবদেবীরা ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগলেন। দেবদেবীরা সবাইকে সমান চোখে দেখবেন সেদিন আর রইল না। মানুষও নিজেদের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখল পূর্বের সাম্যভাব আর নেই। পুরোহিতরা শেখালেন, ‘যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। মানুষের সব কিছুই ঈশ্বরে সমর্পণ করা উচিত। নেতারা যেমন দেশ শাসন করেন তেমনি ঈশ্বর এই জগত শাসন করেন।’

কিন্তু পুরোহিতদের এই শিক্ষা সকলে অবনত মস্তকে মেনে নেয় নি। এমন অনেকে ছিল যারা ভগবানের হুকুমের কাছে মাথা নোয়ায় নি।

সেদিন আসতে লাগল যখন গ্রীক কবি জিজ্ঞেস করবেন, ‘কোথায় রইল জিউসের বিচার? সৎলোকেরা কষ্ট পায়, অসতের উন্নতি হয়। পিতার অপরাধে সন্তান শাস্তি পায়। একমাত্র অবলম্বন রইল আশাদেবীর কাছে প্রার্থনা — একমাত্র যে দেবী মানুষের মনে রয়েছেন। আর সবাই চলে গেছেন অলিম্পাসে।’

পৃথিবী বাড়ছে

আদিম মানুষ সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য বুঝত না, তফাৎ বুঝত না জ্ঞানের আলোর আর কুসংস্কারের অন্ধকারের।

কুসংস্কারের কবল থেকে জ্ঞানের মুক্তি ঘটতে হাজার হাজার বছর কাটল —

কুসংস্কার নীচে পড়ে রইল আর ওপরে দেখা দিল জ্ঞান, ঠিক যেমন দুধের ভেতর থেকে ননী দেখা দেয়।

যে-সব গাথা ও কাহিনী আমরা পেয়েছি তার ভেতরে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীনেতার ইতিহাস ও ঈশ্বর ও বীরদের রূপকথা এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে ইতিহাসের অংশকে আলাদা করা কঠিন। রূপকথার ভূগোল থেকে সত্যিকার ভূগোলকে বোঝা এবং প্রাচীন কিংবদন্তী থেকে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের কথা বেছে নেওয়াও কঠিন।

'ইলিয়াড' ও 'অডিসীর' ভেতরে গ্রীকরা তাদের প্রাচীন কবিতা ও কিংবদন্তী রেখে গেছে আমাদের জন্য। তাতে বলা হয়েছে কী করে গ্রীকরা ট্রয় নগর অবরোধ করে ধ্বংস করেছিল এবং তার পরে একটি গ্রীক কুলের নেতা ইউলিসিস (কিংবা অডিসীয়ুস) বহু কাল সমুদ্রে ইতস্তত ভেসে বেড়িয়ে অবশেষে নিজের দেশ ইথাকায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ট্রয়ের প্রাচীরের আড়ালে দেবতারা মানুষের পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, কেউ ছিলেন অবরোধকারীদের পক্ষে কেউ অবরুদ্ধের পক্ষে। দেবতার কোন ভক্তের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠলে তাঁরা তাকে অক্ষত অবস্থায় অদৃশ্য করে ফেলতেন। অলিম্পাসের চূড়ায় পান ভোজনের উৎসবে মত্ত থাকার সময় তাঁরা স্থির করতেন আর যুদ্ধ চালাবেন না যুধ্যমান লোকদের মিলন ঘটিয়ে দেবেন।

এসব প্রাচীন কথায় সত্য মিথ্যা জড়িয়ে আছে। এর কতটুকু ইতিহাস আর কতটুকুই বা রূপকথা? গ্রীকরা কি সত্যিই ট্রয়ের প্রাকারের তলে যুদ্ধ করেছিল? আর ট্রয় নগরী — কোন কালে কি ঐ নামে কোন নগর ছিল?

প্রত্নতত্ত্ববিদের খনিত্র সমস্ত সংশয় নিরসন না করা পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে এ নিয়ে বিষম মতভেদ ছিল। 'ইলিয়াডের' ভেতর থেকে নির্দেশ দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এশিয়া মাইনরে গিয়ে ঠিক জায়গা থেকেই ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে বের করলেন।

এও দেখা গেল যে 'অডিসীর'ও সব কিছুই রূপকথা নয়। ভূগোল-বিজ্ঞানীরা তা প্রমাণ করে দিলেন। তাঁরা ইউলিসিসের
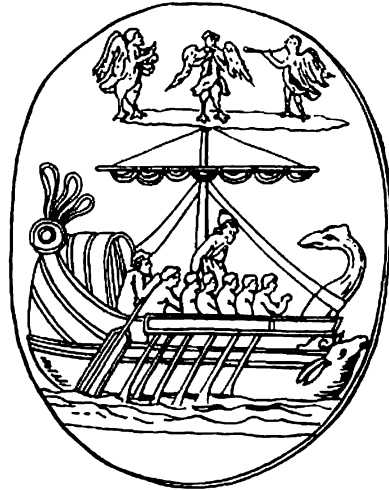
অডিসীয়ুসের জাহাজ।

যাত্রাপথ অনুসরণ করতে সক্ষম হন। মানচিত্র খুললে তার মধ্যে পদ্মমধুপায়ীর দেশ, ইওলাস দ্বীপপুঞ্জ এমনকি যে সিলা ও কারিব্ডিসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ইউলিসিসের জাহাজ প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিল তাও দেখতে পাবে।

পদ্মপায়ীর দেশ হল আফ্রিকার ত্রিপোলীর উপকূল; ইওলাস দ্বীপপুঞ্জের আধুনিক নাম লিপাস্কী, আর সিলা ও কারিব্ডিস হল সিসিলি আর ইতালীর মাঝের একটা প্রণালী।

'অডিসীর' সব কিছু রূপকথা নয়; কিন্তু তা থেকে প্রাচীন জগতের ভূগোল শেখবার খেয়াল যদি তোমার হয় ত মহা ভুল করবে।

ভ্রমণ-কাহিনীর এই প্রথম বইটিতে রূপকথার সঙ্গে ভূগোল মিশে আছে। পাহাড় হয়েছে রাক্ষস, দ্বীপবাসী বর্বররা হয়েছে একচক্ষু দানব।

সেযুগের মানুষ শুধু নিজেদের বাসভূমির কথাই ভালোভাবে জানত। সওদাগররা খোলা সাগরের বুকে পাড়ি জমাত বটে, কিন্তু তারাও উপকূল থেকে বেশি দূরে যেত না। মানচিত্র কিংবা দিক্‌নির্ণয়ের যন্ত্র না থাকায় অথৈ সমুদ্রের বুকে ভেসে যাওয়া বড় বিপজ্জনক ছিল সেযুগে। সূর্য আর নক্ষত্র দেখে হাতড়াতে হাতড়াতে দিক ঠিক করত তারা। কোন দ্বীপে উঁচু চূড়া বা তীরের কোন উঁচু গাছ তাদের আলোকস্তম্ভের কাজ করত।

সমুদ্রের জলের অতলে হাজারো বিপদ লুকিয়ে থাকত। জলের সামান্য চাঞ্চল্যের সঙ্গেই দুলে উঠত পেট-মোটা জাহাজগুলি, কিম্ভূতকিমাকার পাল সামলান হত কঠিন। ঝড়ঝঞ্ঝা মানুষের বারণ না শুনে পালকের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেত জাহাজটিকে।

তারপর সকলের শেষে জাহাজ তীরে লাগলে ক্লান্ত নাবিকদের সেটাকে বালুকাময় উপকূলে টেনে তুলতে হত। এই শুকনো ডাঙায় অবশেষে তাদের বিশ্রাম মিলত, কিন্তু তারা অস্বস্তি বোধ করত। অপরিচিত দেশ ছিল সমুদ্রের চেয়েও আতঙ্কজনক। অন্যের কাছ থেকে নরখাদক রাক্ষসের কথা শুনে নাবিকদের অনবরত মনে হত যেন তারা এসব দেখতে পাচ্ছে। তারা যে-কোন নতুন জীবকেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস বলে ভাবত। বেশি দূরে যেতে তাদের সাহস হত না।

তথাপি প্রত্যেকটি সমুদ্রযাত্রার ফলেই পৃথিবীর পরিসর বাড়ছিল। অজানার সীমানা, রূপকথার দেশের চৌহদ্দি যাচ্ছিল কমে। সবচেয়ে সাহসী নাবিকরা সমুদ্রের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছাল, তার পরেই মহাসমুদ্র। মহাসাগরকে তাদের মনে হল ব্রহ্মাণ্ডের মতোই অসীম। দেশে ফিরে তারা বলতে আরম্ভ করল পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েছিল। আর পৃথিবীর চারিদিকে জল দিয়ে ঘেরা।

হাজার হাজার বছর পর লোকেরা ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে, চীন থেকে ইউরোপে গিয়েছিল। নাবিকরা মহাসাগর পার হয়ে তার অপর প্রান্তে দেখল জনবহুল দেশ। তারপরেও বহুকাল ধরে ভূবিদ্যার সঙ্গে রূপকথার নানা কাহিনী জড়িয়ে ছিল।

আমেরিকার আবিষ্কর্তা কলম্বাসের ধারণা ছিল পৃথিবীর কোথাও এক বিরাট উঁচু পর্বত আছে, তার উপরেই স্বর্গ অবস্থিত। তিনি স্পেনের রাণীর কাছে এক পত্র লিখেছিলেন যে স্বর্গের আশেপাশে গিয়ে তিনি সে অঞ্চল আবিষ্কার করে আসবেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশে বসবাসকারী লোকেদের ধারণা ছিল উরাল পর্বতের ওপারে এক জাতের লোক থাকত যারা সারা শীতকাল ভাল্লুকের মতো ঘুমিয়ে কাটায়। একটি পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে এসেছে। তার নাম 'পূর্বদেশের অদ্ভুত লোকদের সম্পর্কে'। এর ভেতরে সে সব মুখহীন কবন্ধ, বুকে চোখওলা লোকের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া আছে।

আমাদের কাছে এসব হাস্যকর মনে হয়; কিন্তু আমরাও মনে করি অনধিগম্য দেশে রাক্ষসরা বাস করে। আমরা পৃথিবীকে খুব ভালো করে জেনেছি বলে এই সব কল্পলোকের জীবদের চালান করেছি মঙ্গল গ্রহে বা চাঁদের রাজ্যে।

প্রথম কবিরা

প্রত্যেক যুগেই মানুষ রহস্য আর আশ্চর্যের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছিল। কারিগররা ক্রমেই নিজের হাত আর চোখকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করছিল। দেবদেবীর কাছে তারা আর আগের মতো অত ঘন ঘন প্রার্থনা করত না। সূর্যের আলোয় যেমন উপত্যকা থেকে অন্ধকার কেটে যায় তেমনি ভোজবাজিও ধীরে ধীরে মানুষের জীবন থেকে বিদায় নিতে লাগল।

এসব জিনিস সবচেয়ে বেশি দিন টিকে ছিল ধর্মোৎসবে, পবিত্র খেলাধুলোয় আর নাচে-গানে। কিন্তু জাগ্রত যুক্তিজাল সেখান থেকেও তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। নাচগান ইন্দ্রজাল মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র নাচ আর গানে পর্যবসিত হল।

প্রাচীন গ্রীসের কৃষকরা যখন ফলদাতা দেবতা ডিওনিসাসের পূজার ব্যবস্থা করত তখন তা ছিল প্রথমে মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ। সবাই মিলে গান ধরত ডিওনিসাসের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের, যেন তিনি শীতের বরফের চাপ থেকে মৃত প্রকৃতিকে

ডিওনিসাসের সম্মানে নৃত্য।

পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করতে পারেন। মানুষকে দিতে পারেন শস্য, ফলমূল আর পানীয়। গ্রামের বেদীর চারিদিকে পশুর মুখোশ পরে কৃষকরা নাচত। মূল গায়েন ডিওনিসাসের দুঃখকষ্টের কাহিনী বর্ণনা করত আর চেলারা ধরত ধুয়ো।

এই প্রাচীন ঐন্দ্রজালিক খেলা ছিল সাধারণ নাটকের মতো। মূল গায়েন ও মুখোশধারীদের দেখেই চেনা যায় ভাবী কালের অভিনেতা বলে। মূল গায়েন যে শুধু দেবতার দুঃখকষ্টের কথাই গান করে তা নয়, সে আবার সেগুলো অভিনয় করে বোঝায়। সে বুক চাপড়ায়, আর্তনাদ করে, স্বর্গের দিকে তোলে হাত। দেবতার প্রাণ সঞ্চার হলে মুখোশধারীরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে একে অন্যের নকল করে, ঠাট্টাতামাসা করে।

কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ঐন্দ্রজালিক অভিনয়ে ইন্দ্রজালের অংশ উঠে গেল, পড়ে রইল শুধু অভিনয়ের অংশটুকুই। আগের মতোই লোকেরা অভিনয় করে, নাচে আর গান করে; তবে তারা মানুষের সুখদুঃখের কথা বলে, ভগবানের নয়। দর্শকরাও দেখতে দেখতে হাসে কাঁদে, বীরত্ব দেখলে রোমাঞ্চিত হয়, শয়তানী আর বোকামী দেখলে হেসে কুটিপাটি হয়। প্রাচীন কালের কোরাসের মূল গায়েন হল বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতা, মুখোশধারীরা হল ভাঁড়, ক্লাউন আর গোব্দা পুতুলনাচের যত পুতুল।

মূল গায়েন যে শুধু প্রথম অভিনেতা তা নয়, সে প্রথম কবিও বটে। প্রথম প্রথম

সে শুধু কোরাসের সঙ্গেই গান করত। পরে সে একা একাও গান গাইত।

গান আচারানুষ্ঠান থেকে পৃথক হয়ে পড়ল। একক গায়ক শুধু পবিত্র ক্রীড়াতেই গাইত না, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নেতা যখন ভোজে বসতেন তখনও সে গান করত। গানের সঙ্গে সঙ্গে সে বাজাত বীণা। কখন বা কথা, সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গি এই তিনটি মিলিয়ে চিরাচরিত প্রথায় নাচতও। সে একাই গায়েন, কোরাস ও ধুয়োধারী—দুইই।

কিসের গান করত সে? সে দেবদেবী ও বীরের গান করত। যে-সব কুলপতি সাহসী বীরদেরও পরাজিত করেছেন, যে বীরযোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মদান করেছেন, ভাই-এর প্রতিশোধ নেয় যে ভাই — তাদেরই কাহিনী সে গান করত।

এ গান না ছিল মন্ত্রতন্ত্র, না ছিল স্তবস্তোত্র। এ ছিল শৌর্য গাথা — তার পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য প্রেরণা দান।

কিন্তু শোকতাপ, ভালবাসা, বসন্তের গানের কী হল? সে সব এলো কোথা থেকে? তাদেরও উৎপত্তি বিবাহ, শবানুগমন বা ফসল কি আঙুর পেষাইয়ের সময়ের উৎসব থেকে। এই উৎসবগুলিতে কোরাস পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট গান করত। চরকার সামনে বসে ছেলেমেয়েকে দোলাতে দোলাতে মা এই সব ছোট ছোট গানের পুনরাবৃত্তি করত।

বসন্তের গান যে শুধু বসন্তকালেই গাইত এমন নয়, প্রেমের গানও তেমনি বিবাহ-অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য সময়ও গাওয়া হত।

কে বীরদের শৌর্যের প্রথম কাহিনী নিয়ে গান রচনা করেছিল — আর কেই বা প্রথম করেছিল প্রেমের বন্দনা?

তা আমরা জানি না — যেমন আমরা জানি না কে প্রথম তলোয়ার কি চরকা তৈরি করেছিল। কোনও একজন লোক নয়, শত শত পুরুষ ধরে যন্ত্রপাতি, গান, কথা সৃষ্টি হয়েছে। চারণ নিজেই তার গান রচনা করে না, সে যা শুনেছে তারই পুনরাবৃত্তি করে। এক চারণের কাছ থেকে অন্য চারণের কাছে যেতে যেতে গানও বেড়ে ওঠে — তার রূপান্তর ঘটে। নদী যেমন তার শাখা-প্রশাখা আর ছোটখাটো উপনদীর জলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে—কবিতাও তেমনি গান থেকেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

আমরা বলি হোমার 'ইলিয়াড' লিখেছেন। কিন্তু হোমার কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে আমরা শুধু কিংবদন্তীই শুনে এসেছি। তিনি তাঁর গানের বীরদের মতোই কিংবদন্তীর চরিত্র বিশেষ।

বীরদের প্রথম গান যখন রচিত হল তখন পর্যন্ত গায়ক তার গোষ্ঠী, তার কুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। লোকেরা সব কিছু একসঙ্গে করত, তাদের

গানও ছিল বংশপরম্পরাক্রমে মিলিত প্রচেষ্টার ফল। পুরুষানুক্রমে লাভ করা যে গান সে শুনেছে তা ঘষেমেজে বদলে নিলেও কোন চারণ নিজেকে তার রচয়িতা কি স্রষ্টা বলে মনে করত না।

কিন্তু এমন সময় এলো যখন মানুষ নিজের আর অন্যের ভেতরে তফাৎ করতে আরম্ভ করল। কুল ভেঙে যাচ্ছিল। আগের সে ঐক্য আর ছিল না। কারিগর এখন নিজের জন্যই কাজ করত, কুলের হাতের ক্রীড়নক মাত্র বলে আর সে নিজেকে মনে করত না।

কয়েক শতাব্দীর ভেতরেই গ্রীক গীতি-কবি থিওগ্নিস বললেন:

'আমি দিয়েছি কবিতাগুলিতে আমার ছাপ এ'কে, আমার শিল্পকৃতির ফল। কেউ আর তা চুরি করতে পারবে না, পারবে না দাবি করতে তার বলে। সবাই বলবে: 'এ হল মেগারার থিওগ্নিসের রচনা।' '

গোষ্ঠী প্রথার যুগে কেউ একথা বলত না কখনো।

মানুষ ক্রমেই বেশি বেশি করে 'আমি' কথাটা ব্যবহার করছিল। মানুষ যখন ভাবত সে নিজে কিছু করছে না, অন্যে কেউ তার হয়ে কাজ করছে সে যুগ বহু আগেই মিশে গেছে অতীতের গর্ভে। কবি এখনও বলেন সঙ্গীতদেবী তাঁকে প্রেরণা দিয়েছেন, কী করে তিনি দেবতাদের আশীর্বাদরূপে সে সঙ্গীতের বর লাভ করেছেন তা বলেন, কিন্তু নিজেকে তিনি ছবির আড়াল করেন না আর।

'সঙ্গীতলোকের দেবতারা প্রেরণা দিয়েছেন আমায়। আমি বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাব না।'

এই কবিতায় গ্রীসের নারীকবি স্যাফো প্রাচীন ও আধুনিকের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তিনি তখনও বিশ্বাস করতেন সঙ্গীতলোকের দেবতারা তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছেন, নিজে তিনি ভাষা জোগাতে পারেন নি নিজের রচনায়। কিন্তু এই কটি ছত্রেই স্রষ্টার অহংকার ফুটে উঠেছে — কবির অহংকার এই যে তাঁর নাম অমর হবে।

এমনি করে মানুষ বড় হচ্ছে। যতই সে বড় হচ্ছে ততই তার চারপাশের জগতও হচ্ছে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর।

১৯৪০

এ বইয়ের বিষয়ে আরও দু-একটি কথা

আদিম মানুষের কাহিনী তোমরা পড়লে।

এই বই লেখার কাজে যখন আমরা হাত দিই তখন আমাদের নিজেদেরই বেশ কিছু বইপুথি পড়তে হয়।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগে কী ভাবে চেতন পদার্থের পরিবর্তন ঘটে সে কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন চার্লস ডারউইন আর তাঁর দুই উত্তরসাধক ভ্লাদিমির কভালেভ্স্কি ও ক্লিমেন্ত তিমিরিয়াজেভ।

শ্রম কী ভাবে বানরকে মানুষে পরিণত করে তার বিবরণ আমরা পেয়েছি ফ্রিড্রিখ এঙ্গেল্সের বই থেকে।

মানুষ কী করে ভাবতে আর কথা বলতে শেখে এ বিষয়ে আমাদের জানতে সাহায্য করেছেন রুশ শারীরবিজ্ঞানী ইভান পাভ্লভ।

কার্ল মার্কস, ফ্রিড্রিখ এঙ্গেল্স ও ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নানা লেখা মানব সমাজের হাজার হাজার বছরব্যাপী ক্রমবিকাশের এক বিস্তৃত চিত্র আমাদের সামনে মেলে ধরেছে।

এ ছাড়া প্রকৃতি বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ ও ভূপর্যটকদের লেখা আরও অনেক অনেক বই আমাদের পড়তে হয়েছে।

তোমাদেরও যদি সাধ থাকে মানুষের ইতিহাস আরও বিশদভাবে জানার, তাহলে নিতে হবে আমাদেরই এই পথ — তোমাদের চলে যেতে হবে জ্ঞানের সেই আদি উৎসে — যে-সব বিজ্ঞানী পৃথিবীর জীবন এবং মানবজাতির উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে চর্চা করেছেন তাঁদের লেখা পড়তে হবে।

আমরা শুধু চেয়েছিলাম জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে তোমাদের পেঁছে দিতে — এবারে তোমরা নিজেরাই ভেতরে যাও।

প্রিয় ছেলেমেয়েরা!

তোমরা এই মাত্র আদিম মানুষের কাহিনী পড়ে শেষ করলে। পড়তে পড়তে বইয়ের ছবিগুলি দেখে তোমরা নিশ্চয় বেশ মজা পেয়েছ। বইটি লিখেছেন দুই প্রতিভাবান লেখক — সাধারণ মানুষের বোঝার মতন ভাষায় মানবজাতির বিশাল ইতিহাস লেখার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। যে-কোন বিজ্ঞানের মতো ইতিহাসের ভিত্তি বাস্তব উপকরণ। বিশ্বের বহু মিউজিয়মে মানুষের নানা বিষয়চর্চার সাক্ষ্যস্বরূপ যে-সমস্ত জিনিস সংরক্ষিত আছে সেগুলোও ঐ উপকরণের মধ্যে পড়ে। আমাদের এই বইতে তাই আমরা নিজস্ব একটা ছোটখাটো মিউজিয়মও গড়ে তুলেছি। সেই মিউজিয়ম দেখার সাদর আমন্ত্রণ জানাই তোমাদের।

তৃতীয় গঠনযুগ

অলিগসেন

মিওসেন

৩ কোটি ৭০ লক্ষ
বছর আগে

২ কোটি ৬০ লক্ষ
বছর আগে

প্লিয়োপিথেক
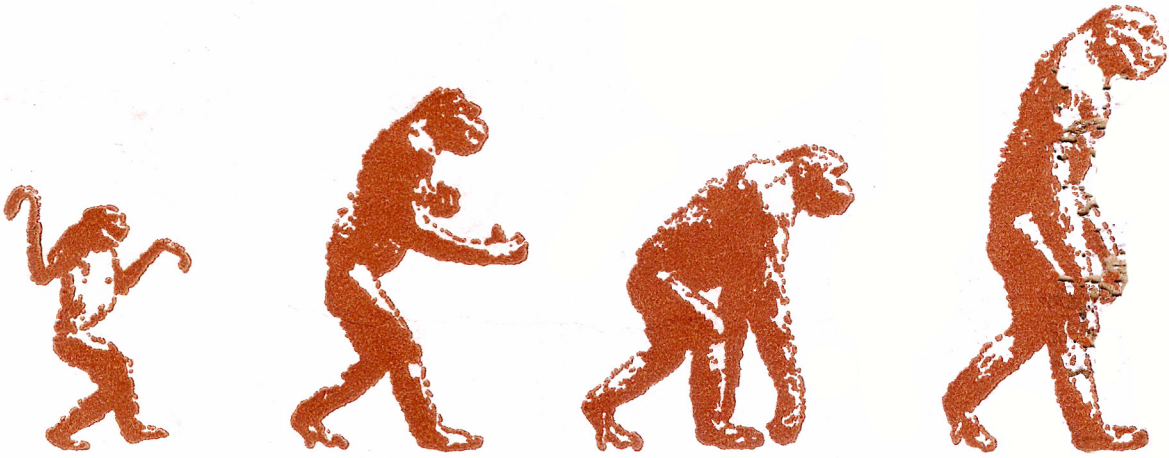
প্রোকন্সাল

ড্রায়োপিথেক

অরিয়োপিথেক

ভূপরিবর্তনের ইতিহাসকে পণ্ডিতেরা পাঁচটি যুগে ভাগ করেছেন। আমরা [illegible] যুগে বাস করি তার নাম নব ভূতাত্ত্বিক যুগ। ৬ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ বছর ধরে এই যুগ চলছে। এর আগের যুগ মধ্য ভূতাত্ত্বিক ও প্রত্নভূতাত্ত্বিক যুগ। সবচেয়ে প্রাচীন যুগ — প্রাক ভূতাত্ত্বিক ও আদিযুগ। আদিযুগের অবসান অর্থাৎ অতি সাধারণ স্তরের প্রা[illegible] আবির্ভাব থেকে আমাদের যুগের ব্যবধান ৩০০ কোটি বছরের।

প্রতিটি যুগ আবার কয়েকটা পর্বে ভাগ করা হয়। নব ভূতাত্ত্বিক যুগকে ভাগ করা হয় এই কয়টি ভাগে:

১। শেষ পর্ব অর্থাৎ মানবজাতির আবির্ভাব কাল। ইউরোপে ও সাইবেরিয়ায় এই সময় ম্যামথ বিচরণ করত।

চতুর্থ গঠনযুগ

প্লাইওসেন | প্লেইস্টোসেন

১ কোটি ২০ লক্ষ বছর আগে | ৩০ লক্ষ বছর আগে
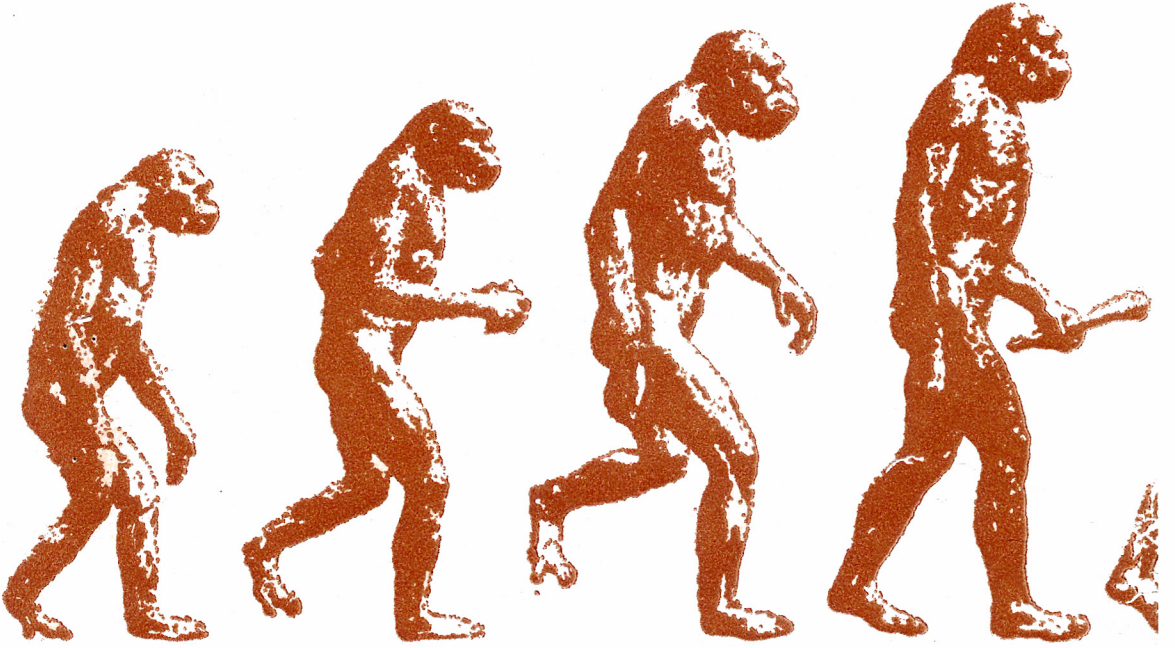
রামাপিথেক | আফ্রিকীয় অস্ট্রালিয়োপিথেক | সুবিশাল অস্ট্রালিয়োপিথেক | উন্নত অস্ট্রালিয়োপিথেক

২। স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাবকাল।
৩। নবজীবোদ্ভবপর্ব।
৪। প্রত্নজীবোদ্ভবপর্ব।

আনুমানিক দশ লক্ষ বছর আগে, মানবজাতির আবির্ভাবকালের সূচনায় বিশেষ এক জাতের বানর খাড়া হয়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখল — তাদের থেকে মানুষের পূর্বপুরুষ পিথেকানথ্রোপাস বা বনমানুষের উদ্ভব। এই পিথেকানথ্রোপাস থেকেই আবার উদ্ভব ঘটল আদিম মানুষের, যাকে আমরা বলি নিয়ানডারথ্যাল মানুষ। আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে।

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

ISBN 5-05-001227-9